নওগাঁর প্রাসাদ

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

সাধারণতন্ত্রী প্রকাশালয়

শ্রীবিনোদবিহারী বসু

বন্ধুবরেষু।

প্রকাশক
সেলিমা মুখোপাধ্যায়
সাধারণতন্ত্রী প্রকাশালয়
৪৪, কালীকুমার মুখার্জি লেন
শিবপুর, হাওড়া

মুদ্রক
শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯, এণ্টনি বাগান লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
সমর গঙ্গোপাধ্যায

প্রায় বছর তিরিশ আগে 'ক্ষতিপূরণ' নামে যে উপন্যাসখানি বার করেছিলুম **নওগাঁর প্রাসাদ** তারই পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত রূপ। উপন্যাসখানি সাধারণতন্ত্রীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

১লা আষাঢ়, ১৩৬৮ —লেখক।

এই লেখকের

উপন্যাস

এলো আহ্বান (৬ষ্ঠ সং)
ইস্পাত ওরা ভাঙবেই (৫ম সং)

কবিতা

আমার কবিতা (২য় সং)
পথপ্রান্তে (২য় সং)
ভিড় (২য় সং)

প্রবন্ধ

শোষণহীন শাসনহীন সমাজ (৭ম সং)

নওগাঁর প্রাসাদ

খুব বেশী দিনের কথা নয়। [redacted] তখন গভীর বনে ঢাকা। তারপর ক্রমে বন সরিয়ে গড়ে উঠলো গ্রাম, গড়ে উঠলো ঘর বাড়ী খেত খামার। নাম হোল নবগ্রাম। নবগ্রাম নাম অবশ্য আজ আর নেই। লোকের মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে আজ তা হোয়ে দাঁড়িয়েছে নওগাঁ।

একদিন দেখা গেল নওগাঁয়ে উঠছে এক বিরাট প্রাসাদ—শোনা গেল জমিদার রায়েদের প্রাসাদ। সেদিন বন কাটতে যত লোক গিয়েছিল সাপের মুখে, যত গিয়েছিল বন্য জীবজন্তুর পেটে, তার চেয়ে অনেক বেশীই গেল এই প্রাসাদখানা তুলতে। কিন্তু তবু কেউ একটা রাও করলো না, একটা আঙুলও তুললো না, শুধু দেখতে লাগলো অবাক হোয়ে চেয়ে চেয়ে।

সত্যিই বটে একটা দেখবার মত জিনিস নওগাঁর প্রাসাদ। গায়ে সারি সারি থাম। থামে নানারকমের কারুকার্য। সামনে, পিছনে, আশপাশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কেমন সুন্দর সাজানো বাগান। বাইরে যতদূর চাও দিগন্ত জুড়ে পড়ে রয়েছে খেত খামার পুকুর ডোবা কুঁড়ে—হাজার হাজার চাষীর দুঃখ দারিদ্র্য আশা নিরাশা বুকে নিয়ে। মনে হবে যেন রায়েদের রাজমহিমা প্রচাবের জন্যেই এদের মাঝখানে এমনিভাবে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বিরাট স্ফটিকশুভ্র প্রাসাদখানা।

রায়েরা অবশ্য তেমন বড় জমিদার নয়। কিন্তু নামডাকটা খুব। সরকারের ঘরে খাতিরও আছে বেশ। আর সেইজন্যেই বোধ হয় জমিদারদের মধ্যে এমনকি যারা রুইকাতলা তারা পর্যন্ত তাদের এমন হিংসে করে।

রায়েরা এজন্যে গর্বিত। উন্নাসিকও তারা বড্ড। কাউকেই তারা আমলে আনে না। দুএকজন অন্তরঙ্গ ছাড়া আর কারও সঙ্গে বড় একটা মেলামেশাও করে না।

বর্তমান জমিদাররা দু ভাই। বড় হলেন নিখিলেশ রায়। নিখিলেশই সব। খাজনা আদায় থেকে শুরু কোরে তিনিই সব কিছু দেখাশুনো করেন। ছোট ভাই সমরেশের বয়স বেশী না। মাত্র কিছুদিন হোল সে বিয়ে করেছে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে তারপরই নাকি তার মাথা এমন খারাপ হোয়ে গেল যে তাকে এখন পাগলা গারদে রাখতে হয়েছে। তার স্ত্রীও তার বাপের বাড়ি। প্রজারা অবশ্য একথা বিশ্বাস করে না। তারা বলে ভাইকে ফাঁকি দেবার জন্যে নিখিলেশ রায়ের এটা ষড়যন্ত্র।

নিখিলেশের এক ছেলে। ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে তিনি কখনো থাকেন কলকাতায়, কখনো নওগাঁয়ে—জমিদারিতে।

প্রাসাদসংলগ্ন বাগানে ঐ যে ছোট্ট ছেলেটিকে ট্রাইসাইকেল চড়ে বেড়াতে দেখছো ওই নিখিলেশ রায়ের ছেলে—অমরেশ রায়।

একে তো জমিদারের দুলাল, তায় বাপের একছেলে, কাজেই অমরেশের আদর-যত্নের কি ত্রুটি থাকতে পারে? ওপর থেকে নির্দেশ তার কোন আকাঙ্ক্ষাই যেন অপূর্ণ রাখা না হয়। দাসদাসীরা তো সকল সময়েই শশব্যস্ত। তাদের চালচলন দেখলে মনে হবে তাদের উত্তরকালীন প্রভু যদি কারও মুণ্ড এনে দিতে বলে তাও তারা পারে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারপুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা হোল। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্যে আধ ডজন শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। কিন্তু শিক্ষকদের এমন অধিকার নেই যে ছাত্রের ইচ্ছের বিরুদ্ধে একটা কথাও তাঁরা বলেন। কেনই বা বলবেন? জমিদারের ছেলে তো আর সাধারণ ঘরের ছেলে নয়!

হ্যাঁ, এমনি পরিবেশের মধ্যেই মানুষ হতে থাকে অমরেশ। ফলে সে যে বেশ আদুরে একগুঁয়ে ও স্বেচ্ছাচারী হোয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি' সব জমিদারের ছেলে এই ভাবেই হয়।

এছাড়া আরও দুটি জিনিস অভিজাত ঘরে প্রায়ই থাকে—মদ ও মেয়ে। এ দুটিরও প্রভাব বড় কম না।

একদিন অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে অমরেশ দেখে তার বাবা বাইরে বারাণ্ডায় বোসে। তাঁর সামনে টেবিলের ওপর দুতিনটে বোতল ও গেলাস। সে লক্ষ্য করলো তিনি মধ্যে মধ্যে বোতল থেকে কি একটা রঙিন জিনিস ঢেলে খাচ্ছেন। চতুর্ধার তখন অন্ধকার। কেবল বারাণ্ডায একটা ঝাড় ঝুলছে। অমরেশ দেখলো তার পিতার প্রশস্ত ললাট সে আলোয় চকচক করছে। তাঁকে দেখাচ্ছে রাজার মতো। এর পর আরও অনেকবার সে এ দৃশ্য দেখেছে, যতবারই দেখেছে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছে।

দ্বিতীয় জিনিসটিও তার চোখ এড়ায় না। সে প্রায়ই দেখে কি এখানে আর কি তাদের কলকাতার বাড়ীতে তার বাবা বাইজী ও অন্যান্য রমণীদের নিয়ে বড্ড বেশী মাতামাতি করেন। এজন্যে তার মার সঙ্গে তাঁর প্রায়ই খিটিমিটি হয়। কিন্তু সে নিজে এটাকে কোন দোষ মনে করে না, বরং তার মনে হয় এ না হোলে যেন রাজা-রাজড়ার ঘর মানায়ই না।

সেদিন পড়ার ঘরে অমরেশ পড়ছে এমন সময়ে হঠাৎ বাইরে খুব কলরব শোনা গেল। পড়া বন্ধ কোরে সোফার ওপর হেলান দিয়ে সে মাস্টারমশাইকে হুকুম করলো "মাস্টারমশাই, দেখুন তো কিসের এতো গোলমাল।"

শিক্ষকমশাই তাড়াতাড়ি হুকুম তামিল করবার জন্যে উঠলেন। বলা বাহুল্য

ছাত্রকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে শিক্ষকদের এরকম প্রায়ই করতে হয়।

একটু পরেই মাস্টারমশাই ঘরে এসে বললেন, "অমরেশ ওঠ, আজ আমাদের খুব আনন্দের দিন। তোমার বাবা সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে রাজা খেতাব পেয়েছেন।"

"রাজা? বাবা রাজা খেতাব পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ। বড় হোলে তুমিও পাবে।"

"কিন্তু বাবা তো কলকাতায়। কি কোরে জানলেন?"

"এইমাত্র খবর এসেছে। তোমার বাবাও এসে পড়লেন বোলে। ওঠ। আজ তোমার ছুটি। রাজাসাহেবের সম্মানার্থে আজ কাছারি, স্কুল, পাঠশালা, সব বন্ধ। আর নয়। শীগগির ওঠ, দেখবে চলো কাছারীবাড়ীতে কত লোক এসেছে, ম্যানেজারবাবু তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, রাজাসাহেব আদেশ পাঠিয়েছেন খবর পাবামাত্রই তোমায় যেন তুমি যা চাইবে দেওয়া হয়।"

কাছারীবাড়ী যেতে যেতে অমরেশ ভাবতে লাগলো নিশ্চয়ই খুব বড় রকমের একটা কিছু সে চাইবে। কিন্তু কি চাইবে? মোটর গাড়ী? সেই ভালো। সে এখন রাজার ছেলে। রাজার ছেলের কি পায়ে হেঁটে বেড়ানো চলে? যদি বলো দুদুটো হাতী তো রয়েছে, কিন্তু এ যুগে কি কেউ হাতী চড়ে বেড়ায়? ওদুটো বরং বাহার দেবার জন্যে হাতীশালেই থাকুক, তার বরং তার জায়গায় একখানা মোটর গাড়ী হোক। তবে হ্যাঁ মোটর চালাবার মতো জায়গা এখানে কোথা? সে আছে শহরে। শহরে চলো, দেখতে পাবে কত বড় বড় রাস্তা। আসছে বছর স্কুলটা শেষ কোরে সে শহরে গিয়েই থাকবে—এমন জংলী দেশে কখনো মানুষ থাকে? কিন্তু অতদিন তো অপেক্ষা করা যায় না। তার চেয়ে এক কাজ করলে হয় না? তাদের ফটকের সামনে ঐ যে রাস্তাটা সোজা বেরিয়ে গেছে বাজারের দিকে, ওটা আরও একটু টেনে নিয়ে গেলে খুব লম্বা রাস্তা হয়। ওধারে কয়েক ঘর বাগ্দী আছে বটে, আরও ওধারে কয়েক ঘর কেওরাও থাকে। কিন্তু তাতে কি? ওদের তো উঠিয়ে দিলেই হয়। সে ম্যানেজারবাবুকে সেইটাই জানাবে।

বলা বাহুল্য তার উভয় ইচ্ছাই মঞ্জুর হোল—গাড়ীরও অর্ডার হোল, সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হোল বাগ্দী ও কেওরারা যেন এখনই তাদের তল্পীতল্পা নিয়ে পেছনে হটে যায়।

হুকুম শুনে দুএকজন পাশ থেকে বলে উঠলো, "তাদের যে তিনচার পুরুষের এখানে বাস!"

কথাটা গ্রাহ্য হোল না।

ম্যানেজারবাবু জমিদারতনয়কে জানালেন তাকে কিছু ভাবতে হবে না, দু-পাঁচ দিনের মধ্যেই রাস্তা তৈরী হোয়ে যাবে আর যে দিনই তৈরী শেষ হবে সেইদিনই গাড়ী ও ড্রাইভার তার সামনে হাজির করা হবে।

অমরেশের মনে খুশী আর ধরে না। তার ইচ্ছে পূরণের জন্যে যদি ঐ ছোট-লোকগুলোকে উচ্ছেদ করা হয় তা আর এমন কি?

যথাসময়ে কলকাতা থেকে রাজা নিখিলেশ রায় এসে উপস্থিত হলেন। পাল্কী থেকে নামবামাত্রই স্তাবকের দল ছুটে এলো। কেউ হাত জোড় কোরে নমস্কার করে, কেউ পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

বাস্তুচ্যুত কেওরা-বাগ্দীরাও এল। তারা অবশ্য এল নালিশ জানাতে। ফলে তাদের খুব রূঢ়ভাবেই ভাগিয়ে দেওয়া হোল।

স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হরিনারায়ণ ঘোষও এলেন। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে আসতে বলতে লাগলেন, "বন্ধুগণ, আজ বড় আনন্দের দিন। কিন্তু আর নয়, এইবার আপনারা ওঁকে ছেড়ে দিন। উনি খুব শ্রান্ত।"

স্কুলের সেক্রেটারি সদানন্দ মুখোপাধ্যায়ও ছুটতে ছুটতে আসছিলেন। তিনি দেখলেন প্রধান শিক্ষকমশাই একটু বেশীই এগিয়ে গেছেন। তাঁকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবার জন্যে তিনি বোলে উঠলেন, "এই যে মাস্টারমশাই, আপনিও এসেছেন দেখছি। তা ভালোই হয়েছে। শুনুন, রাজা নিখিলেশ রায়কে আসছে রবিবার সম্বর্ধনা দেবার জন্যে আজই সন্ধেবেলায় স্কুল কমিটির মিটিং ডাকছি। আপনিও আসবেন।"

কথাগুলি বোলে ফেলে তিনি হাঁপাতে লাগলেন।

মজা এই যে, যাঁর মনোরঞ্জনের জন্যে এই প্রতিযোগিতা তিনি কিন্তু ভিজলেন না। তাচ্ছিল্যভরে প্রশ্ন করলেন, "সম্বর্ধনা টম্বর্ধনা আবার কিসের হে?"

"আজ্ঞে আপনার রাজা খেতাব প্রাপ্তিতে আমরা আপনার প্রজারা যে গৌরবান্বিত হয়েছি তা প্রকাশ করার জন্যে—"

"ও! মূর্খ গ্রামবাসী তাহোলে এদ্দিন পরে আমায় বুঝতে পেরেছে?"

হরিনারায়ণবাবু সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। জমিদারের কথা শেষ হবামাত্র বললেন, "আজ্ঞে চাষীভূষি বুঝতে না পারলেও আমরা শিক্ষিতরা তো বুঝি। এই দেখুন না পথে আসতে আসতে যারই সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তাকেই আমি বলছিলুম এ কথা, বলছিলুম বাংলা দেশে তো এত জমিদাব রয়েছে কিন্তু এত বড়ো সম্মানের অধিকারী ক'জন হোতে পেরেছে? "

"সমঝদার লোক তাহোলে আছে! বাঃ! বাঃ!" বলতে বলতে নিখিলেশ রায় পা পা কোরে প্রাসাদের দিকে এগোতে লাগলেন।

সকলেই চলতে লাগলো তাঁর সঙ্গে।

ওদিকে সেক্রেটারি রাগে ফুলতে লাগলেন। ফোলবারই কথা। নিখিলেশ রায় তাঁর সঙ্গে কথা কইছিলেন, কি দরকার ছিল হরিনারায়ণবাবুব ওপর-পড়া হওয়াব? মনে মনে তিনি বলতে লাগলেন, "ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া? আচ্ছা দাঁড়াও। মনে রেখো আমি তোমার হাতে নই, তুমি আমার হাতে।"

সকলকে নীরব দেখে রাজাসাহেবই বলতে লাগলেন, "তা তুমি ঠিকই বলেছ হেডমাস্টার। আমার চেয়ে সত্যিই তো কত বড় বড় জমিদার রয়েছে, তারা কত সাধাসাধিও করছে। এই তো রাজসাহীর মুখুয্যে লাটসাহেবকে তার জমিদারিতে নিয়ে গিয়ে কত তোয়াজই না করলে। কিন্তু তা বললে কি হয়? সরকার বাহাদুরের তো একটা বিচার আছে। গত যুদ্ধে সরকারকে টাকা তুলে দিয়ে আমার মত সাহায্য করেছে কে?"

সদানন্দবাবু দেখলেন সব ঝোলটাই হরিনারায়ণবাবুর কোলে চলে যাচ্ছে, কাজেই আর চুপ থাকা উচিত নয়। তাড়াতাড়ি তিনি বলে উঠলেন, "কি যে বলেন! জমিদার অনেক থাকতে পারে কিন্তু আপনার মতো কৃষ্টিসম্পন্ন জমিদার বাংলা দেশে ক'জন আছে? এই তো সেদিন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে জমিদার সংঘে আপনি যে বক্তৃতা দিলেন ক'জন তা দিতে পারে? 'ধন্যি ধন্যি' পড়ে গিয়েছিল।"

"আপনারা এসব খবর রাখেন তাহোলে?"

"আজ্ঞে রাখবো না?" বোলে উঠলেন হরিনারায়ণবাবু। "আপনি হলেন আমাদের মাথার মণি, আপনার গৌরবেই আমাদের গৌরব। কিন্তু আর না। আমরা সব এবার যাই। আপনাকে আর বিরক্ত করা উচিত হবে না। আপনি বিশ্রাম করুন গে।"

"আচ্ছা আচ্ছা। আবার দেখা হবে। নমস্কার।" বলতে বলতে জমিদার বিরাট সিঁড়ি বেয়ে বারান্ডায় উঠে গেলেন।

সদানন্দবাবুর আফসোস আর ধরে না। তিনি এসেছিলেন এই তালে যদি জমিদারবাবুকে তুষ্ট কোরে নদীর ধারের জমিটা বাগিয়ে নেওয়া যায়। আলোচনাটা হঠাৎ এভাবে হরিনারায়ণবাবু ভেঙে দেবেন তা তিনি ভাবতেই পারেননি। মনে মনে তাঁকে জাহান্নামে পাঠাতে পাঠাতে তিনি বাড়ী ফিরলেন।

হরিনারায়ণবাবুও বিনা উদ্দেশ্যে আসেন নি। তাঁর মাইনে বাড়ানোর দরখাস্তটা এক বছর ধোরে কমিটির কাছে পড়ে আছে। সেক্রেটারির হাতেপায়ে ধোরেও কিছু হচ্ছে না। কাজেই এই সুযোগে যদি কমিটির সভাপতি জমিদারবাবুকে দিয়ে ওটা পাস করিয়ে নেওয়া যায় এই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

দেখতে দেখতে নিখিলেশ রায়ের রাজা-খেতাব-প্রাপ্তির সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। চারদিকে সম্বর্ধনার ধূম পড়ে গেল। সুযোগসন্ধানীরা এই সুযোগে কিছু হাতিয়েও নিলো।

উৎসবে মুখরিত হোয়ে উঠলো নওগাঁর প্রাসাদ। তোরণদ্বারে বসলো নহবৎ। এক মাস ধোরে চললো খানাপিনা নাচগান আমোদপ্রমোদ। নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতদের ভীড়ে সারা প্রাসাদ গমগম করতে লাগলো।

কোলকাতা থেকে বহু ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা এলেন। বিশেষ খাতির

কোরেই তাঁদের আনা হোল। তার এক নম্বর কারণ তাঁরা রাজার জাত। দু নম্বর, তাঁদেরই পূর্বপুরুষের অনুগ্রহে রায়েদের এ জমিদারি। তিন নম্বর, তাঁদেরই দয়ায় নিখিলেশের রাজা উপাধি লাভ। কাজেই তাঁরা হোলেন সকলের চেয়ে সম্মানার্হ অতিথি। দামী দামী বিলিতী মদ ও বিশেষ বিশেষ খানার ব্যবস্থা হোল তাঁদের জন্যে। তাঁরাও অকৃপণভাবে সমস্ত রকম আমোদপ্রমোদে যোগ দিয়ে, নেচে, গেয়ে, হৈ-হুল্লোড় কোরে উৎসবক্ষেত্র মাতিয়ে তুললেন।

বিদায়ের পূর্বে বাইজী ও নর্তকীরা ভালোই পুরস্কার পেল। একজনকে তো জমিদার নিজহাতে দশ হাজার টাকা দামের একটি মুক্তোর হার উপহার দিলেন।

প্রজারা বললে, হ্যাঁ, রাজার যুগ্যি সমারোহ বটে। এমন উৎসব তারা জীবনে কখনো দেখেনি।

উৎসবশেষে হঠাৎ রাজা নিখিলেশ রায় খুব অসুস্থ হোয়ে পড়লেন। ডাক্তারেরা তাঁকে হাওয়াবদলের জন্যে কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে আসতে পরামর্শ দিল। কথাটা তাঁরও মন্দ লাগলো না।

সেদিন রাত্রে। নিখিলেশের চোখে ঘুম নেই। রোজকার অভ্যাস মতো আজও তিনি বারান্ডায় বোসে গেলাসের পর গেলাস শেষ কোরে চলেছেন।

চতুর্দিক অন্ধকার। কেউ কোথাও নেই। কেবল যা জোনাকিরাই ছোটাছুটি করছে। মনে হচ্ছে তারা যেন আলো জেবলে জেবলে কার সন্ধানে ঘুরছে।

নিখিলেশ ভাবতে লাগলেন হ্যাঁ ডাক্তারদের পরামর্শ একদিকে থেকে বেশ সময়োপযোগীই বটে। এখানে স্ত্রী পুত্র ও প্রজাদেব মধ্যে বসে জীবনকে ঠিক মতো উপভোগ করা যাচ্ছে না। অবশ্য তাঁকে বাধা দেবারই বা কে আছে? কারও জানতে বাকী নেই যে মদ ও মেয়ে না হোলে নিখিলেশ রায়ের চলে না। নিজের স্ত্রী থাকতেও বহু রাত্রি বহু রমণীকে নিয়ে তিনি এই প্রাসাদে, কখনও বা প্রাসাদসংলগ্ন ঐ প্রমোদোদ্যানে কাটিযেছেন। কত নারীর সর্বনাশ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আজ পতিতালয়ে, কেউ কেউ বা রাস্তায় ভিক্ষে কোরে বেড়াচ্ছে। তা সত্ত্বেও কেউ টুঁ শব্দ করতে পারে?

কিন্তু কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে। স্ত্রীব সঙ্গে মনোমালিন্য তো লেগেই আছে। আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী, এমন কি প্রজারা পর্যন্ত কানাকানি করে। সবচেয়ে বড় অসুবিধে—ছেলের বযস হচ্ছে, তার কানে এসব উঠলে বা চোখে পড়লে দেখতে শুনতে তেমন ভালো হবে না।

আর এই সমস্ত কারণেই তো এদানিং বেশ সংকোচের সঙ্গেই তাঁকে চলতে হচ্ছে। এই তো এত বড়ো উৎসব গেল কিন্তু তিনি কি প্রাণভরে আনন্দ করবার সুযোগ পেলেন? ঐ যে নতুন মেয়েটা, মতি বাইজী, ওকে তাঁর খুবই ভালো লেগেছিল। ওকে যখন তিনি মুক্তোর হার উপহার দিয়ে আরও কিছুদিন থেকে

যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন, সঙ্গে সঙ্গেই ও রাজী হোল, কিন্তু পরে তিনিও বুঝলেন আর তারও হাবভাবে প্রকাশ পেল এখানে অবাধ মেলামেশা সম্ভব নয়।

এক হচ্ছে কোলকাতায় গিয়ে থাকা। কিন্তু সেখানে এতো টাকা দেনা পড়ে গেছে যে গেলেই পাওনাদাররা বিরক্ত করবে।

একমাত্র রাস্তা বাইরে কোথাও কাটিয়ে আসা। ডাক্তাররা ঠিকই পরামর্শ দিয়েছেন। সেখানে মতি বাইজীকেও মিলবে, আরও অনেক সুন্দরীও মিলবে।

কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? মধুপুর? উঁহু, ওয়াল্টেয়ার। উঁহু, পুরী। হ্যাঁ পুরীই ভালো। না, তার চেয়ে যখন বেরোনোই হচ্ছে তখন আরও পাঁচটা জায়গা ঘুরে এলে মন্দ হয় না।

কিন্তু প্রশ্নটা টাকার। অন্তত হাজার পঞ্চাশ তো বটে। এইখানেই মুস্কিল। হাতে তো কপর্দক নেই, বরং দেখা যাচ্ছে উৎসব করতে গিয়ে দেনা আরও বেড়ে গেছে। তা হোক। টাকা তাঁর চাইই। না হোলে কিসের জমিদারি?

হঠাৎ কার ছায়া পড়লো। রাজাসাহেবের মনে হোল কে যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

"কে?"

"আমি সমরেশ, দাদা।"

"সমরেশ! সমরেশ! তুমি কেমন কোরে এলে?"

সঙ্গে সঙ্গে নিখিলেশের হাত থেকে গেলাসটা ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল।

"ভয় হচ্ছে দাদা? আমি পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছি—সেই, সেই যেখানে তুমি আমায় নির্বাসন দিয়েছিলে।"

"পালিয়ে এসেছ? ওরা কি তবে—"

"ওরা আমার ওপর খুবই কড়া পাহারা রেখেছিল, যেমনটি তুমি চেয়েছিলে। আর সেইজন্যেই গত আট মাস ধোরে এত চেষ্টা কোরেও আমি মুক্ত হোতে পারিনি। মাত্র পরশু, অনেক কষ্টে—হ্যাঁ, অনেক কষ্টে, কিন্তু সে কথা এখন থাক, দাদা। আচ্ছা বল তো কেন তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছো? আমি কি সত্যিই পাগল? কেন তুমি আমায় পাগলা গারদে বন্দী করে রেখেছ? তুমি কি ভাবছো আমি বুঝতে পারি না? আমি বুঝি সবই। আমায় ফাঁকি দেবার জন্যেই তোমার এ ষড়যন্ত্র। কিন্তু কেন? আমিও কি বাবার ছেলে নই? এ জমিদারি এ প্রাসাদ, এতে কি আমারও অংশ নেই? কেন তবে আমায় বঞ্চিত করছো? চুপ কোরে আছ কেন? জবাব দাও।"

হাঁপাতে হাঁপাতে সমরেশ মেঝের ওপর বসে পড়লো। দুদিন না খেয়ে এবং অনেকখানি পথ হেঁটে তার শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া প্রাসাদে পা দেওয়া অবধি কেমন এক অজানা ভয়ে তার বুক কাঁপছিল।

ওদিকে নিখিলেশও অভিভূত হোয়ে পড়েছিলেন। তিনি যেন কথাই খুঁজে পাচ্ছেন না। সত্যিই তো, কি উত্তর দেবেন? মনের অজানা তো পাপ নেই। যতক্ষণ ছোট ভাই কথা বলছিল ততক্ষণ তাঁর মনে হচ্ছিল সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। এ কি সত্য, না স্বপ্ন? সুরাসুদ্ধ বোতলটা তিনি মুখের মধ্যে পুরে দিলেন।

এইবার যেন তিনি সম্বিৎ খুঁজে পেলেন। ধীর সংযত কণ্ঠে বললেন, "সমরেশ, তোমায় ফাঁকি দেবার হীন মতলব আমার নেই। সত্যিই এক সময়ে তোমার মাথা খারাপ হয়েছিল। তোমার সুচিকিৎসার জন্যেই আমি তোমায় হাসপাতালে দিয়েছিলুম। কিন্তু এখন দেখছি তুমি ভালো হয়েছ। তোমার ভয় নেই, আমি তোমায় তোমার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবো না।"

জ্যেষ্ঠের কথা শুনে সমরেশ অবাক হয়ে গেল। সত্যিই কি তাহোলে তার মাথা খারাপ হয়েছিল? পূর্বেকার ঘটনা সে স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগলো। একদিন রাত্রে খাওয়ার পর হঠাৎ তার মনে হয়েছিল তার খাদ্যে যেন কি মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। খাবাব সঙ্গে সঙ্গেই সে ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়লো। তারপর কয়েকদিন ধোরে কি হোল আর কি না হোল তাব কিছুই মনে পড়ে না। শুধু এইটুকুই মনে পড়ে যে তারপব থেকে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই তাকে পাগল বোলে ক্ষেপাতে লাগলো। তারা এতটা বাড়াবাড়ি করলো যে তার জীবন অতিষ্ঠ হোয়ে উঠলো। ভয়ে সে লোকালয় ছেড়ে নির্জনে গিযে থাকতে লাগলো। সেখানেও নিষ্কৃতি নেই। অবশেষে একদিন তাকে জোর করে পাগলা গারদে নিয়ে যাওয়া হোল। পথে সে খুবই চেঁচামেচি করলো। পালিয়ে যাবার চেষ্টাও করলো। কিন্তু বৃথা। তার হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হোল। সঙ্গে যারা গিয়েছিল তাদেব মধ্যে একজন গারদের অধ্যক্ষকে এক পাশে নিয়ে গিযে তাঁর হাতে একতাড়া নোট গুঁজে দিয়ে কানে কানে কি বললো। তারপর থেকে তাকে বন্দী কোরে রাখা হোল। চতুর্দিকে প্রকাণ্ড উঁচু পাঁচিল, কোথাও ছিদ্রটি পর্যন্ত নেই। কত সময়ে সে অধ্যক্ষ্যকে কত অনুনয়বিনয় কোরে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে সে পাগল নয়। কিন্তু কোনই ফল হয়নি। সে তখন পালাবার চেষ্টা কবতে লাগলো। বাববার চেষ্টা কবলো। তাতে হোল এই যে তাব প্রতি আরও কড়া ব্যবস্থা হোল। আর সে সহ্য করতে পারলো না, দুঃখে নৈরাশ্যে ভেঙে পড়লো। তারপর কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই না এই ক' মাস কেটেছে! সে কথা ভাবতে হোলে এখনও তার বুক কেঁপে ওঠে। কিন্তু আজ সে এখানে এসে কি শুনছে? তাকে ফাঁকি দেবার কোন হীন মতলব তার দাদার নেই? তবে কি সত্যিই সে পাগল হোয়ে গিয়েছিল? হয়তো বা হবে। না হোলে কেমন কোরে সে ভাবতে পারলো তার সহোদর ভাই চক্রান্ত কোরে তাকে পাগলা গারদে পুরে রেখেছে? তার চোখে জল এল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বোলে উঠলো, "দাদা, দাদা, আমায় ক্ষমা কর। হয়তো আমি ভুল বুঝেছিলুম। হয়তো আমার মাথা সত্যিই খারাপ হয়ে গিয়েছিল।"

নিখিলেশ ধীর ও গম্ভীরভাবে বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ, তোমার মাথা সত্যিই খারাপ হয়েছিল। সেই জন্যেই তোমার সম্বন্ধে ঐ রকম ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলুম। কিন্তু এখন দেখছি তুমি সুস্থ হয়েছ। বেশ, তোমাকে তোমার প্রাপ্য আমি দু'একদিনের মধ্যেই বুঝিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তুমি যেখানে এতদিন ছিলে সেখানকার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তোমার সুস্থতা সম্বন্ধে একখানা সার্টিফিকেট বার কোরে আনতে হবে। তুমি যে তোমার সম্পত্তি রক্ষা করতে পারবে তা প্রমাণ করবার জন্যেই আইনের দিক থেকে এর প্রয়োজন।"

"সার্টিফিকেটের প্রয়োজন?"

"হ্যাঁ।"

সমরেশ দাঁড়িয়ে কি ভাবতে থাকে, তারপর বলে, "বেশ, তুমি আনিয়ে নাও।"

"কিন্তু এভাবে তারা দেবে কেন? বরং তারা যখন শুনবে তুমি তাদের শৃঙ্খলা অমান্য কোরে পালিয়ে এসেছ তারা তোমায় গ্রেপ্তার কোরে আবার নিয়ে যেতে পারে।"

কথাটা এদিক থেকে সমরেশ ভেবেই দেখেনি। তা হোলে এখন উপায়? এতো চেষ্টা তার ব্যর্থ হবে? নৈরাশ্যে সে যেন ভেঙে পড়ে, উত্তর দিতে পারে না।

নিখিলেশ বলতে লাগলেন, "তার চেয়ে আমি বলি কি তুমি ফিরে যাও, আত্মসমর্পণ করো। আমি বরং তাড়াতাড়ি তোমায় মুক্তি দেবার জন্যে—"

"দাদা, দাদা, আমায় আর সেখানে পাঠিয়ো না। আর আমি বন্দী হোয়ে থাকতে পারবো না। আমি সম্পত্তি চাই না। আমাকে শুধু একটু মুক্ত হাওয়ায় এখানে আমার জন্মস্থানে থাকতে দাও।"

নিখিলেশ কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর খুব শান্ত ও ধীর কণ্ঠে বললেন, "সমর, তোমাকে খুব শ্রান্ত মনে হচ্ছে। পরে এ নিয়ে আরও আলোচনা করা যাবে। এখন তুমি বিশ্রাম করোগে। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করবো না। জেনে রেখ যা-কিছু আমি করেছি তোমার ভালোর জন্যেই করেছি। কিন্তু আর না, যাও তুমি বিশ্রাম করো গে। নদীর ধারে যে বাড়ীখানা তুমি থাকবে বোলে তৈরি করেছিলে ওটা এখনও ঠিক তেমনিই পড়ে আছে তোমার জন্যে। হালে আবার আমি তা চুণকাম করিয়ে রেখেছি। তোমার সেই বুড়ো মালীও এখনও ঠিক সেই রকমই আছে। যাও, তাকে গিয়ে ডেকে তোল গে, সে তোমার এক্ষুনি খাওয়া শোওয়ার ব্যবস্থা কোরে দেবে। যাও, আর দেরী কোরো না।"

নিঃশব্দে মাথাটি হেঁট কোরে সমরেশ বেরিয়ে গেল।

নিখিলেশ গেলাসে চুমুক দিলেন। ভালো লাগলো না। আচ্ছা উৎপাত তো!

কাঁটাটাকে কি কিছুতেই সরানো যাবে না? খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হোল, কিছু হোল না। পাগলা গারদে দেওয়া হোল, ভাবা গিয়েছিল একটা হেস্তনেস্ত হবে, কিন্তু কি আশ্চর্য, আট মাস পরে কিনা উল্কার মতো এসে হাজির হোল! কি করা যায় এখন? লোকে ওকে প্রায় এক বছর না দেখে একরকম ভুলেই গেছে। ওর সম্বন্ধে কারও মুখে আর রাটিও নেই। কিন্তু কাল সকালে উঠে আবার যখন দেখতে পাবে... না, না, ওকে আর দেখতে দেওয়া হবে না, তা হোলে আর ওকে কিছুতেই সরানো যাবে না। এমন অনেকে আছে যারা ওকে বড্ড পছন্দ করে। ওকে পাগলা গারদে পাঠাবার সময়ে সেবার কি গুঞ্জনই না উঠেছিল চারদিক থেকে। না, না, না, সকাল হবার আগেই...কিন্তু সকাল হবার আগে কি করা যাবে?

কি করা যাবে তা ভাবতে গিয়ে নিখিলেশ নিজেই শিউরে উঠলেন: অসম্ভব! গেলাসে তিনি আবার চুমুক দিলেন।

অসম্ভব! অসম্ভব!

কিন্তু কেন অসম্ভব? না, না, এ তাঁর দুর্বলতা।

আবার চুমুক দিলেন।

না, না, এ দুর্বলতা চলবে না। যা করবার এখনই কোরে ফেলতে হবে।

একটু দূরে তাঁর দেহরক্ষী ঝগড়ু সরদার বিরাট গোঁফজোড়া নিয়ে নাক ডাকিয়ে পাথরের মেঝের ওপর ঘুমুচ্ছিল। রোজই রাত্রে সে মনিবকে পাহারা দেবার জন্যে এখানে উপস্থিত থাকে। নিখিলেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকলেন, "ঝগড়ু! ঝগড়ু!"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো ঝগড়ু, "কি হুকুম রাজাসাহেব?"

"ঐ যে, ঐ যে লোকটাকে যেতে দেখছিস না?"

হাতের তালু দিয়ে চোখদুটো পরিষ্কার কোরে নিয়ে ঝগড়ু বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ।"

"আমি চাই তুই এক্ষুনি ছুটে গিয়ে ওকে একেবারে শেষ কোরে নদীর জলে ফেলে দে।"

"আদ ঘণ্টার মধ্যেই কাজ হাসিল কোরে ফিরে আসছি দেখে নিয়ো। কিন্তু ক' বোতল দেবে বলো?"

"যত চাস।"

ঝগড়ু ছুটে গেল।

পরদিন সকালবেলা। কাছারীবাড়ীতে কর্মচারীরা বসেছে কাজে। দু'চারজন প্রজাও আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। তারা এসেছে তাদের অভাব অভিযোগ জানাতে।

কাছারীর বাইরে একটু দূরে গুটিকয়েক গোরু দাঁড়িয়ে। তাদের সামনে তাদের সুন্দর নধর বাছুরগুলি, কোনটা ছুটছে, কোনটা লাফাচ্ছে, কোনটা ডাকছে।

গোয়ালারা এসেছে দুধ দুইতে। চাকররা তাদের খুব বকাবকি করছে তারা দেরী কোরে এসেছে বোলে।

চারদিক সুন্দর। চারদিক উজ্জ্বল। লোকের আনাগোনাও ক্রমশ বাড়ছে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল কাছারীর বাইরে বারান্ডায় দুজন প্রৌঢ় এসে বসলো—একজন পাওনাদার, অপরজন সাহায্যপ্রার্থী।

পাওনাদারকে এই মাত্র জানানো হোল টাকা পেতে তার দেরী হবে।

"তবু কত দেরী?" এগিয়ে এসে পাওনাদার বিনয়ের সহিত জিগগেস করলো।

"তা অন্তত ছ' মাস।"

"সে কি ম্যানেজারবাবু? আমার কারবারে যে তাহোলে তালাচাবি পড়বে! না, না, দোহাই আপনার, টাকাটা যাতে দু'এক হপ্তার মধ্যেই পাই তার ব্যবস্থা করুন।"

"ব্যাপার কি আমাদের হাতে এখন টাকা নেই। কত বড় উৎসব গেল দেখলে তো। কমসে কম পাঁচ লাখ টাকা খরচ হোয়ে গেছে।"

"যেখানে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করলেন সেখানে আব এই গরীবের সামান্য কয়েক হাজার টাকা আটকে রাখছেন কেন? দোহাই আপনার।"

"আরে ও টাকা কি আর সব ঘর থেকে বার করতে হয়েছে? বেশীর ভাগ জিনিসই তো মিলেছে ধারে। কিন্তু কই অন্যান্য পাওনাদাববা তো তোমার মতো—"

"ক্ষমা করবেন। আমার পুঁজী খুবই কম। সেই জন্যে আমাব পক্ষে ফেলে রাখা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু কি করবো? উপায় নেই।"

"তাহোলে আমায় যদি একবাব জমিদারবাবুব সঙ্গে দেখা কবতে দেন, তাঁকে একটু বলি।"

বুড়ো দীনু বোসে বোসে এতক্ষণ নীববে টানাপাখা টানছিল। তাড়াতাড়ি বোলে উঠলো, "জমিদারবাবু বলা আর চলবে নি গো। বাজাসাহেব।"

"আচ্ছা আচ্ছা, রাজাসাহেব। রাজাসাহেবের সঙ্গে যদি একটু দেখা করতে দেন?"

"বেশ, বোস। তিনি এখনো ওঠেননি। উঠলে দেখা হবে।" গম্ভীরভাবে ম্যানেজারবাবু বললেন।

পাওনাদার সরে এসে বেঞ্চির ওপর স্থান গ্রহণ কবলো।

এইবাব সাহায্যপ্রার্থীটি সাহস কোরে এগিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়ালো।

"কি চাও?" ম্যানেজারবাবু প্রশ্ন করলেন।

"এজ্ঞে আমি কিছু সাহায্যেব আশায এসেচি।"

"আঃ যত সব—না, না, সাহায্য টাহায্য হবে না।"

"এজ্ঞে আমার আজ দুদিন আহার হয়নি।"

"তা কি করবো? কাছারীবাড়ী তো আর অন্নছত্তর নয়।"

ম্যানেজার খাতায় মন দিলেন।

লোকটি আর কিছু বলতে সাহস করলো না, পিছিয়ে এলো।

পাওনাদারটি ফিসফিস কোরে বললে, "রাজারাজড়াদের কাণ্ডই এই। ফূর্তি করতে লাখ লাখ টাকা খরচ হোয়ে যায় কিন্তু পাওনাদারকে দিতে, গরীবদুঃখীকে দিতে হাতটিও ওঠে না।"

সাহায্যপ্রার্থী লোকটি নিরাশহৃদয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

ক্রমে সূর্য মাথার ওপর উঠলো। কর্মচারীরা নাওয়া খাওয়া সারতে যে যার ঘরে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লো। কাছারী ফাঁকা হোয়ে গেল।

তবু রাজাসাহেবের দেখা নেই। অগত্যা পাওনাদারকেও অত্যন্ত নিরাশ ও বিরক্ত হোয়ে বিদায় নিতে হোল।

দুজন কর্মচারী চলেছে সবার পিছনে। ওরাও স্নানাহার করতে বাড়ী ফিরছিল।

"তুমি বিশ্বাস করছো না রমানাথ দা?" শচীনন্দন বললে।

শচীনন্দন চাকরীতে ঢুকেছে বছরখানেক। রমানাথ পুরনো কর্মচারী।

উড়ুনিটা কাঁধের ওপর ঠিক কোরে নিতে নিতে রমানাথ শুধু একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন, কিছু আর বললেন না।

শচীনন্দন বলতে লাগলো, "কিন্তু যার কাছ থেকে আমি শুনেছি সে মিথ্যে বলবার লোক নয়।"

"না ভাই, আমি তো তা বলছি না।"

"তবে চুপ কোরে রয়েছো যে?"

"চুপ কোরে রয়েছি বড় দুঃখে, লোভ মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় তাই দেখে।"

তারপর উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব।

রমানাথ বলতে লাগলেন, "সমরেশ কাল এসেছিল তা আমি জানি। প্রথম রাত্তিরটা ও আমার ওখানেই ছিল।"

"তাই নাকি! তাই নাকি!"

"হ্যাঁ। সন্ধেবেলায় হঠাৎ এসে উপস্থিত। কে বলবে জমিদারের ছেলে? আমার পাদুটো জড়িয়ে ধরে বললে, 'রমানাথদা বিশ্বাস করো আমি পাগল নই। আমায় জোর কোরে দাদা পাগলা গারদে দিয়েছে।' দেখে মনে হোল খিদে-তেষ্টায় ও খুবই কাতর হোয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি তোমার বৌদিকে বললুম দুটি ভাত রেঁধে দিতে। বেশ পেটভোরেই খেলো। যেন কতকাল খায়নি। আমি বললুম, 'সমরেশ রাত্তিরটা আমার কাছেই থাকো। সকাল হোলে দাদার সঙ্গে দেখা কোর।' কিন্তু ও শুনলো না, বললে, 'দাদা জানতে পারলে রাগ করবে। তা ছাড়া এই সময়েই দাদাকে

বেশ নিরিবিলি পাওয়া যাবে।' রাত তখন প্রায় দশটা। বেরিয়ে গেল। ওঃ! হায়, হায়, এ কি হোল! নারায়ণ, এ কি করলে!"

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শচীনন্দন বলে উঠলো, "ভাই হোয়ে ভাইকে যে কেউ এভাবে মারতে পারে কল্পনাই করা যায় না। ইস্!"

"সম্পত্তির জন্যে মানুষ সব পারে শচীনন্দন, সব পারে। সেদিন কাগজে ঠিক এই রকমই আর একটা খবর বেরিয়েছিল। পড়নি? কোথাকার কে এক জমিদার সেও নাকি তার ভাইকে ডাক্তারের সাহায্যে প্লেগের ইনজেকশান দিয়ে মেরে ফেলেছে।"

"ওঃ, কি স্বার্থপরতার জায়গা এ দুনিয়াটা!"

"না ভাই, তা বললে ভুল হবে। সকল মানুষই কিন্তু এমন স্বার্থপর নয়, এমন নীচও নয়। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করলেই তুমি দেখতে পাবে—সম্পত্তিই মানুষকে অমানুষ করে।"

"সে কথা একশোবার।"

দুজনেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চলতে থাকে।

হঠাৎ শচীনন্দন জিগগেস করে, "আচ্ছা রমানাথদা, ছেলেবেলায় বাবার মুখে শুনেছিলুম রায়েদের পূর্বপুরুষরা নাকি ইংরেজ রাজকে এ দেশে কায়েম হোতে খুব সাহায্য করেছিল? আর তার পুরস্কারস্বরূপই নাকি এই জমিদারিটা ওরা পেয়েছে? এ কথা কি সত্যি?"

"হ্যাঁ শচীনন্দন, সত্যি। শুধু রায়েরা কেন, অনেক জমিদারই এই ভাবে জমিদারি করেছে,করেছে দেশের স্বাধীনতা বিক্রি কোরে।"

"তা হোলে তো গোড়াতেই রয়ে গেছে পাপ।"

"তা বৈকি!"

আর কিছুটা পথ যেতেই শচীনন্দনের বাড়ী। শচীনন্দন বিদায় নিল।

রমানাথ একা চলতে লাগলেন। যেতে যেতে মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন, "হা নারায়ণ! এ কি করলে!"

আহারের পর রমানাথ তামাক খেতে খেতে শচীনন্দনের কাছ থেকে শোনা সমস্ত ঘটনা স্ত্রীর কাছে বর্ণনা করলেন। স্ত্রী চমকে উঠলেন. "সে কি গো! কি সর্বনাশ! এ যে বিশ্বেস হয় না!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রমানাথ বললেন, "বড়লোকদের ঘরে সব হয় গো, সব হয়।"

"কিন্তু এ নিয়ে কেউ কিছু করবে না?"

"কে কি করবে বলো?"

"কারও মাথাব্যথা নেই?"

"যে মাথাব্যথা করবে তারই মাথা যাবে।"

"আহা, কেন যে বেচারি এলো!"

"পাগল অপবাদ নিয়ে বন্দী হোয়ে কে চিরকাল থাকতে চায় বলো? এসেছিল শান্তি পাবে বোলে, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থাকবে বোলে।"

"ওঃ! বৌটা যখন শুনবে!"

"শুনবে একদিন নিশ্চয়ই। তখন খুব কাঁদবে। কিন্তু ওকে আর ফিরে পাবে না।"

রমানাথপত্নীর চোখ জলে ভরে গেল।

রমানাথ বললেন, "সমরেশের শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে না?"

"হ্যাঁ। ওর বড় শালীর সঙ্গে তো আমার খুবই ভাব ছিল। আমরা একসঙ্গে খেলাধুলো করতুম। ওর বৌকে তো আমি কোলে পিঠে নিয়ে বেড়িয়েছি। এখন কিন্তু ওর শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা বড় খারাপ।"

গৃহিণী অনেকক্ষণ ধোরে কি যেন ভাবে, তারপর হঠাৎ বলে "আচ্ছা, হ্যাঁগো, ওর স্বামীর অংশ ও পাবে তো?"

"আরে! কি বোকা মেয়ে তুমি! যাতে না পায় সেই জন্যেই তো এই ষড়যন্ত্র। এটা বুঝছো না?"

"তাহোলে জমীদাবেব বৌ হোয়েও মেয়েটা পথে বসবে?"

রমানাথ চিন্তিত মনে হুঁকোয় ফুঁ দিতে লাগলেন।

"কি হোল? উত্তব দিচ্ছো না?" পত্নী দাবী করেন।

"উপায় অবিশ্যি আছে। সেই কথাটাই ভাবছি। আচ্ছা, সমরেশেব স্ত্রী যেন অন্তঃসত্ত্বা বোলে শুনেছি না?"

"হ্যাঁ।"

"যদি পুত্রসন্তান হয় তাহোলে অবিশ্যি একটা রাস্তা হোতে পারে। অর্থাৎ তখন পিতার অংশে ছেলেব দাবী জানিয়ে মা মামলা করতে পারে। তবে তাহোলে যেন ও আর এমুখো না হয। তাহোলে ওর সর্বনাশ হোয়ে যাবে। অন্তত তা করতে নিখিলেশ বায় চেষ্টার ত্রুটি করবে না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ওকে আজই খবব পাঠাচ্ছি।"

"কি ভাবে পাঠাবে?"

"দেখো না।"

"তবু?"

"কেনার মার মামার বাড়ী যে ওইখানে। ওকে দিয়ে—"

"অবিশ্যি খবর পাঠাতে পাবলে, এমনকি আজই পাঠাতে পারলে ভালো। কেননা, সমরেশের মৃত্যুখবর পেলেই ও হযতো ছুটতে ছুটতে এখানে চলে আসবে। কাজেই তার আগে সাবধান কোরে দেওয়া দরকার। কিন্তু দেখো এসব কথা যেন পাঁচজনের মধ্যে না ছড়ায়। তা হোলে কিন্তু আমাদেরও ঘাড়ে আর মুণ্ডু থাকবে না।"

"না গো না, ও তেমন মেয়ে নয়, ওর পেট থেকে কথা বার করতে কেউ কোনদিন পারে নি।"

"তা হোলেই হোল। কিন্তু মামলা চালাতে হোলে যে অনেক টাকা দরকার। টাকা পাবে কোথায়? ওব বাপের যে টাকা নেই নিখিলেশ তা খুব ভালই জানে।"

"যাই হোক বাপু। মেয়েটাকে বাঁচাতেই হবে। টাকার চেষ্টা করলে হয়তো ধারও পেতে পারে।"

"আমার মতো গরীবের দ্বারা কিই বা হোতে পারে বলো?"

"দরকারের সময়ে কাঁকে দিয়ে যে কি হয় কেউ বলতে পারে না।"

"দেখা যাক্। নারায়ণ! নাবায়ণ!"

বিশ্রাম নেবার জন্য রমানাথ হুঁকোটি নামিযে রাখলেন।

মাস দুই কেটে গেছে। অন্যান্য দিনের মতো আজও বিকেলে জমিদারপুত্র মোটবে বেড়াতে বেরিয়েছে। কেওরা ও বাগ্দীদেব উচ্ছেদ কোরে যে রাস্তাটা তার জন্যে তৈরী হয়েছে সেই বাস্তাটার ওপর দিয়ে যখন তার মোটর ছুটে যায় দুধারের লোক হাঁ কোরে চেয়ে থাকে।

দু একদিন হোল অমরেশ নিজেই মোটর চালাচ্ছে, ড্রাইভারকে পাশে রেখে অবশ্য। ড্রাইভারের জায়গায় বোসে সে হুইল ঘোরায় আর গাড়ীর গতি ক্রমশই বেড়ে চলে। আজও তাই।

জোরেই ছুটে চলেছে গাড়ী। হঠাৎ মোড়ের মাথায় এক গোরুর গাড়ীর সঙ্গে লাগলো ধাক্কা। রাস্তার ধারে একটি ছোট ছেলে খেলছিল। গাড়ী ঘুরে গিয়ে একেবারে তার ওপর দিয়ে চলে গেল।

গাড়ী থামিয়ে ড্রাইভার তাড়াতাড়ি নেমে এল। অমবেশও নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল দূর থেকে ছুটে আসছে ছেলেটির মা, "ওগো আমার কি সব্বনাশ হোল গো!" বোলে চেঁচাতে চেঁচাতে।

মুহূর্তের মধ্যেই শত শত লোক জড়ো হোযে গেল। ছেলেটির দেহে তখন আর প্রাণ নেই।

মা মাটিব ওপর আছড়ে পড়লো। জনতার অধিকাংশই ছিল সেই উৎখাত বাগ্দী ও কেওরা এবং ছেলেটিও তাদেরই ঘরের। ফলে তাদের জমানো রোষ যেন ফেটে পড়তে লাগলোঃ

"অ্যাঁ! গরীব বোলে আমাদের জীবনের দাম নেই? এ আমরা কিছুতেই সইবো না।"

গোমস্তা শচীনন্দন এই সময়ে দুপুরের বিশ্রাম সেরে কাছারীবাড়ী আসছিল। গোলমাল শুনে দ্রুত এগিয়ে এসে সে দেখে এই অবস্থা। ব্যাপারটা সে সমস্ত শুনলো। চেয়ে দেখলো একটা লোক জমিদারপুত্রের হাত ধোরে বলছে

"এমনি কোরে তোমরা আমাদের মারবে? অথচ একদিন না আমাদেরই পূর্বপুরুষ তোমাদের রক্ষে করতো?"

অমরেশ গর্জন কোরে ওঠে, "খবরদার! হাত তুলে নাও বলছি।"

আর যায় কোথা। জনতা একেবারে ক্ষেপে উঠলো ঃ "কি! এর পরেও রোখ! তবে রে—"

শচীনন্দন দেখলো অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, "অমরেশ ক্ষমা চাও। ছেলেটাকে মেরে ফেললে, তবু গরম দেখাতে তোমার বিবেকে বাধছে না?"

বেগতিক দেখে ড্রাইভার তাড়াতাড়ি গাড়ীর মধ্যে লাফিয়ে পড়ে অমরেশকে টেনে নিলো। তারপরই দিল গাড়ী ছেড়ে।

জনতা ছাড়বার নয়। 'ধর্, ধর্' করতে করতে তারা গাড়ীর পিছন পিছন ছুটতে লাগলো।

রাজাসাহেব তখন বারাণ্ডায় বোসে হাওয়া খাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখেন ছেলের মোটরখানা খুব জোরে ছুটে আসছে আর তার পিছন পিছন আসছে শত শত লোক মারমুখো হোয়ে। তিনি অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ও বিচলিত হোয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে দরোয়ানকে ডেকে বললেন ব্যাপারটা কি দেখতে।

দারোয়ান বেরোতে না বেরোতেই মোটর ও তার সঙ্গে সঙ্গে শত শত লোক হৈ হৈ করতে করতে একেবারে গেটের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

কেবল চিৎকার ও কলরব, আর কিছু না। তার ভেতর থেকে বার বার শোনা যাচ্ছে "কোথা রাজাসায়েব? ডাকো রাজাসায়েবকে। বিচার চাই।"

রাজাসাহেব কিছুই বুঝতে না পেরে শুধু হতবাক হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আবার চিৎকার ঃ "কোথা রাজাসায়েব? ডাকো রাজাসায়েবকে।"

রাজাসাহেব এইবার আগুন হোয়ে উঠলেন। কি! এতবড় স্পর্ধা! কি ভেবেছে ঐ ছোটলোকগুলো! প্রাসাদ চড়াও হোয়ে তাঁকে হুকুম!

ছুটে গিয়ে তিনি বন্দুকটা বার কোরে নিয়ে এলেন। তারপর বারাণ্ডার ধারে দাঁড়িয়ে চিৎকার কোরে বলতে লাগলেন, "এই কুকুরগুলো, তোরা যদি এক মিনিটের মধ্যে এখান থেকে চলে না যাবি তাহোলে গুলি কোরে তোদের মাথার খুলি উড়িয়ে দোব।" বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুচারটে ফাঁকা আওয়াজও করলেন।

ব্যাস! সব ঠাণ্ডা। কারও মুখ থেকে আর একটা কথাও বেরোল না।

রাজাসাহেব দাঁতে দাঁত দিয়ে আবার বলতে লাগলেন, "কি! এখনও সব নড়ছিস না? দেখবি তবে?"

জনতা বুঝলো তারা একান্তই অসহায়। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানে আরও বিপদ ডেকে আনা।

অপমানে, দুঃখে, রাগে ফুলতে ফুলতে মাথা নত কোরে তারা চলে গেল।

বিশেষ জোর দিয়েই জমিদারপত্নী নিরুপমা বললেন, "না, না আর ওকে এখানে রাখা কিছুতেই চলবে না।"

"কিন্তু ওরা কি অতটা সাহস করবে?" নিখিলেশ উত্তর করলেন।

"কি যে বলো? অতটা সাহসই তো করেছিল। দেখলে না কি রকম তেড়ে এসেছিল? বন্দুক ছিল তাই রক্ষে।"

"তবে! বন্দুক যখন আছে তখন ভয় কিসের?"

"বারে! বন্দুক নিয়ে নিয়ে ঘুরবে নাকি? ছোট ছেলে কিছু সকল সময়ে বাড়ী বোসে থাকতে পাবে না। যখন বেবোবে সেই সময়ে যদি ওরা দল বেঁধে—"

"তা বটে।"

জিনিসটা নিখিলেশকে ভাবিয়ে তুললো। কিছুক্ষণ থেমে তিনি বললেন, "কিন্তু তাহোলে কোথায় পাঠাবে ভাবছো? কোলকাতার বাড়ীতে?"

"সেখানে হোলে তো ভালোই হয়। কিন্তু ও কি একলা থাকতে পারবে?"

"বেশতো, তুমিও গিয়ে থাকোনা। না হয় দু'একজন চাকর সঙ্গে নিয়ে যাও।"

"আমার কোলকাতা ভালো লাগে না।"

মুখে এ কথা বললেও এ কিন্তু নিরুপমা দেবীর মনের কথা নয়। মনে মনে তিনি বললেন, "হ্যাঁ আমি যাই আর সেই সুযোগে তুমি এখানে বোসে পাঁচজনের বৌ ঝিকে টেনে এনে যা তা কবতে থাকো।"

নিখিলেশ তবু জিদ করতে লাগলেন, "পাঁচবার যেতে যেতে তবেই তো ভালো লাগে। দেখোই না এবাব গিয়ে।"

স্বামীর আগ্রহাতিশয্য লক্ষ্য কোবে নিবুপমা মনে মনে হাসলেন, কিন্তু রাজী হলেন না। বললেন "তার চেয়ে বরং কোলকাতায় দাদার কাছে রেখে আসি। সেখানে লেখাপড়াও হবে আবাব শাসনেও থাকবে।"

"যা ভালো বোঝ করো, তোমার ছেলে—"

"বা রে! তোমাব ছেলে নয় বুঝি?"

"আমার হোলে তো আমার কথাই থাকতো।"

আপস কোরে নেবার জন্যে নিরুপমা তাড়াতাড়ি বললেন, "না, না বাগ কোর না, কোলকাতা আমার সত্যিই ভালো লাগে না।"

"তা বেশ, তাই হোক। তোমার দাদাব ওখানেই গিয়ে থাকুক।"

"হ্যাঁ। তাব পব কিছুদিন পরে আবার নিয়ে এলেই চলবে। তখন আর লোকের এতো রাগ থাকবে না, সব ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে।"

"আমি বলি কি ও যখন বাইরেই যাচ্ছে তখন লেখাপড়াটা না হয় ঐখানে বোসেই শেষ করুক। একবার এখান একবার ওখান করলে পড়াশুনোর ক্ষতি হবে।

আর সেই যখন ইস্কুল শেষ হোলে কলেজে পড়তে কলকাতাতেই যেতে হবে।"

"সে পরেকার কথা পরে হবেখন। উপস্থিত কিছুদিনের জন্যে তো দাদার কাছে থাকুক। কালই আমি ওকে রেখে আসি।"

"কিন্তু ওর গাড়ী আর ড্রাইভার?"

"ওর সঙ্গেই যাক। তা না হোলে হয়তো ও যেতে রাজীই হবে না।"

"এ কদিন কিন্তু বেড়িয়ে আমার গাড়ীটার ওপর ভারী লোভ পড়ে গেছে।"

"সে তো আমারও। হাতীর পিঠে চড়ে বেড়াতে আর ভালো লাগে না।"

"তা হোলে আমাদের জন্যে আরেকখানা গাড়ী কেনা যাক। কি বলো?"

"তা মন্দ হয় না। তবে ও রকম ড্রাইভার কি আর মিলবে? ও না থাকলে যে কি হোত! অমরকে ওরা মেরেই ফেলতো।"

"বটে! ব্যাপারটা আমার ভালো কোরে শোনাই হয়নি। একবাব ডাকতো অমবকে. শুনি সমস্ত ঘটনাটা।"

পরদিনই সকালে মার সঙ্গে অমরেশ কোলকাতায় মামার বাড়ী চলে গেল কথা রইল গাড়ী ও ড্রাইভাব দু'এক দিনের মধ্যেই যাচ্ছে।

আকাশ মেঘলা ছিল। নিখিলেশের শবীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল বোলে নীচে নামতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। একটু বেলা হোতেই একজন চাকরকে দিয়ে তিনি কাছারি থেকে শচীনন্দন সামন্তকে ডেকে পাঠালেন। শচীনন্দন আসতে বললেন, "কি হে তুমি আমার অন্ন খাবে আর আমারই সঙ্গে শত্রুতা করবে?"

শচীনন্দন জানতো তাকে এ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হোতে হবে। একটুও ইতস্তত না কোরে সে বললে, "আজ্ঞে, সে কি কথা!"

"সেই কথাই যদি না হবে তাহোলে আমারই ছেলেকে অমন বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছিলে কেন?"

"বিপদে আমি তো তাকে ঠেলে দিইনি। বিপদ সেই তার নিজের দোষে ডেকে এনেছিল।"

"আর তুমি কি করছিলে? যারা মারমুখো হোয়ে উঠেছিল তাদের উস্কে দিচ্ছিলে?"

"আমি মাত্র তাদের পক্ষ নিয়েছিলুম। যে কোন সৎ ব্যক্তিই তা নেবে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে আমি তাদের উস্কে দিয়েছিলুম, বরং আমি তাকে বাঁচাবার জন্যেই—"

"থামো, থামো. খুব হয়েছে। তোমরা যে আমার কতো শুভাকাঙ্ক্ষী ত আমার ভালোই জানা আছে। সুযোগ পেলে কেউ ছাড়ো না। যত সব নিমক-হারাম।"

"রাজাসাহেবের এ ধারণা কিন্তু ভুল। কর্মচারীদের সম্পর্কে এ রকম ধারণা থাকা শুধু ভুল নয়, অন্যায়ও।"

"কি! এত বড় স্পর্ধা! আমার মুখের ওপর কথা! এই ঝগড়ু, লোকটাকে বার কোরে দে তো।"

ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ঝগড়ু সর্দার এসে হাজির।

শচীনন্দন বললে, "থাক্ ঝগড়ু। বার কোরে আর দিতে হবে না। আমি নিজেই চলে যাচ্ছি।"

কাছারীতে গিয়ে সে সঙ্গী কর্মচারীদের সমস্ত ঘটনা বললে। তারা খুবই ক্ষুব্ধ হোল।

তারপর চোখের জল ফেলতে ফেলতে সকলেব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শচীনন্দন চলে গেল।

দিন পাঁচেক কেটে গেছে। নিবুপমা দেবীব ভাই তাঁকে আরও দিনকতক তাঁর কাছে থেকে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু নিরুপমা রাজী হোতে পারলেন না। তাঁর মন পড়ে রয়েছে ঘরের দিকে। ছেলেকে রেখে তিনি তাড়াতাড়ি নওগাঁয় চলে এলেন।

মাঝপথে ট্রেন ঘণ্টা চারেক দেরী কোরে ফেললো, লাইন ঠিক ছিল না বোলে। ফলে প্রাসাদে পেঁৗছতে তাঁব রাত্রি প্রায় দশটা হোয়ে গেল।

দাসীরা জেগে উঠলো। রাজাসাহেবের খবর জিজ্ঞেস করায় তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। বুঝতে না পেরে তিনি প্রশ্ন করলেন, "অমন করছিস কেন? ভালো আছেন তো?"

"হ্যাঁ মা, ভালোই আছেন", একজন বললে।

"কোথায় আছেন? বারাণ্ডায় বোধ হয়?"

"না, ঘরে শুয়েছেন", আরেকজন উত্তর দিলো।

নিরুপমা নিশ্চিন্ত হোলেন। কিন্তু দেখলেন দাসীরা তখনো মুখচাওয়াচাওয়ি

যাই হোক, ওদিকে আর মনোযোগ না দিয়ে তিনি গা হাত পা ধুতে গেলেন। তারপব বেশ পরিবর্তন কোরে গেলেন স্বামীব খোঁজে।

দাসীদের বলা সত্ত্বেও বাবাণ্ডাটা একবার উঁকি মেরে দেখলেন। না, সেখানে নেই।

গেলেন শোবার ঘরে। দেখলেন দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

তা হোলে ওরা ঠিকই বলেছে, শুয়েছেন।

আস্তে আস্তে তিনি দরজায় ধাক্কা মারতে লাগলেন।

দরজা তবু খোলে না।

অগত্যা জোরেই ধাক্কা দিতে লাগলেন।

অনেক পরে নিখিলেশের সাড়া এলো, "কে?"

"আমি, আমি এসেছি। দরজা খোল।"

খানিক পরে বেরিয়ে এলো অন্ধকার ঘর থেকে আলুথালু বেশে দাসী বাতাসী।

গৃহকর্ত্রীকে দেখে সে তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "মা, আমার কোন দোষ নেই, তোমার পা ছুঁয়ে বলচি। আমায় রাজাসায়েব মাথা টিপে দোবার নাম কোরে ডাকিয়ে এনেছিলেন।"

নিরুপমা প্রশ্ন করলেন "তারপর?"

লজ্জায় দাসী মাথা নীচু কোরে রইলো।

নিরুপমা বললেন. "যা, দূর হ এখান থেকে।"

এখন তিনি বুঝতে পারলেন কেন দাসীরা তখন অমন মুখচাওয়াচাওয়ি করছিল। তাঁর শরীর রি-রি কোরে উঠলো। ঘরে ঢুকতে তাঁর আর ইচ্ছে হোল না।

দরজার বাইরে বাঁদিকে একখানা কৌচ পড়ে ছিল। অবসন্ন দেহটাকে টেনে এনে তিনি তার ওপর এলিয়ে দিলেন। দুঃখে, ক্ষোভে তাঁর কান্না পেতে লাগলো।

নির্জন দালান। মাথার ওপর ঝাড়ে একটা মাত্র বাতি জ্বলছে। মনে মনে তিনি ভাবতে লাগলেন ওই বিছানায় এই কিছুক্ষণ আগে তারই দাসী তাঁরই স্বামীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হোয়ে শুয়েছিল। ঐখানে—ঐ স্বামীর পাশে গিয়ে তাঁকে শুতে হবে! এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হোতে পারে? তবু কিনা লোকে তাঁকে ঈর্ষা করে বড় ঘরের গৃহিণী বোলে! এর চেয়ে কুঁড়েঘর ভালো, ঢের ভালো, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিষ্ঠা ও সততা আছে, আছে পরস্পরের প্রতি আনুগত্য। সেখানে যদি শাকান্নও জোটে তবু ভালো।

তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বামীস্ত্রীতে আর কথা হোল না—দুজনেই দুজনকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। নিরুপমা রইলেন সারাক্ষণ অন্দর মহলে আর নিখিলেশ কাটালেন কখনো বারান্ডায় খবর কাগজ নিয়ে, কখনো বা কাছারীতে কর্মচারীদের সঙ্গে।

দুপুরে খাবার সময়ে যদিও উভয়ের মধ্যে একবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল, কিন্তু কেউ কথা কয়নি কারও সঙ্গে। নিরুপমা নীরবে বসে রইলেন, নিখিলেশও খেয়ে গেলেন নিঃশব্দে।

সন্ধ্যার জ্যোৎস্না চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কাছের মন্দির থেকে কাঁসর-ঘন্টার আওয়াজ ভেসে আসছে।

প্রাসাদে বোসে থাকতে নিখিলেশের আর ভালো লাগলো না। বেরিয়ে এসে তিনি বাগানে বেড়াতে লাগলেন।

অমন পবিত্র হাওয়াতেও কিন্তু মনে তাঁর অপবিত্র চিন্তা। ভাবতে লাগলেন এই সময়ে এই নির্জন জায়গায় দাসী বাতাসীকে যদি একবার পাওয়া যেত! মনে পড়লো গত রাত্রের কথা। সত্যিই, নিরুপমা যদি হঠাৎ অমন এসে অমন জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা না দিতো তা হোলে—

হঠাৎ স্ত্রীর গলা তাঁর কানে এলো "ওদিকে যেওনা, যেওনা, সাপ!"

নিখিলেশ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ফিরে দেখেন—নিরুপমা, বেঞ্চির ওপর বোসে।

সামনে তাকাতেই চোখে পড়লো একটা সাপ এঁকে বেঁকে চলেছে।

কৃতজ্ঞতায় তাঁর অন্তর ভরে উঠলো। অনুতাপও হোল। এমন শুভাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রীকে ফেলে কিনা তিনি সামান্য এক দাসীর সঙ্গলাভের জন্যে এমন লালায়িত!

এগিয়ে এসে সলজ্জকণ্ঠে বললেন, "এখানে একা বোসে যে?"

তাঁর গলা কেঁপে উঠলো।

"এমনি।" খুব সংক্ষেপে অথচ উদাসীনভাবে উত্তর দিলেন নিরুপমা।

নিখিলেশ স্ত্রীর পাশে এসে বসলেন। বললেন, "রাগ করেছ?"

"কার ওপর আর রাগ করবো বলো?"

"কেন? আমার ওপর?" বলতে বলতে স্বামী আবেগভরে স্ত্রীকে বুকের কাছে টেনে নিতে গেলেন।

"যাও। খুব হয়েছে।" লাফিয়ে উঠে নিরুপমা সরে বসলেন।

"অমন করছো কেন? কি হয়েছে?"

"ভালোমানুষ সাজছো? কিছু জানো না?"

"ও। কাল রাত্তিরের ব্যাপারটা? ও আর এমন কি?"

"বটে?" শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে টিপ্পনি কাটলেন নিরুপমা।

"এ তুমি অযথা বাড়াবাড়ি করছো নিরুপমা। ভেবে দেখো এ তো কিছু নতুন নয়।"

"কাজেই তোমার লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু আমার আছে। এত দিন তুমি তোমার বাগানবাড়ীতেই বসে অন্য মেয়েদের নিয়ে যা খুশী করেছ। কিন্তু কাল রাত্তিরে কিনা আমারই দাসীকে নিয়ে আমারি বিছানায়—"

"তাতে কি হয়েছে? কার ঘরে বলো অমন একটু আধটু না হয়? হা হা হা। একে যদি দোষ বলো তো এ দোষ আমার বাপঠাকুর্দারও ছিল, তোমার বাপঠাকুর্দারও ছিল। এমন কোন্ জমিদার, এমন কোন্ রাজারাজড়ার নাম করতে পারো যার নেই? হা হা হা।"

নিরুপমা নিশ্চল হোয়ে বোসে রইলেন।

"বলি অবুঝ মেয়ে ওসব শুচীবাই ছাড়ো। জীবনকে যদি বেড়াবন্দী কোরে রাখবো, তাহোলে কি জন্যে জমিদারি? কি জন্যে ঐশ্বর্য?"

আর বরদাস্ত করতে না পেরে নিরুপমা উঠে চলে গেলেন।

রাত্রেও নিরুপমা নিখিলেশের কাছে গেলেন না। নিখিলেশ অবশ্য আশা করেছিলেন নিরুপমা এ তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে অতটা বাড়াবাড়ি করবেন না। কিন্তু তা হোল না দেখে তিনি ক্ষুন্ন হোলেন। তাঁর রাগও হোল। মনে মনে তিনি বললেন, "একেবারে ছেলেমানুষ! বোঝে না যে এতে আড়ালে পাঁচটা কথা হবে।"

শুতে তাঁর ভালো লাগছিল না। একবার এপাশ একবার ওপাশ করতে করতে ভাবতে লাগলেন ঃ সত্যিই, এই ভাবে সকল সময়ে স্ত্রী কি মনে করবে, ছেলে কি ভাববে, প্রজারা কি বলবে, এই ভেবে, এই ভয়ে কি থাকা যায়?

বিছানা ছেড়ে তিনি বারান্ডায় বেরিয়ে এলেন। প্রকৃতির দিকে চাইলেন। কি সুন্দর। কি মধুময়! মধুময় ঐ আকাশ, মধুময় ঐ বাতাস, মধুময় ঐ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বাগান, পথ, মাঠ, নদী। অথচ কেউ কারও দিকে তাকিয়ে বোসে নেই সে কি করছে দেখবার জন্যে। কেউ কারও কাজে বাধা দেবারও নেই। প্রকৃতির রাজ্যে যখন এমন স্বাধীনতা, মানুষের রাজ্যেই বা তা থাকবে না কেন?

বোতলের ছিপি খুলে তিনি গেলাসে মদ ঢাললেন। এক চুমুক দু চুমুক, গেলাস শেষ।

না, না, এ অসহ্য। এইভাবে অন্তরের স্বাধীন ইচ্ছাব গলায় সকল সময়ে লাগাম চড়িয়ে থাকা যায় না। না, না, না, আর তিনি কাউকে পবোযা কববেন না।

গেলাসের পর গেলাস উড়ে যেতে লাগলো।

না, না, আর না, আর কাউকে না, আর কিচ্ছু না। যা ভালো লাগে, যা মন চায় তাই তিনি করবেন। বাতাসীকে যদি ভালো লাগে, বাতাসীকেই নিয়ে তাঁর যা ইচ্ছে তাই করবেন। এক সময় ছিল বটে যখন নিবুপমাকে দেখতে ছিল ফুলের চেয়ে নরম, জ্যোৎস্নার চেয়েও সুন্দর। কিন্তু এখন? এখন তাব সে সৌন্দর্য নেই, সে যৌবন নেই। কাজেই আজ আব তার কি অধিকার আছে তাঁকে আগলে রাখবার? যে ফুলে মধু ফুরিয়ে গেছে তা ফেলে মধুকর চলে যাবেই অন্য ফুলে যাতে মধু আছে। তাঁরও তো সে সুযোগ থাকা চাই। তিনি জমিদাব তিনি রাজা, তিনি নওগাঁর প্রাসাদের অধীশ্বর। কেন তিনি সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন?

নতুন মধু পাবার আশায় খালি বোতলটা সরিয়ে তিনি আবার একটা ভর্তি বোতলের দিকে হাত বাড়ালেন। বোতলটা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরকার তরল পদার্থটুকু চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

"নাঃ কেবল বাধা! কেবল বাধা!" বলতে বলতে নিখিলেশ আর একটা বোতল টেনে নিলেন। তারপর ছিপি খুলে গেলাসে ঢেলে চুমুক দিলেন।

তারপর আপন মনে জড়িয়ে জড়িয়ে আবার বলতে লাগলেন, "না, কাউকে পরোয়া করবো না। না, না, না।" তারপর একটু থেমে আবারঃ "কিন্তু নাঃ,

এখানটাতে আর হবে না, এখানটায় আর আনন্দ নেই। কালই, কালই আমি বেরুবো। যত ভালো জায়গা আছে, যত সুন্দর মেয়ে আছে, কিচ্ছু বাদ রাখবো না। দেখি কে কি বলে।"

এইবার ঝিমোতে লাগলেন। খানিক পরে ,আবার, আবার বলতে লাগলেন ঃ "অ্যাঁ! বলবে? কে কি বলবে? বলুক। নিখিলেশ রায় কাউকে ভয় করে না। কাউকে না। দাঁড়াও, কালই পদ্মা বাইজীকে তৈরী হবার জন্যে বোলে পাঠাচ্ছি। কিন্তু হা হা হা, মুস্কিল হচ্ছে ঐ টাকা নিয়ে। ম্যানেজার শালাকে বলো, এক্ষুনি বলবে ট্যাকা নেই। আরে শ্‌শালা, ট্যাকা নেই কি? গরু আছে, দুধ নেই! তা কখনো হয়! দরকারের সময় ট্যাকাই যদি না পেলুম তবে কি জন্যে জমিদারি শুনি? না, না, ওসব শুনতে চাই না। ট্যাকা চাই, ট্যাকা আমার চাইই।"

বলতে বলতে নিখিলেশ টেবিলেব ওপর সজোরে এক মুষ্ট্যাঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গেলাস বোতল সব ঝন্ ঝন্ শব্দে পড়ে গেল।

শচীনন্দন সামন্ত প্রথমে ভেবেছিল এই দুর্দান্ত জমিদারের প্রজা হোয়ে আর সে এখানে থাকবে না, বাইরে কাজের সন্ধানে কোথাও চলে যাবে। কিন্তু পৈতৃক ভিটে, মা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সব ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে তার মন সায় দিল না। গ্রামের গাছপালা, পথ, মাঠ, পুকুর, সবই যেন এক নিবিড় বন্ধনে তাকে বেঁধে রেখেছে।

আরও একটা জিনিস তাকে টানতে লাগলো—সমাজের উপেক্ষিত ঐ ছোট-লোকগুলো, সমাজের মাতব্বররা যাদের শিয়ালকুকুরেরও অধম কোরে রেখেছে। সত্যিই ওরা বড় অসহায়, কেউ ওদের পাশে দাঁড়িয়ে দুটো 'আহা' বলবারও নেই।

শচীনন্দন হিসেব কোবে দেখলো তার যেটুকু জমি আছে, সারা বছর ভালো কোরে খাটলে ও থেকেই তাদের ক্ষুদ্র সংসারটি যাহোক কোরে চলে যাবে। চাকরীর প্রয়োজন শুধু কিছু নগদ অর্থের জন্যে। না হয় সে একটু দুঃখে কষ্টেই থাকবে। বরং চাকরীর সময়টা যদি ঐ অসহায় মানুষগুলিব উন্নতির জন্যে দেওয়া যায় তো কাজের মতো একটা কাজ হয়। ওরা আজ এত হীন কেন? জ্ঞানের অভাবের জন্যেই তো। একবার যদি ওদের চোখ খুলে দেওয়া যায় তাহোলে ওদের মাথায় পা দিয়ে যারা আজ ওদের ওপর তম্বিতাঁইস করছে তাদেব জারিজুরি এখনই ভেঙে যায়।

সে ঠিক করলো ওদেরই কাজে নিজেকে উৎসর্গ করবে। লম্পট অত্যাচারী জমিদারকে সেবা করার চেয়ে ওদের সেবা করা ঢের বেশী মর্যাদাকর। তাতে অর্থ মিলবে না বটে, কিন্তু অর্থের চেয়েও বড় জিনিস মিলবে।

নিজের ঘরে সে ডেকে নিয়ে এলো অপমানিত কেওরাবাগদীদের ছেলেমেয়েদের, বসালো ইস্কুল, তারপর শুরু করে দিলো তাদের শিক্ষাদান।

ঘুম থেকে উঠতে আজ নিখিলেশের বেশ দেরীই হোয়ে গেছে। উঠেই তিনি শোনেন থানার বড় দারোগাবাবু অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

তাঁর মনটা ছ্যাঁৎ কোবে উঠলো। সমরেশের হত্যার ব্যাপারে নয় তো?

এক মিনিট, দু মিনিট তিন মিনিট।

মন থেকে সজোরে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন। চায়ের অর্ডার দিয়ে গেলেন মুখ ধুতে। তারপর যথাসময়ে বেশ পবিবর্তন কোরে বারান্ডায় এসে দাবোগাবাবুকে ডেকে পাঠালেন।

বাইরে থেকে বারান্ডায় আসবার বিরাট সিঁড়ি বেযে উঠতে উঠতে দারোগাবাবু ও তাঁর সহকারী টুপি খুলে জমিদারকে অভিবাদন জানালেন। প্রত্যভিবাদন জানিয়ে নিখিলেশ তাঁদের বসতে বললেন। তারপর জিগগেস করলেন আসবার কারণ।

দাবোগাবাবু ঃ "আজ্ঞে অপবাধ নেবেন না, অসময়ে এসে একটু বিরক্ত করছি। এসেছি একটা তদন্তে এবং সেটা বাজা নিখিলেশ রায়েরই সম্পর্কে।"

"আমার সম্পর্কে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমার সম্পর্কে আবার কি তদন্ত?"

চা এল। শুধু চা নয়, চায়ের সঙ্গে আবও অনেক কিছু লোভনীয় খাদ্য। চারজন চাকর মিলে দিয়ে গেল।

হাসতে হাসতে জমিদাববাবু বললেন, "তা ভালই, আসুন, চা খেতে খেতেই তদন্ত চলুক। কি হোল? কি ভাবছেন? আপত্তি আছে?"

"আজ্ঞে সে কি কথা? রাজাসাহেবেব সঙ্গে চা খাওয়া এ যে মস্ত সৌভাগ্য।"

এক টুকরো কেক চিবোতে চিবোতে নিখিলেশ চায়ে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন, "এসব খাবার খাস ইটালি থেকে আনা। এখানে এমন জিনিস হয না।"

"বাঃ, সত্যিই খুব চমৎকাব!"

মৃদু হেসে নিখিলেশ চাকরকে আরও দু চারখানা দারোগাবাবু ও তাঁব সহকারীকে দিতে বললেন।

"না, না, এই যথেষ্ট", দারোগাবাবু বললেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরও যখন দেওয়া হোল তাঁরা আপত্তি করলেন না।

"হ্যাঁ, এইবার আসুন, আপনাদেব কাজ শুরু করুন। বলুন কি ব্যাপার।"

"আজ্ঞে আলোচনাটা একটু গোপনে করতে চাই", আপেলের টুকরোটা চিবোতে চিবোতে দারোগাবাবু উত্তর করলেন।

"ও আচ্ছা। এই তোরা যা তো।"

চাকররা চলে গেল।

"হ্যাঁ, বলুন।"

দারোগাবাবু বলতে আরম্ভ করলেন, "আজ্ঞে তদন্তটা ঠিক আপনার সম্পর্কে নয়, আপনার ভায়ের—"

"ও! কিন্তু সে তো এখন এখানে নেই। কয়েক মাস আগে হঠাৎ তার মাথাটা খারাপ হোয়ে যায়। সেই থেকে তাকে রাঁচীতে রেখেছি।"

"কিন্তু সেখানে তিনি নেই।"

"সে কি! কে বল্লে? আপনারা খোঁজ কোরে দেখেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওখানকার কর্তৃপক্ষ নাকি আপনাকেও খবর পাঠিয়েছেন।"

"কই না তো। আমি কোনই খবর পাইনি।"

"প্রকাশ, তিনি নাকি পালিয়ে এখানেই এসেছিলেন এবং এখানে নাকি তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, এবং হত্যা করা হয়েছে আপনারই নির্দেশে।"

"সে কি! আপনারা কি বলছেন? আমার ভাইকে আমি হত্যা করবো?"

"রাজাসাহেব এ আমরাও বিশ্বাস করি না। তবে এই রকম অভিযোগ এসেছে বোলেই আমাদের ওপর তদন্ত করবার হুকুম হয়েছে। জানেন তো আমরা হুকুমের দাস ছাড়া আর কিছু নয়। যাই হোক আপনি এ নিয়ে কিছু ভাববেন না, রিপোর্ট দেওয়া তো আমাদের হাতে।"

"আমার মনে হয় আমার কোন শত্রু আমার ক্ষতি করবার জন্যেই এরকম অভিযোগ করেছে। কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না। আমার ভাই তাহোলে গেল কোথায়? আপনারা বলছেন সে রাঁচীতে নেই। দারোগাবাবু, আপনারা তাকে খুঁজে বার করুন। যত টাকা লাগে আমি দোব, আপনারা খুঁজে বার করুন। হ্যাঁ, ভালো কথা আমার রাজা-উপাধি-প্রাপ্তি উপলক্ষে বোধ হয় আপনাদের কিছু দেওয়া হয়নি। আচ্ছা দাঁড়ান একটু।"

বলতে বলতে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। দারোগা ও তাঁর সহকারী বোসে বোসে বাকী খাবারগুলির সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন।

খানিক পরেই নিখিলেশ পাঁচখানা একশো টাকার নোট নিয়ে বেরিয়ে এসে চারখানা দারোগাবাবুকে ও একখানা তাঁর সহকারীকে দিয়ে বললেন, "এই নিন। আশা করি—"

"যথেষ্ট হয়েছে রাজাসাহেব, যথেষ্ট। এই বিপদের সময়েও যে আপনি আমাদের কথা মনে রেখেছন এ জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মহানুভবতার তুলনাই হয় না।"

"তাহোলে ?"

"আজ্ঞে আপনার ভায়ের খোঁজ করতে আমরা এখনি ব্যবস্থা করছি। হ্যাঁ, এখন তাহোলে আমরা উঠি, আপনার মূল্যবান সময় আর নষ্ট করবো না। আবার মাফ চাইছি অসময়ে এসে বিরক্ত করার জন্যে।"

টাকাগুলি পকেটে গুঁজে নতমস্তকে অভিবাদন জানিয়ে পুলিসকর্মচারীদুজন বিদায় নিলেন।

পাঁচ-পাঁচ শো টাকা ঝুটমুট বেরিয়ে গেল! নিখিলেশ রায় মনে মনে ভাবতে লাগলেন। অথচ টাকার জন্যে আজও তাঁর বাইরে যাওয়া হচ্ছে না!

তা হোক। এ খরচ বৃথা যাবে না। ওদের সন্তুষ্ট রাখতেই হয়।

কিন্তু কে ওদের খবরটা দিলে? ঝগড়ু কি ফাঁস কোরে দিলো? উঁহু। ঝগড়ুকে মেরে ফেল্লেও ওর মুখ থেকে একটা কথাও বার হবে না। তা হোলে কে এমন শত্রু আছে?

অভিযোগ অবশ্য নিশ্চয়ই কেউ না কেউ করেছে। কিন্তু কে সে? সমরেশের স্ত্রী নয়তো? কিন্তু সে তো বড জোর এইটুকুই জানতে পেরে থাকবে তার স্বামী রাঁচীতে নেই। হয়তো এও জানতে পাবে যে সমরেশ পালিয়ে এখানে এসেছিল। কিন্তু তাকে যে হত্যা করা হয়েছ এ কথা সে কেমন কোরে জানবে? হত্যার সময়ে তো চারদিকে কোথাও মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। তাহোলে কি কেউ দেখে ফেলেছে? শচী সামন্ত কিংবা আর কেউ? তা হোলে কিন্তু খুব হুঁশিয়ার হোয়েই থাকতে হয়। হয়তো আরও কিছু টাকা খবচও কবতে হবে। তাই তো! কেবলই বাধা!

মেজাজটা নিখিলেশের রুক্ষ হোয়ে ওঠে।

"না, না, ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। ক'দিন ধোরে কেবলই বলছি না টাকা আমার চাই।" নিখিলেশ রায়ের চীৎকারে কাছারী গমগম কোরে উঠলো। কর্মচারীরা তো ভয়ে জড়োসড়ো।

একটু এধার ওধার কোরে নিখিলেশ রায় আবার চীৎকার কোরে উঠলেন. "কোথা গেলেম আপনাদের ম্যানেজারবাবু?"

"আজ্ঞে তিনি গেছেন দশ নম্বর মৌজায়", গোমস্তা রমানাথ এগিয়ে এসে বললেন। "আপনার টাকাব জন্যেই গেছেন। আপনার টাকার জন্যে আমবা খুবই চেষ্টা করছি। ম্যানেজারবাবু চারদিকেই ছোটাছুটি করছেন।"

"বাজে কথা। আপনারা পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছেন, কর্তব্যে ফাঁকি দিচ্ছেন।"

রমানাথ ও অন্যান্য সমস্ত কর্মচারীরই সম্ভ্রমে আঘাত লাগলো। কিন্তু তাঁরা

প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না। মাথা নীচু কোরে রমানাথ নিজের জায়গাটিতে গিয়ে বসলেন।

যাবার জন্যে নিখিলেশ পিছন ফিরলেন। দেখলেন একটু দূরে একজন লোক মুখখানি কাঁচুমাচু কোরে দাঁড়িয়ে।

"কি চায় ঐ লোকটা?" নিখিলেশ জিগগেস করলেন।

পাশে একজন কর্মচারী দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে ও বলছে ও এ বছর খাজনা দিতে পারবে না। দেখুন না এই রকম যদি সকলেই করে, তাহোলে আমরা কি করি বলুন তো?"

"না, না, ওসব চলবে না। আপনাদের খুব কড়া হোতে হবে।"

লোকটি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাঁর পাদুটো জড়িয়ে ধোরে কাতরকণ্ঠে বলতে লাগলো, "ছিচরণে ঠেলবেন না দয়াময়, একটু দয়া করুন।"

"এই, পা ছাড়্, পা ছাড়্", নিখিলেশ তাকে ঠেলে দিযে পিছনে কয়েক পা সরে এলেন। তারপর কর্কশস্বরে বলতে লাগলেন, "কোন কথা না। ভালো চাস তো যা, এক্ষুনি খাজনা নিয়ে আয়।"

দাঁড়িয়ে উঠে হাতজোড় কোরে লোকটি আবার বলতে লাগলো, "হুজুর, এবার সব হেজেপচে গেছে। এক মুঠোও ধান ঘরে তুলতে পারিনি।"

"তাতে কি? বেশী তুললে কি তোবা আমাদের বেশী দিস্?"

"এজ্ঞে আপনারা যে আমাদেব মা-বাপ।"

"বটে! খুব কথা শিখেছিস! না, না ওসব চলবে না। খাজনা তোকে আজই চুকিয়ে দিতে হবে।"

যুক্তকরে চাষীটি বলতে লাগলো, "হুজুব, কয়েকটা থালাবাটি আর একটা গোরু ছাড়া আর কিছুই নেই যে।"

"তাই বিক্রী কোরে দে।"

লোকটি আবার জমিদাবের পা ধরতে গেল।

নিখিলেশ ধমক দিয়ে উঠলেন, "আবাব ন্যাকামি?"

থতমতো খেযে চাষীটি কাঁদতে কাঁদতে হাতজোড় কোরে বললে, "ছিচবণে একটু ঠাঁই দিন হুজুব।"

"তবু বিরক্ত করবি? আচ্ছা ছিনে জোঁক তো! ওহে শ্যামলাল যাও তো দরোয়ানকে সঙ্গে নিযে, ওর থালাবাটি গোব, সব বাব কোবে নিয়ে এস।"

"হুজুরের এই বিচাব হোল?"

"ফের কথা? এই, কে আছিস? কোথা গেল চাকরবাকরগুলো?"

তিনচারজন ছুটে এল।

"এই, ঐ কৃষ্ণচূড়া গাছটার গোড়ায় ওকে বেঁধে রাখ্ তো, আর একজন গিয়ে ওর বাড়ীতে খবর দে যতক্ষণ না ও খাজনা চুকিয়ে দিচ্ছে ওকে ছাড়া হবে না।"

লোকটি অনেক কাকুতিমিনতি করলো, কিন্তু বৃথা। দুজন লোক তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে গাছের গোড়ায় বেঁধে রাখলো।

সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে জমিদারবাবু বলতে লাগলেন "এই যা হোল, দেখবে এবার পাজীগুলোর শিক্ষা হবে।"

অবিলম্বে চাষীটির বাড়ীতে খবর পেঁছলো। তার স্ত্রী তো কেঁদে আকুল ঃ "ওমা ই কি কতা গো? কোতা যাবগো?"

কাঁদতে কাঁদতে সে রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

আশপাশের লোকেরা ছুটে এলো তার কান্না শুনে।

পাশের বাড়ীর গিন্নি শুধোল, "কি হোয়েচে? অ শিবুর মা, কি হোয়েচে লো?"

"ওগো ওরা শিবুর বাবাকে কাচারীবাড়ীতে বেঁদে রেখেচে।"

"কেন? কি করেচে সে?" নটবর জিজ্ঞেস করে।

"করবে আর কি? গরীব মনিষ্যিরা বড় নোকদের কি আবার করতে পারে?"

"তবে?" পঞ্চানন প্রশ্ন করে।

"খাজনা দিতে পারিনি গো খাজনা দিতে পারিনি সেই জন্যে।"

শিবুর মা পথের ওপর বোসে পড়ে।

"মগের মুল্লুক নাকি! খাজনা নায় দিতেই পারিনি, তাই বোলে বেঁদে রাখবে?" বৃদ্ধ শ্রীচরণ লাঠির ওপর ভর দিয়ে বলে।

"হ্যাঁগো, ওদের নোক এসে এই মাত্তর বোলে গেল ফটকের সামনে গাছে বেঁদে রেখে দিয়েচে। এখন আমি কি করি গো?" বিনিয়ে বিনিয়ে চাষীর বৌ বলে আর কাঁদে।

পঞ্চানন বাধা দেয় ঃ "আঃ অমন উতলা হোলে তো চলবে নি বাপু, ধীর হও।"

ইতিমধ্যে আরও দুচার জন আসতে থাকে "কি হয়েছে? কি হয়েছে?" বলতে বলতে।

শিবুর মা ঃ "তোমরা কেউ একবার আমার শিবুকে ডেকে দাওগো।"

"ঐটুকু ছেলে শিবুকে দিয়ে কি হবে?" পঞ্চানন বলে।

"আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে বাবুদের কাছে একবার যাবো গো।"

"তুমি গিয়েই বা কি করবে? শেষে তোমাকেই ঠেঙিয়ে দেবে। মেয়েমানুষ বোলে কি বাদ দেবে?"

"তবে আমি কি করবো তোমরা বোলে দাওগো।"

নটবর এগিয়ে আসে ঃ "এক কাজ করলে হয় না পঞ্চানন? একবার শচীনন্দনদাকে খবর দিলে হয় না?"

"মন্দ বলোনি নটবরদা। তাই চলো।"

খানিক পরেই দেখা গেল তাদের সঙ্গে শচীনন্দন সামন্ত এসে উপস্থিত হোল।

শ্রীচরণ এতক্ষণ লাঠিটা মাটিতে রেখে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসেছিল। শচীনন্দনকে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠলো, "দেখছো শচীনন্দন জমিদারের কি রকম অত্যেচার!"

"কেন হবে না কাকা? চাষীরা যে কেবল পড়ে পড়ে মার খেতেই জানে!" শচীনন্দন বললে, তারপর একটু থেমে সকলের দিকে চেয়ে আবার বলতে লাগলো, "জমিদার যদি দেখতো একজন চাষীর গায়ে হাত দিলে সব চাষী ক্ষেপে ওঠে, কক্ষনো সে এমন অত্যাচার করতে সাহস করতো না।"

"ঠিক! একশোবার ঠিক।" সকলে সমস্বরে বোলে ওঠে।

শচীনন্দন বলতে থাকে, "এই দেখনা, খবরটা মুখে মুখে চারদিকে নিশ্চয়ই ছড়িয়ে পড়েছে, সকলে এ নিয়ে হাহুতাশও করছে, কিন্তু কই চলুক দেখি হাজার খানেক চাষী দল বেঁধে জমিদারবাড়ী!"

পঞ্চানন যোগ দেয় "তুমি ঠিকই বলেচ শচীদা। কিন্তু চিরদিন আমরা এ অত্যেচার বরদাস্ত করবুনি। একদিন দেখো এ অত্যেচারের বিরুদ্ধে আমরা মাতা তুলে দাঁড়াবুই।"

"তোমার মুখে ফুলচন্নন পড়ুক পঞ্চানন। যাক্ এখন সেকথা। এখন দেখা যাচ্ছে এদিক দিয়ে কিছু করবার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই। বেশ, তাহোলে এক কাজ করো। যেমন কোরেই হোক এক্ষুনি মধুর খাজনাটা মিটিয়ে দাও। না হোলে তো ওকে ছাড়ানো যাবে না।"

এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

মধুর স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বলে "খাজনার ট্যাকা এক্ষুনি কোতা পাবোগো?"

"ক বছরের খাজনা বাকী পড়েছে?"

"তিন বচর।"

"কত টাকা?"

"পঁয়তাল্লিশ।"

"কিছু দিলে এখন ছাড়বে না?"

"নাগো, ওদের নোক বোলে গেচে সব ট্যাকা না মিটিয়ে দিলে ছাড়বেনি।"

"দেখছো তো। অথচ আইন হচ্ছে চাষী খাজনা না দিলে জমিদার বড়জোর নালিশ করতে পারে, জুলুম কোনমতেই করতে পারে না। কিন্তু জানে এ পক্ষ দুর্বল, তাই এমন বেআইনী কাজ করতে সাহস করছে। যাক্, আমাদের যখন সে ক্ষমতা নেই তখন সহ্য করতেই হবে। হ্যাঁ, তাহোলে তোমার কাছে কত আছে শিবুর মা?"

"আমার ঠেঙে তো কুড়িয়ে বাড়িয়ে বড়জোর গণ্ডা দশ বারো পয়সা হবে গো।"

"অর্থাৎ এক টাকাও পুরো নেই। এই তো অবস্থা। তবু জোর কোরে জুলুম কোরে জমিদার খাজনা আদায় করবেই আর সেই টাকায় করবে ফুর্তি, আমোদ, প্রমোদ। যাক, উপায় কি? হ্যাঁ তাহোলে এক কাজ করো। মধু ছাড়া তোমরা এখানে ক ঘর আছো?"

"প'য়তাল্লিশ", একজন উত্তর দিলো।

"বেশ, তাহোলে তোমরা প'য়তাল্লিশ ঘর প্রত্যেকে এক টাকা কোরে নিয়ে এসো।"

নটবর ঃ "কিন্তু এদের মধ্যে শচীদা পাঁচ ঘরের অবস্তা বড্ডই খারাপ। ওরা তো পারবেনা।"

পঞ্চানন মন্তব্য করলো, "তাচ্চেয়ে এক কাজ কল্লে হয় না? পাল মশায়ের কাছে বরং শিবুর মা একবার দেখুক না যদি ট্যাকাটা ধার পায়।"

সকলে বোলে উঠলো, "এ মন্দ যুক্তি না।"

শিবুর মা ঃ "কিন্তু ওর ঠেঙে যে ধার নেয়া আছে। বলে তারই জন্যে রাত দিন তাগাদা করছে।"

"বেশ তো বাপু, একবার গিয়েই দ্যাখো না।"

"এ কিন্তু ঠিক হচ্ছে না" গম্ভীরভাবে শচীনন্দন বললে। "আর পঞ্চানন তুমিই না একটু আগে বলছিলে এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে একদিন তোমরা মাথা তুলে দাঁড়াবে?"

"হ্যাঁ, শচীদা।"

সকলে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

"শোন বলি। এ কাজ করতে হোলে প্রথমেই চাই একজনের বিপদকে সকলের বিপদ বোলে জ্ঞান করা, চাই প্রত্যেকের জন্যে প্রত্যেকের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হওয়া। এই কি তার পরিচয়?"

মাথা নত কোবে পঞ্চানন বলে, "ভুল হয়েছে শচীদা।"

"বেশ, তাহোলে ঐ পাঁচ ঘর বাদ দিয়ে চল্লিশ ঘর তোমরা এক টাকা কোরে দাও। আর বাকী পাঁচ টাকা আমি দিচ্ছি। আমার কাছে ওর বেশী নেই। এই নাও। ব্যাস, এইবার যাও, তোমরা তোমাদের অংশ নিয়ে এস।"

সকলে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে।

শচীনন্দন বলতে থাকে, "তাড়াতাড়ি করো। একবার ভেবে দ্যাখো কি অবস্থায় মধু সেখানে রয়েছে।"

আধঘণ্টার মধ্যেই প'য়তাল্লিশ টাকা সংগ্রহ হোয়ে গেল।

শচীনন্দন বললে, "কে যাবে বলো খাজনা দিতে? আমি বলি কি নটবর আর পঞ্চানন তোমরা দুজনেই না হয় যাও।" তারপর সবাইয়ের দিকে চেয়েঃ "মনে থাকে যেন এর উপযুক্ত জবাব একদিন তোমাদের দিতেই হবে।"

নটবর ও পঞ্চানন টাকাটা ভালো কোরে গুনে নিয়ে জমিদারবাড়ীর দিকে রওনা হোল।

প্রায় সন্ধ্যা হোল মধুর ফিরতে। নটবর, পঞ্চানন ও আরও যে দুএকজন তাদের সঙ্গে গিয়েছিল তারা তাকে দরজা পর্যন্ত পেঁাছে দিয়ে চলে গেল।

মধুর বৌ বললে, "সারাদিন পেটে কিছু নেই। তাড়াতাড়ি গায়ে জল দিয়ে চাট্টি খেয়ে ন্যাও, শরীরটে ঠান্ডা হোক।"

জলভরা চোখে মধু চৌকাঠের ওপর বোসে পড়ে বলে, "ওঃ! জমিদার নয় রে বৌ, ওটা সাক্ষাৎ চন্ডাল।"

বৌ চেঁচিয়ে ওঠে, "ওমা এগুনো সব গায়ে কি বেরিয়েছে?"

"কাঠপিঁপড়েতে কামড়েচে। উঃ সারা গা জ্বলে যাচ্চে।"

"ও মাগো! কোতা যাবো গো! দাঁড়াও। দাঁড়াও। একটু তেল নে আসি।"

সযত্নে স্বামীর গায়ে সরষেব তেল মাখাতে মাখাতে বৌ বলে, "উঃ কত কামড়েচে! দেওখানা একেবারে ফুলিয়ে দেচে! কোত্তেকে এতো কামড়ালো?"

"ওরা আমায় যে গাছটায় বেঁদে রেকে দিয়েচিল সে গাছটায় এতো কাঠপিঁপড়ে তোকে কি বলবো।"

"হা ভগবান! ওবা কি মানুষ না?" বৌ কাঁদে আর বলে।

টাকা সংগ্রহ হোল। বোধ হয় এমনিভাবেই সংগ্রহ হোল। তারপর দেখা গেল আর একটুও কালবিলম্ব না কোরে রাজা নিখিলেশ রায় হাওয়াবদলের জন্যে বেরিয়ে পড়লেন।

প্রাসাদে রইলেন নিরুপমা দেবী একা। বিদায় নেবার সময় নিখিলেশ তাঁকে বলে গেলেন, "তোমায় সঙ্গে নিয়ে গেলে তোমার শরীবের দিক থেকে একটু ভালোই হোত। কিন্তু বুঝতে তো পারছো প্রজাগুলো বড্ড পাজী। যদি আমরা দুজনেই না থাকি ওরা জো পাবে, নায়েব গোমস্তাদের মানবে না। তাছাড়া অমু রইল কলকাতায়, তার কখন কি দরকার পড়ে। কি বলো?"

নিরুপমা শুধু একটু মুচকি হেসেছিলেন, কিছু বলেননি।

হাওড়া স্টেশনে দেখা গেল বোম্বাই মেলের প্রথম শ্রেণীর একখানা কামরার গায়ে একটা লেবেল ঝুলছে। লেবেলে লেখা "রাজা নিখিলেশ রায়ের জন্যে রিজার্ভ করা।"

প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে কুলীরা বিরাট বিরাট বাক্স ও অন্যান্য জিনিসপত্র কামরাটাতে তুলে দিল। কাঠের বাক্সে প্যাক করা বিলিতী মদের বোতলও আছে কয়েক ডজন তার সঙ্গে।

একটু পরেই দেখা দিলেন রাজা নিখিলেশ রায়, সঙ্গে তাঁর কয়েকজন সুন্দরী।

প্রথম প্রথম নিরুপমা দেবীর খুবই ফাঁকা ঠেকতে লাগলো, যদিও সারা প্রাসাদ এখনও আগের মতোই সকল সময়ে আত্মীয়স্বজন ও দাসদাসীর কলরবে মুখরিত। তিনি একবার ভাবলেন ছেলেকে দুচার দিন কাছে এনে রাখবেন। কিন্তু পরে ভাবলেন, হয়তো কেওরাবাগদীগুলোর রাগ এখনও পড়েনি, যদি তারা কিছু কোরে বসে? তা ছাড়া পড়াশুনোরও তো ক্ষতি হোতে পারে। না, তার চেয়ে ও ওখানেই থাক্। তবে হ্যাঁ, বরাবর দাদার ওখানে রাখা ঠিক হবে না, স্কুল শেষ করলে হস্টেলে ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘটনাপ্রবাহ এদিকে যেমন চলছিল তেমনই চলতে থাকে। শুধু যা মাঝে মাঝে স্বামীর চিঠি আসে। তাও খুব সংক্ষিপ্ত। কোনটাতে থাকে তিনি এবার অমুক জায়গা থেকে তমুক জায়গা যাচ্ছেন। কোনটাতে ঃ তাঁর আরও কিছু টাকার দরকার, শীঘ্রই পাঠাতে হবে। আবার কোনটাতে 'তুমি কিছু মনে কোর না, ফিরতে আমার আরও মাস তিনেক দেরী হবে।'

নিরুপমা বেশ বুঝতে পারেন স্বামী তাঁর মদ ও মেয়ে নিয়ে একেবারে টই-টম্বুর। সময়ে সময়ে তাঁর অত্যন্ত রাগও হয়। কখনো ঘৃণাও আসে। কখনো কখনো আবার এই বোলেও নিজেকে প্রবোধ দেন যে এ বালাই তো বরাবরই আছে এবং সব বড় ঘরেই আছে, যেমন আলোর পাশে ছায়া। তিনি স্বামীকে ক্ষমা করেন।

এখন তাঁর অনেক কাজ। স্বামীর অনুপস্থিতিতে জমিদারীর কাজকর্মে পাছে কর্মচারীরা অবহেলা করে, পাছে কোন ত্রুটি বা গোলমাল হয় সেজন্যে প্রতিটি বিষয় তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেখাশুনো করেন।

একদিন ম্যানেজার এসে বললেন, "একটা কথা আছে, যদি আদেশ করেন তো বলি।"

"হ্যাঁ বলুন।"

"জেনারেল মোটর কোম্পানি আর ক্যালকাটা হোটেল থেকে দুখানা বিল এয়েছে।"

"কেন?"

"জেনারেল মোটর কোম্পানি থেকে খোকাবাবু বিশ হাজার টাকার একখানা গাড়ী কিনেছেন।"

সেকি! এই তো সেদিন একখানা নতুন গাড়ী হোল।"

"বোধ হয় সেটা ওঁর পছন্দ হয়নি। খোকাবাবুর কাছ থেকে একখানা চিঠিও এয়েছে। দাঁড়ান, বার করি। হ্যাঁ এই যে। খোকাবাবু লিখছেন "এ গাড়ীটা সব চেয়ে আধুনিক মডেলের। কাজেই এটা কেনার লোভ সামলাতে পারলুম না। মাকে বলবেন মা যেন রাগ না করেন। বিলটা কোম্পানি শীগ্‌গিরই পাঠাচ্ছে। আর

অনুমতি নিয়ে টাকাটা দিয়ে দেবেন। না হোলে আমার সম্মান নষ্ট হবে।"

"এইবার ক্যালকাটা হোটেলের বিলের কথা বলুন। ও বিলটা কত টাকার?"

"দুশো পঁচাত্তর টাকা বারো আনা।"

"কি জন্যে?"

"চা বিস্কুট এই সবের খরচা।"

"সেকি! একজন মানুষ এই কদিনে এত টাকার চা বিস্কুট খেতে পারে?"

"হা হা হা! বোঝেন তো। কোলকাতা তো আর নওগাঁ নয়। তাছাড়া সেখানে নিশ্চয়ই পাঁচজন ইয়ারবন্ধু হয়েছে। তারা হয়তো চাটা চপটা খাওয়াবার জন্যে মাঝে মাঝে ধরেও। কি কোবে 'না' বলে বলুন?"

"তা বোলে—"

"হ্যাঁ তা একটু বেশীই হোয়ে গেছে। ব্যাপারটা কি, ছেলেমানুষ তো।"

"বেশ, টাকা পাওনাদারদের চুকিযে দিন। কিন্তু ওকে লিখে দিন যেন ও আর এরকম বেহিসেবী হোয়ে না চলে। আমিও চিঠি দিচ্ছি।"

"যে আজ্ঞে।"

কয়েকদিন পরে আবার এক বিল আসে। এবার এক রিস্ট-ওয়াচ কোম্পানির। অমরেশ রিস্ট-ওয়াচ কিনেছে।

এবারও ছেলের সম্মান রক্ষার জন্যে তাড়াতাড়ি টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হোল। নিরুপমা ক্ষুণ্ণ হলেন বটে কিন্তু 'না' করতে পারলেন না।

এর পরও কিন্তু বিল আসা বন্ধ হোল না, দু তিন সপ্তাহ অন্তর অন্তর আসতেই থাকে, এবং চুকিয়েও দিতে হয়।

বৎসর হোতে চললো।

হঠাৎ একদিন ম্যানেজার এসে নিরুপমাকে বললেন, "শুনেছেন রানীমা? ছোটকর্তার স্ত্রী তাঁর ছেলের জন্যে সম্পত্তির অর্ধেক দাবী কোরে মামলা দায়ের করেছেন।"

অনেকক্ষণ নিরুপমার মুখ দিয়ে আব কথা সরলো না। অনেক পরে তিনি বললেন, "রাজাসাহেবকে এক্ষুনি খবর দিন, তিনি যেন তাড়াতাড়ি চলে আসেন।"

মামলা চলতে লাগলো। খুবই জটিল মামলা। নিখিলেশ রায় প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন যে ও ছেলে তাঁর ভাযের নয। অপরপক্ষে তাঁরই পুরোন কর্মচারী রমানাথ ভট্টাচার্য বিতাড়িত কর্মচারী শচীনন্দন সামন্ত ও কয়েকজনকে জুটিয়ে তাঁর ভায়ের স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁরা অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ কোরে দেখালেন যে তাঁর কথা সত্যি নয়, ও ছেলে তাঁর ভায়েরই।

পুরো ছ বছর ধোরে চললো মামলা। কখনো ফৌজদারী, কখনো দেওয়ানী। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট।

শেষে কিন্তু নিখিলেশ রায়ের হারই হোল—ছোট ভায়ের অংশ তাঁকে ছাড়তে হোল।

হেরে গিয়ে নিখিলেশ খুবই মুষড়ে পড়লেন।

অমরেশ এখন কোলকাতায় থাকে। এক নামকরা হস্টেলে থেকে সে কলেজে পড়ে।

হঠাৎ একদিন সে টেলিগ্রাম পেল পিতা তার মবোমরো।

খবর পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই সে ঊর্ধশ্বাসে ছুটে এলো নওগাঁয়। প্রাসাদে পোঁছে দেখলো পিতাব মৃত্যুর আর বেশী দেরী নেই। আত্মীয়স্বজন দাসদাসী সকলেই শোকাচ্ছন্ন। সারা প্রাসাদের ওপর নেমে এসেছে বিষাদের এক কালো ছায়া।

সূর্য ধীরে ধীরে বিদায় নিলো। সন্ধ্যা হয় হয়।

হঠাৎ নিখিলেশের ইচ্ছানুসারে ঘর থেকে সকলে বেরিয়ে গেল। শুধু রইলো অমরেশ আর অমরেশের মা।

নিখিলেশ কথা কইলেন, খুব আস্তে আস্তে, কম্পিত কণ্ঠে "জমিদারীর হিসেবটা তোমায় বুঝিয়ে দিয়ে যেতে চাই অমরেশ। ঐ দলিলগুলো নিয়ে এসো।"

এক কোণে একটা ছোট্ট পাথরের গোল টেবিলের ওপর কাগজপত্র পড়েছিল। নিখিলেশ সেইদিকে আঙুল বাড়ালেন।

লাল ফিতে মোড়া দলিলগুলি নিযে অমরেশ আবার পিতার পাশে এসে বসলো। তারপর অনেকক্ষণ ধোরে চললো গুজ্‌গুজ্‌, ফিস্‌ফিস্‌। প্রত্যেক কাগজখানি উল্টেপাল্টে নিখিলেশ দেখালেন। প্রত্যেক বিষয়টা বার বার কোবে অমরেশ জেনে নিলো। শেষে আসন্নমৃত্যু জমিদার কাঁপতে কাঁপতে নিজের হাতে কাগজগুলি বেঁধে পুত্রের হাতে দিলেন।

অমরেশ পিতার মুখেব দিকে চাইলো।

নিখিলেশ প্রশ্ন করলেন "কিছু জিগগেস করবে?"

"বলছিলুম কি বাবা, মার কাছে শুনেছিলুম আমাদের এস্টেটের বার্ষিক আয় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। সেকি ভুল? না আরও কাগজপত্র আছে আপনার ঠিক মনে পড়ছে না।"

নিখিলেশের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। থেমে থেমে তিনি বলতে লাগলেন, "তুমি ঠিকই শুনেছ। কিন্তু এখন আর তা নেই। ব্যাপার কি, গত ক'বছর ধোরে তোমার কাকিমার সঙ্গে আমার যে মামলা চলছিল তাতে আমার হার হয়েছে। আমি অবিশ্যি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলুম তোমার কাকিমার ও ছেলে তোমার

কাকার নয়, কিন্তু টিকলো না। আমার হার হোল। কাজেই এখন জমিদারির আধখানা তোমার আর আধখানা—"

একটু থেমে তিনি আবার শুরু করলেন, "একরকম হারিয়েই এনেছিলুম। কিন্তু ঐ রমানাথ ভট্‌চায্যি আর ঐ শচী সামন্ত বোলে লোকদুটো হোতেই—"

নিখিলেশ আর বলতে পারলেন না, হাঁপাতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরেই তাঁর নিশ্বাস চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল।

শ্রাদ্ধের পরদিন অমরেশ ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালো নিজের ঘরে।

"কাকা, রমানাথ ভট্‌চায্যি আর শচী সামন্ত আমাদের কি সর্বনাশ করেছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন?"

"খুব জানি বাবাজী, খুব জানি। রাজাসাহেবের অত শীগগির মৃত্যুর কারণও তো ওরা।"

ক্ষোভে, দুঃখে, রাগে অমরেশ ফুলতে থাকে। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর সে বলে, "শচী সামন্তকে তো বাবা অনেক আগেই দূর কোরে দিয়েছিলেন। রমানাথ ভট্‌চায্যি কি এখনও আমাদের সেরেস্তায় কাজ করে?"

"না। যেদিন ও কোর্টে হাজির হোল সেই দিনই রাজাসাহেব ওকে বিদেয় কোরে দিলেন।"

"ও বোধ হয় ও তরফ থেকে মোটামুটি কিছু পেয়েছে?"

"না। শুনেছি নাকি দিতে এসেছিল, ও নেয়নি। অবস্থা আজ এমন যে কোন-দিন জোটে, কোনদিন জোটে না।"

খানিকক্ষণ চুপ থেকে অমরেশ আবাব প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, ওদের কি কিছু করা যায় না?"

"তোমার পিতৃদেবও সে কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপার কি, রমানাথ বুড়ো, তাকে মারধোর করা যায় না, বদনাম হবে। আর সামন্তটার গায়ে হাত দেওয়া মানে তো বিপদ, সমস্ত কেওরাবাগ্‌দী আর চাষী ওর হাতে।"

"আমাদেবও তো হাতে লেঠেল রয়েছে।"

"তাতে ফল খারাপই হবে বাবাজী।"

"হুম্! আর কোন উপায় নেই?"

"হ্যাঁ, সেই রাস্তাই নেওয়া হয়েছে। রমানাথের বিরুদ্ধে বাকী খাজনার নালিশ হয়েছে।"

"আর শচী সামন্ত?"

"ওর খাজনা অবিশ্যি বাকী নেই, তবে—"

"রমানাথ ভট্‌চায্যি কি খাজনা চুকিয়ে দিতে পারবে?"

"উঁহু, উঁহু।"

"ঠিক আছে। ওকে যেন রাস্তাসার কোরে ছাড়া হয়। আর সামন্তটাকেও ছাড়া হবে না। ও শয়তান গোড়া থেকেই আমার শত্রু। মার মুখে শুনলুম ও নাকি এখনও কিসে আমার ক্ষতি হয়, কিসে আমার অনিষ্ট হয় সেই চেষ্টা কোরে বেড়াচ্ছে।"

"ঠিকই শুনেছো বাবাজী।"

"মনে আছে সেবার সেই মোটর চাপা দেওয়ার ব্যাপারটা? অতটা যে গড়িয়েছিল তা শুধু ওরই ওস্কানিতে। ও যদি পেছনে না থাকতো তা হোলে বাগ্দীরা কখনোই অতটা বাড়াবাড়ি করতে সাহস করতো না। কি বলেন প্রাসাদ চড়াও হওয়া! এতোটা স্পর্ধা কেউ কোনদিন দেখিয়েছে? মা তো এমন ভয় পেয়ে গেলেন যে আমায় কলকাতায় সরিয়ে দিলেন। সে অপমান কি আমি ভুলবো কখনো? বাবা হয়তো কিছু করেননি। আমি কিন্তু প্রতিশোধ নোবই।"

তারপর একটু থেমে আবার: "দেখা যাক কি করতে পারি। একটা মতলব অবশ্য আমি এঁটেছি। কালই ম্যাজিস্ট্রেটকে এ সম্বন্ধে লিখছি।"

অমরেশ দেখলো এখন আর তার নওগাঁ ছেড়ে কোলকাতায় গিয়ে থাকা ঠিক হবে না। আর পড়াশুনো না হোলে চলবে কিন্তু জমিদারির কাজকর্ম তাড়াতাড়ি বুঝে না নিলে চলবে না।

মার সঙ্গে সে এ সম্পর্কে পরামর্শ করলো। মাও তার সঙ্গে একমত হলেন।

মাতব্বররাও তাকে জানালো জমিদারিরই স্বার্থে তার এখন নওগাঁয় থাকা উচিত।

ওদিকে স্থানীয় স্কুল, লাইব্রেরি, ক্লাব, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে তাকে নিয়ে খুবই টানাটানি চলতে লাগলো। সবাই চায় তাকে প্রেসিডেন্ট করতে। সেও 'না' করতে পারে না। ফলে রোজই সভা, রোজই কর্মব্যস্ততা।

একদিন কথায় কথায় নিরুপমা ছেলেকে বললেন, "দেখ্ অমু, একটা কথা তোকে ক'দিন ধোরেই বলবো বলবো করছি, কিন্তু বলা হোয়ে উঠছে না।"

"কি মা?"

"ভূকৈলেসের মেজো তরফের মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ের ঠিক করেছি।"

"ও! সেই জন্যে বুঝি তুমি বাবার শ্রাদ্ধে ওদের আনবার জন্যে অত কোরে পীড়াপীড়ি করেছিলে?"

মা মুচকি হাসতে লাগলেন।

অমরেশ: "কিন্তু ওরা তো শুনেছি আমাদের চেয়ে অনেক বড় জমিদার। আমাদের ঘরে মেয়ে দেবে কেন?"

হাসতে হাসতে মা বললেন, "দেবে। শুধু মেয়ে নয়, সঙ্গে সঙ্গে জমিদারিও। মেয়ের বাপ আমায় বলেছেন তাঁর ছেলে নেই, কাজেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তোকেই দেবেন।"

অমরেশ কি ভাবলো, তারপর : "কিন্তু আমি রাজী নই।"

"সে কি রে!"

"তুমি কি বলছো মা? ওই কেলে হাম্‌দো মেয়েটাকে করবে তোমার ছেলের বৌ! তোমার পাশে এই প্রাসাদে তাকে মানাবে?"

মা গম্ভীর হয়ে গেলেন:

"দ্যাখ্ অমু, রূপ নিয়ে কেউ বাবা ধুয়ে খায় না। আসল জিনিস হোল টাকা। টাকা না থাকলে দুনিয়ায় কিছুই কিছু না।"

"না মা, আমি তোমার কথা মানতে পারলুম না।"

"এখনও অভাবটা ঠিক গায়ে লাগছে না কিনা, তাই। কিন্তু ভেবে দ্যাখ্ অবস্থাটা। যখন আয় ছিল এক লাখ কুড়ি হাজার তখনই দেনা পড়তো। আর আজ ষাট হাজার। তারপর কি ভয়ঙ্কর খরচে তোমরা! যেমন ছিলেন উনি তেমনি তুমি। বলতো এই আয়ে কি কোরে চলবে?"

অমরেশের ভিতরটা যে নড়ে উঠলো না, তা না। সত্যিই ভাবনার কথা। আর সে যে এ সম্বন্ধে সচেতন নয় তাও না। কিন্তু তবু, তবু কেমন কোরে রাজী হওয়া যায়? মাথা নীচু কোরে সে বলে, "না মা, তা বোলে সারাজীবন একটা পেত্নীর সঙ্গে ঘর করতে পারবো না।"

"কিন্তু এ সুযোগ হেলায় হারাচ্ছিস অমু, পরে অনুতাপ করতে হবে দেখিস।"

বিরক্ত হোয়ে নিরুপমা চলে গেলেন।

ব্যাপারটার এইখানেই শেষ হোল না। শেষ হোতে নিরুপমাই দিলেন না। মনে মনে তিনি বললেন : অমরেশকে রাজী করাতেই হবে, না হোলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। না, না, এতো কম আয়ে সে চালাতে পারবে না। দেনা করবে। তারপর দেখা যাবে দেনার দায়ে জমিদারি বিকিয়ে গেছে। সে জায়গায় যদি ঐ ভূকৈলাসের জমিদারিটা পায়, সম্পত্তিটা তো বড় কম না—বছরে আড়াই লাখের ওপর। দু হাতে যত পারো খরচ করো না কেন। কিন্তু কি বোকা! বলে কিনা কালো মেয়ে! আরে সুন্দর মেয়েদেরই তো ভারী খাতির এ বাড়ীতে! তোর নিজের মার কথাই ধর্ না। সে কি কম সুন্দরী! এমন সুন্দরী স্ত্রী ঘরে থাকতে তোর বাবা কি করেছেন? বারবনিতাদের নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দাসীদের পর্যন্ত বাদ দেননি। আজ যদি তোকেও খুব সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় তুইও তোর বাপের পথই ধরবি। নাঃ, ও যাই বলুক, চেষ্টা ছাড়লে চলবে না। যেমন কোরে হোক ওকে রাজী করাতেই হবে।

কাজেই যখনই সুযোগ পান নিরুপমা এ প্রসঙ্গ নিয়ে ছেলের কাছে উপস্থিত হন।

কিন্তু বৃথা। এদানিং মাকে দেখলেই অমরেশ যেন খুবই কর্মব্যস্ত এমনি ভাব দেখিয়ে সরে যায়।

মা অসম্মানিত বোধ করেন। কিন্তু তবুও ছেলের কল্যাণের জন্যে হাল ছাড়তে পারেন না। পাত্রীর পিতাকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করবার জন্যে অনুরোধ জানান।

শেষে মা ও ছেলের মধ্যে রীতিমতো তিক্ততার সৃষ্টি হোল। ছেলের এতোটা জিদ মা আর বরদাস্ত করতে পারলেন না। তিনি অবাক হোয়ে গেলেন তার নির্বুদ্ধিতা দেখে। তাঁর অভিমানও হোল খুব। হার মেনে তিনি স্থির করলেন কিছু দিনের জন্যে তাঁর দাদার ওখানে কাটিয়ে শেষে কাশীতেই গিয়ে থাকবেন।

আব কালবিলম্ব না কোরে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

শচীনন্দন সকালটা চাষ আবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, দুপুরে ছেলে পড়ায় সন্ধ্যার পর ছেলেদের বাপকাকাদের মজলিসে গিয়ে বসে। গ্রামবাসীরা তাদের দুঃখদুর্দশার কাহিনী তার কাছে আনে। সে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে, কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় সে সম্বন্ধে পরামর্শ দেয়, অভিযোগ থাকলে শোনে. সালিসী করে।

সেদিন পড়াতে বোসে হঠাৎ এক ছাত্রের কাছে শচীনন্দন শুনলো পাশেব গ্রাম নন্দনপুরের শেষ প্রান্তে একজন লোক গত রাত্রে মারা গেছে, কিন্তু সে ডোম বোলে কেউ তার সৎকার করছে না

সে কি! সাধে এ দেশের মানুষেব এতো দুর্গতি!

শচীনন্দন উঠে পড়লো। তারপর বড় ছাত্রদের দিকে চেয়ে বললে. "তোমরা কে কে যাবে আমার সঙ্গে চলো, কেউ না করে আমরাই করবো।"

ছোট ছেলেদের উদ্দেশ কোরে বললে, "শোন। তোমরা আরও কিছুক্ষণ থেকে পড়া তৈরী করো। তারপর বাড়ী চলে যেও। ঝগড়া কোর না যেন।"

ঘাড় নেড়ে তারা সম্মতি জানালো।

অতঃপর বড ছেলেদের নিয়ে শচীনন্দন বেবিযে পড়লো।

পথে আরও দু'একজনকে সঙ্গে ধোরে নিলো। হাঁকডাক কোবে আবও দু'-একজনকে ঘব থেকে বার কোরে আনলো।

মৃত ডোমের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ দেখে জনকয়েক লোক তার বাডীর দিকে আসছে। শচীনন্দনকে সে চিনতো। তাকে দেখেই সে বুঝতে পারলো তার স্বামীর মৃতদেহ সৎকারের জন্যেই তারা আসছে। সে ছুটে গিয়ে তার পাযে লুটিয়ে পড়লো।

শচীনন্দন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ওঠালো, তারপর শব নিযে যাবার দিকে মনোযোগ দিলো। অল্প সময়ের মধ্যেই সব প্রস্তুত হোল। সকলে মৃতদেহ নিয়ে রওনা হোল শ্মশানে।

কাজ শেষ কোরে বাড়ী ফিরতে শচীনন্দনের বিকেল হোয়ে গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সে গেল সান্ধ্য মজলিসে।

মজলিসের অধিকাংশ সভ্যেরই শখ যাত্রাভিনয়ের। গত কিছুদিন যাবৎ তারা একখানা নাটকের মহড়া দিচ্ছিল। কিন্তু প্লেয়ার ঠিক মতো নির্বাচিত না হওয়ায় তেমন জমাতে পারছিল না। কথা ছিল আজ শচীনন্দনের উপস্থিতিতে কে কোন্ পার্টের যোগ্য তা নিয়ে বিচার-বিবেচনা হবে।

শচীনন্দন বললে, "আমি কিন্তু ভাই বড় ক্লান্ত। তা ছাড়া মনটাও আমার ভালো না। কাজেই ওটা আজ থাক।"

সকলেই রাজী হোল।

একজন কেবল জিগগেস করলো, "মনটা খারাপ কেন শচীদা? বৌদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?"

"নারে ভাই। সে মেয়ে এমন যে ঝগড়া করতেই জানে না। তা না, আজকের ঐ ঘটনাটা আমার মনটাকে বড্ডই ঘা দিয়েছে। কি বলো! ঘণ্টাব পর ঘণ্টা লাসটা পড়ে রইলো, ডোম বোলে কেউ সৎকার করতে এলো না।"

কারও মুখ দিয়েই আর কথা বেরোল না।

অনেকক্ষণ পরে একজন বললে, "এর জন্যে দায়ী তো আমাদের মাথারা। তেনারাই তো এ জিনিস আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেচে।"

"ঠিক।"

পাড়াব মোড়ল বসেছিল। বিরক্ত হোযে সে বললে, "শুধু তেনাদেব কেন দোষ দ্যাও বাপু? দোষ কি আমাদেবও নেই?"

"নিশ্চয়ই আছে। এ জিনিস যুগ যুগ ধোরে মেনে যাওয়াটাই হচ্ছে আমাদের দোষ," শচীনন্দন উত্তর দিলো।

বুড়ো মোড়ল না দমে বলতে লাগলো, "তুমি তো জ্ঞানী লোক সামন্তর পো, অন্য দিকটা কেন ভেবে দ্যাকোনা। এই যে চাষীদের আবস্তা দিন দিন এমন খারাপ হচ্চে, কেন?"

"কেন বলতো মোড়ল?"

"পিথিবীতে পাপের মাত্রা কেরমেই বাড়চে বোলে।"

নিতাই জানা বোলে উঠলো, "তুমি ঠিক বলেছ মোড়ল। এই দ্যাখো না ছেলেবেলায় এতো অভাব, এতো হাহাকার কক্খনো আমরা দেখেচি?"

"কে বললে তোমাদের পাপ বাড়ছে বোলেই এতো অভাব?" শচীনন্দন প্রশ্ন করলো। তারপর বলতে লাগলো, "যদি তাই হোত তা হোলে যারা সত্যিই পাপ করেছে, অহরহ করছে—ঐ জমিদাররা, ঐ রাজরাজড়ারা, ওরা এমন সুখে রয়েছে কি কোরে বলতে পারো? আর লক্ষ লক্ষ চাষী এমন কি পাপ করেছে যার জন্যে তাদের ঘরে এতো অভাব?"

"তা ঠিক।" সকলে সমস্বরে বোলে উঠলো।

শচীনন্দন বলতে লাগলো, "অভাবের আসল কারণ কি জানো? শোষণ, শোষণ। চেয়ে দেখ একদিকে বিদেশী রাজ আমাদের কাঁধে পা দিয়ে বোসে শুষছে আর অপরদিকে শুষছে এই দেশী জমিদারগুলো। এই রক্তচোষাগুলোর জন্যেই আজ আমরা এমন পঙ্গু হোয়ে পড়েছি। এদের জন্যেই আমাদের এত অভাব। এদের হাত থেকে যেদিন—"

আলোচনা চলছে এমন সময়ে হঠাৎ সকলে অবাক হোয়ে দেখলো জনকয়েক কনস্টেবল ও দফাদার সঙ্গে নিয়ে দারোগাবাবু তাদের সামনে উপস্থিত।

গম্ভীর গলায় দারোগাবাবু জিগগেস করলেন, "এখানে শচীনন্দন সামন্ত বোলে কেউ আছে?"

"কেন বলুন তো?"

"দরকার আছে।"

"আমিই শচীনন্দন সামন্ত।"

"ও তুমি! তোমাকে একবার থানায় যেতে হবে। তোমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।"

"আপনি বোলে কথা বলতে পারেন না?" বলতে বলতে শচীনন্দন উঠে দাঁড়ালো।

"আপনি বোলে? তোমায় আপনি বলতে হবে? হা হা হা। আমাদের আইনে তো সে রকম কিছু নেই।"

"কিন্তু সৌজন্যজ্ঞানও কি থাকবে না? আমি যেমন আপনাকে 'আপনি' বলছি আপনারও কি উচিত নয় আমায় তেমনি 'আপনি' বলা?"

একজন পাশ থেকে বোলে উঠলো, "সে শিক্ষা কি ওরা পেয়েছে?"

দারোগাবাবু দেখলেন যদিও তাঁর সঙ্গে কয়েকজন কনস্টেবল আছে কিন্তু এই রাত্রিবেলা থানা থেকে এতো দূরে গ্রামের অন্তস্তলে দাঁড়িয়ে এতো লোকের সঙ্গে বিরোধ করতে যাওয়া ঠিক হবে না। শিকার ধরা তো দূরের কথা, তাঁর নিজের জীবনও বিপন্ন হোতে পারে।

স্বর নরম কোরে তিনি বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, শচীনন্দনবাবু, তাই হবে। আপনি তা হোলে আমার সঙ্গে যাবার জন্যে তৈরী হোন।"

"কিন্তু গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কেন জিগগেস করতে পারি কি?"

আর একজন বললে, "চুরি? না ডাকাতি? গেরেপ্তার করবেন কি দোষে?"

দারোগাবাবু হাসতে হাসতে বেশ ঠাণ্ডা ভাবেই বললেন, "চুরি ডাকাতি না করলেও ভাই আমাদের অনেক সময়ে গ্রেপ্তার করতে হয়।"

"সে কেমন ধারা?"

"এই ধরুন না সরকার বাহাদুরের বিরুদ্ধে কিংবা জমিদারের বিরুদ্ধে যদি কেউ মানুষ ক্ষেপায় তাকেও আমরা গ্রেপ্তার করি।"

"কিন্তু উনি কি তেমন কিছু করেছেন?"

"সে বিচার আদালতের। আমার ওপর হুকুম গ্রেপ্তার করবার। আমি তাই এসেছি। এখন আমার কাজ আমায় করতে দিন।"

"না, শচীদাকে আমরা নিয়ে যেতে দোব না," বলতে বলতে দু'তিনজন যুবক এগিয়ে এলো।

"তাতে ফল খারাপই হবে। আমার কাজে বাধা দিলে আমি হয়তো ফিরে যাবো। কিন্তু আপনাদের এ কাজের জন্যে সারা গ্রাম শাস্তি পাবে।"

শচীন দেখলো শেষ পর্যন্ত পুলিসকে ঠেকানো যাবে না, মিছিমিছি আরও কয়েকজন গ্রেপ্তার হবে, অত্যাচারও হয়তো হবে। সে তাড়াতাড়ি একজনের কাঁধে হাত দিয়ে বললে, "দবকার নেই অনন্ত। বুঝলো তো, যতটা শক্তি থাকা আমাদের দরকার আমাদের তা নেই।"

তারপব দারোগার দিকে চেয়ে বললে, "ঠিক আছে, দারোগাবাবু, চলুন, আমি প্রস্তুত।"

দারোগাবাবু গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন।

সকলের দিকে চেয়ে শচীনন্দন বললে. "তোমরা ভাই আমার বাড়ীতে একটু খবব দিও, আর সকলে মিলেমিশে থেকো. ইস্কুলটার দিকেও একটু নজর রেখো। নমস্কার।"

"নমস্কার শচীদা, নমস্কার," সকলে একসঙ্গে বোলে উঠলো।

"তোমার আদেশ আমরা মাথা পেতে নিলুম শচীদা।"

আরেকজন . "এ আমাদের জমিদারেরই কারসাজী। আমরা বেশ বুঝতে পারছি।"

আরেকজন · "এ জুলুম কিন্তু আমরা কিছুতেই সইবো না।"

বাত্রি প্রায় নটা হবে। এইমাত্র আশপাশের শিয়ালগুলো একসঙ্গে কলরব কোরে উঠে থেমে গেল।

সাহেবী পোশাকে সুসজ্জিত অমরেশ। বলা বাহুল্য এই পোশাকেই সে অধিকাংশ সময় থাকে। দেশের অনেক ধনী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিও থাকেন। তাঁদের চোখে এই পোশাকই আভিজাত্যের পোশাক।

অমরেশ এতক্ষণ বারান্ডায় বোসে বন্ধু ও মোসাহেবদের নিয়ে গল্প করছিল। মাঝে মাঝে সদ্যকেনা কুকুর জ্যাককেও আদর করছিল। এইবার সে উঠলো।

সারাদিন এইভাবে কাটাতে কাটাতে সময়ে সময়ে তার খুবই ব্যাজার বোধ হয়।

সে তখন বাগানে গিয়ে কখনো বা জ্যাককে সঙ্গে নিয়ে, কখনো বা একলাটি, পায়চারি করতে থাকে।

আজও বন্ধুদের বিদায় দিয়ে বাগানে যাবার জন্যে সে বারান্ডার সিঁড়ি বেয়ে নামছে এমন সময়ে ম্যানেজারবাবু হন্তদন্ত হোয়ে এসে হাজির।

"কি খবর ম্যানেজার কাকা?"

"শোনোনি বাবাজী?"

"কি?"

"শচী সামন্তকে এইমাত্র পুলিস ধোরে নিয়ে গেল।"

"কে বললে?"

"সকলেই তো বলছে।"

"কি জন্যে?"

"কেউ বলছে জমিদারের বিরুদ্ধে ছিল বোলে, কেউ বলছে সরকারের বিরুদ্ধে ও নাকি কি সব প্রচার কোরে বেড়াতো।"

"কাঁটাটা তা হোলে এতদিনে হটলো। এদানিং বড্ড বাড়াবাড়ি করছিল। সকল সময়েই দেখ আমার বিরুদ্ধে গুজগুজ ফিসফিস। কিন্তু দেখুন তো এতদিন ধোরে আপনারা কিছুই করতে পারলেন না, অথচ আমি এসেই কত সহজে না—"

"কি জানো বাবাজী, তোমরা যা পারো আমরা তা পারি না। তোমাদের মুখের একটা কথায় পুলিস ছুটে আসে। আর আমাদের? গ্রাহ্যই করে না।"

"যাক। এখন রমানাথ ভট্চায্যির ব্যাপারটা কদ্দুর গড়ালো বলুন।"

"আর দেরী নেই বাবাজী। কোর্ট থেকে যে তিরিশ দিনের সময় ও পেয়েছিল তা উৎরে গেছে। ও খাজনা দিতে পারেনি।"

"তা হোলে?"

"এখন সেই ব্যবস্থাই হচ্ছে—ক্রোক হবে।"

"বহুৎ আচ্ছা।"

কতকাল পরে আবার রমানাথ ভট্চায্যি ঢুকেছেন জমিদারবাড়ী। তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম হবে। একান্ত নিরুপায় হোয়ে তিনি এসেছেন যদি তরুণ জমিদার দয়া কোরে তাঁকে এ অসম্মান থেকে রক্ষা করেন।

"উঃ নারায়ণ!" বলতে বলতে রমানাথ কাছারীর বাইরে বারান্ডায় বোসে পড়লেন। এই ক'বছরে তিনি যেন আরও বুড়ো হোয়ে পড়েছেন।

অনেক আকুতিমিনতি কোরেও কিন্তু তিনি জমিদারের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলেন না। ম্যানেজারবাবু জানালেন জমিদার দেখা করবেন না।

আরও কয়েকজন কর্মচারী ছিলেন কাছারীতে। কথায় কথায় তাঁরা বললেন, "কাজটা কিন্তু ভাই ভালো করোনি।"

"নারায়ণই জানেন ভাই ভালো করছি কি মন্দ করছি", বললেন রমানাথ।

ম্যানেজারবাবু : "কিন্তু এখন ভুগতে হচ্ছে তো। কত দুরবস্থায় না দিন কাটাতে হচ্ছে। তার ওপর যখন কাল পেয়দা এসে জিনিসপত্তর টানাটানি করবে—"

রমানাথের চোখ দিয়ে কয়েকফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

কেউ আর কোন কথা কইতে সাহস করলো না।

অবশেষে যখন দেখা গেল আর কোন উপায় নেই রমানাথ আর একবার অনুরোধ করলেন. "আপনি যদি দয়া কোরে একটা ব্যবস্থা কোরে দেন ম্যানেজারবাবু?"

"ব্যাপার কি জানেন, জমিদার আপনার ওপর এমনি খাপ্পা যে আপনার জন্যে যদি কিছু বলতে যাই তো আমারই চাকরী যাবে।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে পড়া ছাড়া রমানাথের আব গত্যন্তর রইলো না।

পথে যেতে যেতে রমানাথ ভাবেন : হায়! এত বড় বিপদে কে একটু সাহায্য করবে? কার কাছে গিয়ে দাঁড়ানো যায়? একমাত্র ভরসা ছিল শচীনন্দন। এ বিপদের কথা শুনলে সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারতো না। ধার কোরে হোক, কর্জ কোরে হোক, যেমন ভাবেই হোক তাঁকে বাঁচাতো। কিন্তু মিথ্যা অভিযোগে কিনা বেচারিকে জেলে পুরে রেখেছে!

খালি ঝাঁকা মাথায় কোরে একজন ব্যাপারী হাট থেকে ফিরছিলো। রমানাথ তাকে জিগগেস করলেন, "বেলা কত হবে গো ছেলে?"

"তা দুপহর হবে," ছেলেটি বলতে বলতে চলে গেল।

দুপুর হবে! তা হোলে কুণ্ডুর দোকান বন্ধ হোয়ে গেল না তো? আজও তা হোলে উপোস! তাইতো, মেয়েটাব কি হবে!

মাঠটা পেরোলেই নফর কুণ্ডুর দোকান। নারকেল গাছের পাশ দিয়ে চালাটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মাঠ আব শেষ হয না। রমানাথ মাঝে মাঝে মুখ তুলে চালাটার দিকে তাকান, তাবপর আবাব মাথা হেঁট কোরে চলেন।

দোকান বন্ধ করবার জন্যে নফর আয়োজন করছে। সবে মাত্র দোকানের সামনেটা ঝাঁট দিয়ে সে এক খামচা সরসের তেল নিযে পিঠে রগড়াচ্ছিল।

রমানাথকে দেখতে পেযে হাতদুটো কপালে ঠেকিযে সে বললে, "পেন্নাম ঠাকুর। কোথা গেছলে এদিগে?"

"একবার জমিদারবাড়ী গেছলুম ভাই। উঃ কি রোদ্দুর!" বলতে বলতে রমানাথ ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে কপালের ঘামটা ঝেড়ে ফেললেন।

"হ্যাঁ, বড্ড রোদ্দুর। বিকেলের দিগে গেলেই তো পাত্তে। বসবে নাকি? তামাক দেব?"

"না থাক। তুমি কি নাইতে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। কিছু বলবে?"

"আমাকে যদি তা হোলে আজও সের পাঁচেক চাল দিতে ধারে।"

"আবার ধার! তের টাকা ন' আনা আড়াই পয়সা আজ কদ্দিন ধোরে পড়ে আছে বলতো। তোমরা ঠাকুর যদি সব্বাই এমনি করো আমি দাঁড়াই কোথা?"

রমানাথের বিষণ্ণ মুখখানার দিকে চাইতেই কিন্তু তার মায়া হোল। কণ্ঠস্বর নরম কোরে বললে, "তবু তোমাকে আমি তত তাগাদা করি না। দেখছি তো কত কষ্টে পড়েছ।"

"হ্যাঁ ভাই। নইলে কে আর—"

"আচ্ছা নিয়ে যাও সের আড়াই। তার বেশী কিন্তু পারবুনি।"

তেলমাখা হাতটা কাঁধের গামছায় মুছে নফর আড়াই সের চাল ওজন করে দিল।

চাদরে চালগুলি বাঁধতে বাঁধতে রমানাথ বললেন, "বড্ড উপকার হোল ভাই। নারায়ণ তোমার ভাল করুন।" তারপর "নারায়ণ! নারায়ণ!" বলতে বলতে ব্রাহ্মণ খানিকটা পথ চলে এলেন।

নফর দোকান বন্ধ করতে লাগলো। রমানাথের কানে এল সে চেঁচিয়ে বলছে, "টাকাটা একটু শীগগির দেবার চেষ্টা কোর ঠাকুর।"

বৃদ্ধ পেছন ফিরে উত্তর দিতে যাবেন কি তাঁর নিজের লাঠিতেই ঠোক্কর খেয়ে পড়ে গেলেন। চালগুলিও সঙ্গে সঙ্গে পথের ওপর ছড়িয়ে পড়লো।

"হা নারায়ণ!" বলতে বলতে তাঁর চোখদুটি অশ্রুতে ভরে উঠলো।

উঠে বোসে রমানাথ প্রথমে চালগুলির অবস্থা দেখতে লাগলেন, তারপর পেছন ফিরে দেখলেন নফর আছে কিনা। না, দোকান বন্ধ কোরে সে চলে গেছে। আশ-পাশেও কেউ নেই যে একটু সাহায্য করে।

লাঠিটা দিয়ে চালগুলো জড় করতে করতে আপন মনে রমানাথ বলতে লাগলেন, "হা নারায়ণ! এত দুঃখও অদৃষ্টে লিখেছ! না জানি পূর্ব জন্মে কত পাপই করেছিলুম! মেয়েটা কাল রাত্তির থেকে না খেয়ে আছে। এখন..নিশ্চয়ই নফর ভাল মনে দেয়নি।"

ধুলো থেকে বেছে বেছে রমানাথ চালগুলো তুললেন। পাটা তাঁর খুবই মুচড়ে গিয়েছিল। পিঠের শিরদাঁড়াটাতেও লেগেছিল। লাঠিটা ঠুকতে ঠুকতে কোনরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আবার তিনি চলতে লাগলেন।

আঘাত, অভাব, আসন্ন বিপদের দুর্ভাবনা তাঁকে খুবই দুর্বল কোরে ফেলে-ছিল। চেষ্টা কোরেও তিনি তাড়াতাড়ি যেতে পারছিলেন না।

কিছুদূর যেতেই একটা পুকুর। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। পাড়ের ওপর লাঠি ও চালের পুঁটলিটা রেখে তিনি আস্তে আস্তে জলে নেমে গেলেন।

পুকুরে দুটি ছেলে স্নান করতে এসেছিল। রমানাথকে তারা চিনতো। হঠাৎ তাঁকে পড়ে যেতে দেখে তারা দৌড়ে গেল। রমানাথ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

ওদিকে দরজার ধারে সাবিত্রী বোসে, স্বামীর প্রতীক্ষায়। মেয়ে সুমিত্রা পাশে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে দিয়ে মার চুলের জট ছাড়িয়ে দিচ্ছে।

দুঃখের আবেষ্টনে মানুষ হোলেও সুমিত্রার সোনার অঙ্গে আঁচড়টাও পড়েনি। লাল ঠোঁটদুটিতে হাসি যেন সকল সময়ে লেগেই রয়েছে।

সুমিত্রা সবচেয়ে বেশী আঘাত পায় তখন যখন প্রতিবেশিনীরা তার মাকে যা তা শোনায়, তাকে আইবুড়ো রেখে দেওয়ার জন্যে। হায়, তারা কি জানে না যে গরীবের মেয়ের পাত্র সহজে জোটে না?

মা ও মেয়ে দুজনেরই চিত্ত উদ্বিগ্ন, রমানাথ কি খবর নিয়ে আসেন তা শোনবার জন্যে। দুজনেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

এক সময়ে সুমিত্রা আর থাকতে না পেরে বলে, "মা, দুখানা বাতাসা এনে দি, একটু জল খাও।"

আজ সকালে রাধু চক্রবর্তীর বাড়ী শিরনি হয়েছিল। রাধু চক্রবর্তীর মা শৈবলিনী এক বাটি শিরনি ও খানকতক বাতাসা তাদের দিয়ে গিয়েছিলেন। বাতাসা ক'খানা সুমিত্রা তুলে রেখে দিয়েছিল।

"না মা, বরং তুই খা।"

"আমি তো সিন্নিটা খেলুম। তুমি বরং—"

"সে কি হয়? উনি রইলেন বাইরে। এই দুপুর রোদ্দুরে মাঠ ভাঙতে ভাঙতে মাথার চাঁদি ফেটে যাচ্ছে। আমি তবু তো ঘরে।"

"বাবার জন্যেও খানকয়েক রেখেছি।"

"তা হোক, ও ক'খানাও বরং থাক। আজও যদি কিছু না মেলে? তবু তো মুখে দিতে পারবি।"

"আমার আর খেতে ইচ্ছে নেই মা। তোমার জন্যে দুখানা আনি বরং।"

"না রে না, অত বকতে পারি না বাপু, যা।"

সুমিত্রা কিন্তু নিরস্ত হোল না, ঘরে ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে দরজার কপাটে ধাক্কা খেয়ে তার বাঁ হাতের কাঁচের চুড়ি ক'গাছা গেল ভেঙে।

তার মুখ শুকিয়ে গেল। তাই তো, মা রাগ করবে যে! হাত খালি ছিল বোলে মা শৈব ঠাকুমার কাছ থেকে পয়সা ধার কোরে তার হাত সাজিয়ে দিয়েছিল। সে পয়সা এখনও শোধ হয়নি যে। সুমিত্রা চুড়ির টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিলো।

একটা কথা হঠাৎ তার মনে পড়লো। ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠলো। কোন অমঙ্গল হোল না তো? বাবার কিছু? যদি জমিদার বাবাকে হাঁকিয়ে দিয়ে থাকে?

দিতে যে পারে না তাতো না! ওরা তো ওই রকমই। তাহোলে? কাল রাত পোহালে তারা দাঁড়াবে কোথা? কিন্তু, কিন্তু ওরা কি এতই নিষ্ঠুর হবে!

"ওরে মিত্রা শোন্‌রে।" হঠাৎ সাবিত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন।

"কি মা?" বলতে বলতে সুমিত্রা ছুটে এলো।

"দেখ্‌তো, দেখ্‌তো ওঁর মত কাকে যেন ওরা ধরাধরি কোরে নিয়ে আসছে?"

"কৈ মা?"

সুমিত্রা ছুটে এলো।

"ঐ যে! ঐ যে!"

মা ও মেয়ে পথের ওপর বেরিয়ে এসে বেড়ার ধারে ঝুঁকে দেখতে লাগলো। সাবিত্রীর চেঁচামেচিতে আশপাশের বাড়ী থেকেও দু'তিনজন স্ত্রীলোক ছুটে এলেন। তাঁরাও পায়ের ওপর ডিঙি মেরে দেখতে লাগলেন।

রমানাথকে নিয়ে ছেলেদুটি ততক্ষণে বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছে।

দরজার সামনে একটা বেল গাছ। একটা বুড়ো কাক গাছটার ওপর বসে ঝিমোচ্ছিল। হঠাৎ গোলমাল শুনে সে ডানা ঝটপট করতে করতে উড়ে গেল।

"ওমা, একি হোল গো আমার!" সাবিত্রী কেঁদে উঠলেন। তারপর উপু হোয়ে বোসে মুখে কাপড় দিয়ে ফোঁপাতে লাগলেন।

সুমিত্রাও ডুকরে উঠলো।

রাধু চক্রবর্তীর মা শৈবলিনী তাড়াতাড়ি ছুটে এসে সুমিত্রাকে ঠেলা দিয়ে বললেন, "আ মরণ! শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদলেই হবে? শীগ্‌গির একটা মাদুর আর একটা পাখা নিয়ে আয়।"

মাদুর পেতে তার ওপর একটা বালিশ দিয়ে সুমিত্রা গাছতলায় বিছানা কোরে দিলো। ছেলেদুটি রমানাথকে তার ওপর শুইয়ে দিলো।

ভ্যাবাচাকা-খাওয়া সুমিত্রার হাত থেকে পাখাটা টেনে নিবে শৈবলিনী রমানাথের শিয়রে বোসে হাওয়া করতে করতে বললেন, "জল। কেউ একটু শীগ্‌গির জল নিয়ে এসো।"

ছেলেদুটির মধ্যে একজন দৌড়ে গিয়ে পুকুর থেকে জল নিয়ে এসে বৃদ্ধের চোখেমুখে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলো।

সুমিত্রা পাশে বসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে পিতার শিরওঠা শীর্ণ বাহুদুটিতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। পাড়ার ছেলেমেয়েরা এঁকে ঠানদি বোলে ক্ষেপায়। হঠাৎ তিনি বোলে উঠলেন, "কি বিপদ দেখ দিকি! কাল তো আবার শুনছি মাল কোরক করতে আসবে!"

সাবিত্রী মাথা নিচু কোরে রইলেন।

শৈবলিনী থাকতে পারলেন না। ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "যার জ্বালা সেই বোঝে ঠাকুরঝি। দূর থেকে দাঁড়িয়ে অত দরদ দেখাতে হবে না, ঘরে যাও।"

"মানুষ থাকলেই বলে। তুমি কেন বাপু অমন—"

"আচ্ছা আমার অপরাধ হয়েছে। এখন একটু চুপ করো।"

খানিক পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রমানাথ চোখ চাইলেন।

এতক্ষণে সাবিত্রীর যেন জ্ঞান ফিরে এল। উঠে এসে বললেন, "তুমি একটু জিরোও মাসীমা।" তারপর শৈবলিনীর হাত থেকে পাখাটা নিয়ে স্বামীর মাথায় হাওয়া করতে লাগলেন।

সবাই চলে গেল।

সুমিত্রা ছুটে গিয়ে বাতাসা যে ক'খানা ঘরে ছিল তা দিয়ে সরবৎ কোরে নিয়ে এসে পিতার মুখের কাছে ধরলো।

বৃদ্ধ মাথাটা তুলে আস্তে আস্তে খেলেন। তারপর উঠে সাবিত্রীর কাঁধে ভর দিয়ে ঘরে গেলেন। শৈবলিনীও তাড়াতাড়ি মাদুর ও বালিশটা তুলে নিয়ে এসে দাওয়ায় বিছিয়ে দিলেন। রমানাথ শুয়ে পড়লেন।

রমানাথ এখন বেশ সুস্থ। অনেকক্ষণ ধোরেই তাঁদের স্বামীস্ত্রীতে আলোচনা চললো। হঠাৎ শোনা গেল সাবিত্রী "মাগো" বোলে ফুঁপিয়ে উঠে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

ভাত সেদ্ধ হোল। সুমিত্রা সরাসুদ্ধ হাঁড়িটা উনুন থেকে নামিয়ে মেঝের ওপর উপুড় কোরে দিলো ফেন গালবার জন্যে। ওদিকে গরুটা চেঁচাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি কতকগুলো শুকনো খড় কেটে সে তার ডাবায় দিয়ে এল। তারপর পুকুর থেকে গোটাকতক কলমীশাক তুলে আনলো।

মাকে অমন কোরে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখে তারও কান্না পেতে লাগলো। ফেরবার সময় সে দেখলে মার গালদুটি চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। তার বুঝতে বাকী রইল না রাত পোহালে কি অসহায় অবস্থায় তাদের পড়তে হবে। ভিজে শাকের চুপড়িটা নিয়ে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত অন্তরে সে রান্নাঘরে ঢুকলো।

সন্ধ্যা নামলো। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে সুমিত্রা গলবস্ত্র হোয়ে প্রণাম করলো, বার বার বললে, "ঠাকুর রক্ষে কর।"

তারপর দাওয়ায় এসে রমানাথের সামনে জলের ঘটিটা বসিয়ে দিয়ে বললে, "বাবা, মুখ হাত ধুয়ে দুটো মুখে দাও, ওঠ।"

অনেকবার বলার পর রমানাথ রাজী হলেন কিন্তু খেতে পারলেন না। সাবিত্রী তো বসতেই চাইলেন না।

"দুটি খাও মা, লক্ষ্মীটি।"

"ভাত কি আর মুখে ওঠে মা! কাল সকালে যখন র‍্যাজ্যিসুদ্ধ লোকের সামনে পেয়দা এসে জিনিসপত্তর টানাটানি করবে—"

সাবিত্রী ফোঁপাতে লাগলেন।

অনেক কষ্টে সুমিত্রা অশ্রু সংবরণ কোরে রেখেছিল। সেও যেন আর নিজেকে ধোরে রাখতে পারছিল না, ভেঙে পড়লো।

কিছুক্ষণ কাঁদার পর দুজনেরই বুক যেন খানিকটা হাল্কা হোয়ে গেল। সুমিত্রা বললে, "এক কাজ করলে হয় না মা?"

সাবিত্রী তার মুখের দিকে চাইলেন।

"একবার আমি গিয়ে জমিদারকে ধরবো?"

"তুই?"

"হ্যাঁ।"

"তুই কখনো পারিস মা!"

"কেন পারবো না?"

"তোকে ঢুকতেই দেবে না রে, আর যদি বা দেয় তোর কথা গ্রাহ্য করবে কেন? বলে এদ্দিনকার পুরনো কর্মচারী ওঁকেই—"

"চেষ্টা কোরে দেখতে দোষ কি?"

"কিন্তু আর তো সময় নেই মা। শুনছি কাল সকালেই নাকি—"

"এখনই একবার যাব? শৈব ঠাকুমাকে সঙ্গে কোরে?"

সাবিত্রীর চোখের সামনে যেন একটা ক্ষীণ আশার আলো ভেসে উঠলো। বললেন, "পারবি তাহোলে?"

"খুব।"

সাবিত্রী তবু কি যেন ভাবতে লাগলেন।

"বাবার মতটা একবার নোব?"

"উঁ? না, থাক্। ওঁকে বিরক্ত কোরে কাজ নেই। তাছাড়া যদি আপত্তি করেন?"

"তবে বেরিয়ে পড়ি।"

"কিন্তু দুটি খেয়ে যা। না হোলে এতখানি পথ চলতে পারবি না যে মা।"

"বেশ, তুমিও তাহোলে আমার সঙ্গে দুটি খাবে বলো।"

অগত্যা মাকেও রাজী হোতে হয়।

খানিক পরে সাবিত্রীর সঙ্গে সুমিত্রা বাইরে এসে দাঁড়ালো। সাবিত্রী দরজা বন্ধ কোরে শেকলটা তুলে দিলেন। তারপর পায়ে পায়ে মা ও মেয়ে রাধু চক্রবর্তীর বাড়ীর দিকে এগোলো।

রাধু চক্রবর্তী ও তাঁর দুই ছেলে খেতে বসেছিল। বাড়ীর ভেতর থেকে তখনও ঢেঁকি ভাঙার আওয়াজ আসছিল—কঁচর কঁচ্, কঁচর কঁচ্।

একটা বেড়াল লাফিয়ে পড়লো মটকার ওপর থেকে।

রুদ্ধ দরজার ধারে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা ডাকলো "ঠাকুমা! ঠাকুমা!"

"কে রে? মিত্রা? কেন রে?" শৈবলিনী সাড়া দিলেন।

"একবারটি শোন।"

শৈবলিনী বেরিয়ে এলেন।

সুমিত্রার পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন সাবিত্রী। এগিয়ে এসে বললেন, "একটা উপকার করতে হবে মাসীমা।"

"কি বৌ?"

"একবারটি জমিদারের কাছে মেয়েটাকে নিয়ে যেতে হবে। ও বলছে, ও একটু চেষ্টা কোরে দেখবে।"

"কিন্তু ওর কথা কে কানে নেবে?"

"একবার দেখা যাক শেষ চেষ্টা কোরে।"

শৈবলিনীর তবু সন্দেহ যায় না। বলেন :

"কিন্তু.. বড্ড রাত হোয়ে গেছে না? তার চেয়ে বরং কাল সকালে—"

"ততক্ষণে যে পেয়াদা এসে খুদকুঁড়ো যা আছে সব টেনে বার করবে মাসীমা দেশসুদ্ধ লোকের সামনে।"

"তা বটে। আচ্ছা, ছেলে-নাতিদের খেতে দিয়েছি, খাওয়াটা হয়ে যাক। তোমরা বরং বাইরেই থাকো। ওদেব জানতে দিয়ে কাজ নেই।"

শৈবলিনী যেতে সম্মত হওয়ায় সুমিত্রা যেন হাতে স্বর্গ পেল। সে তাড়াতাড়ি বোলে উঠলো, "ঠিক আছে ঠাকুমা. তুমি সেবে নাও। আমরা বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি।"

শৈবলিনী ভেতরে চলে গেলেন। সুমিত্রাকে নিয়ে সাবিত্রী একটু সরে এসে গোলাটার আড়ালে দাঁড়ালেন।

"রমানাথের মেয়ে ডাকছিল কেন মা?" রাধু চক্রবর্তী শৈবলিনীকে জিগগেস করলেন।

"তোর সে খোঁজে দরকার কি রে?"

"আচ্ছা মা, তুমি ওদের সম্বন্ধে আমাদের কাছে কিছু ভাঙতে চাও না কেন বলতো?"

"ভেঙে কিছু লাভ আছে বলতে পারিস?"

মা ও ছেলের কথাবার্তা বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছিল। সাবিত্রী ও সুমিত্রার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো।

কিছুক্ষণ পরে দাওয়ার আলোটা নিবে গেল।

বাইরে এসে শৈবলিনী সুমিত্রার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "চল্ দিদি; অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি।"

তারপর কাপড়ের ভেতর থেকে দুটো পাকা কলা বার কোরে সাবিত্রীর হাতে দিয়ে বললেন, "মিত্রার জন্যে এ দুটো নিয়ে যাও বৌ। কিছু তো আর দিতে থুতে পারি না। কিন্তু না, দাঁড়াও। এতখানি পথ যেতে হবে, একটা আলোর দরকার। লণ্ঠনটা নিয়ে আসি।"

সাবিত্রীর চোখ জলে ভরে উঠলো। কি বোলে যে তিনি কৃতজ্ঞতা জানাবেন খুঁজে পেলেন না।

আলোটা হাতে নিয়ে শৈবলিনীর পাশে পাশে সুমিত্রা চলতে লাগলো। যতক্ষণ তাদের দেখা গেল সাবিত্রী সেই দিকে চেয়ে রইলেন। ক্রমে আলোটা আর দেখা গেল না। "নারায়ণ রক্ষে কর!" বলতে বলতে সাবিত্রী বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন।

সুমিত্রাকে দাঁড় করিয়ে শৈবলিনী প্রাসাদের মধ্যে ঢুকলেন।

সুমিত্রা অবাক হোয়ে দেখতে লাগলো।

জোনাকিগুলো চতুর্দিকে ঝিক্‌মিক্ করছে। বিরাট বিরাট থাম। তাদের ফাঁক দিয়ে বাইরে গাছপালার ওপর আলো এসে পড়েছে। সমস্ত পরিবেশটাই কেমন যেন রহস্যময় বোধ হোতে লাগলো তার।

একখানা গোরুর গাড়ী এইমাত্র ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো। সুমিত্রা চেয়ে দেখে গাড়ীর ওপর নানাবিধ ফলের স্তূপ।

"পথ ছাড় গো মা!" মুখ থেকে হুঁকোটা সরিয়ে নিয়ে গাড়োয়ান বললে।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালো। গাড়ীখানা আস্তে আস্তে পাশ দিয়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

ফটকের ভেতর কাছারীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুজন চাকর ঝগড়া করছিল। একটি মেয়ে, খুব সম্ভব জমিদারবাড়ীরই দাসী, মাঝে মাঝে তাদের বলছে, "তোমরা কি থামবে না বাপু? সেই কখন থেকে শুরু করেছ!"

দূরে অলক্ষ্যে একখানা রেলগাড়ী যাওয়ার শব্দ শোনা গেল : ঝিক্‌ঝিক্! ঝিক্‌ঝিক্! হাহা! হাহা!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুমিত্রার পা ব্যথা হয়ে উঠলো। বসবার জন্যে সে এদিক ওদিক চাইছে এমন সময়ে শৈবলিনী ফিরলেন।

"কি হোল ঠাকুমা?" সাগ্রহে সে প্রশ্ন করলো।

"জমিদারের সঙ্গে দেখা কি সহজে হয় বাপু?"

সঙ্গে সঙ্গে একজন দাসী বেরিয়ে এলো। দাসীটি বললে, "এমন সময়ে দেখা করতে আসে? তোমাদের কি যে আব্দার!"

"বড্ড বিপদে পড়েই এসেছি গো মেয়ে।"

দাসী একটু ইতস্তত করলো। তারপর সুমিত্রাকে বললে তার পিছনে পিছনে যেতে।

ফটকের মধ্যে তারা ঢুকলো।

সুমিত্রা প্রথমটা দাসীর কথা শুনে নিরাশ হোয়ে পড়েছিল। আলোটার যে দরকার নেই তার সে খেয়ালই ছিল না। সে আলোটা নিয়েই চলতে লাগলো।

দাসী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: "ও কপাল! এত আলোতেও কি তুমি দেখতে পাও না বাছা যে হেরিকেন সঙ্গে আনছো?"

সুমিত্রা কথাটি না কয়ে তাড়াতাড়ি আলোটা শৈবলিনীর কাছে রেখে দিয়ে গেল।

জমিদারবাড়ী এর আগে সুমিত্রা কখনো আসেনি। বিস্ময়ে, ভয়ে তার বুক কাঁপতে লাগলো।

কিছুদূর যেতেই দেখে সামনে প্রকাণ্ড ভাঁড়ার ঘর। ভাঁড়ারের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন স্ত্রীলোক। বোধ হয় আত্মীয়া অথবা আত্মীয়স্থানীয়া। পাশে পড়ে রয়েছে সদ্য আসা ফলগুলি। রমণীরা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে।

সিঁড়ি বেয়ে তারা উপরে উঠে গেল।

দু পাশে ঘর। মাঝে দালান। দালানের দেয়ালে টাঙানো বাঘের ছাল, সিংহের মাথা, হরিণের শিঙ।

মেঝেটা আগাগোড়া কারপেটে মোড়া। সুমিত্রার ভয় হোল যদি পায়ের দাগ লেগে এমন দামী জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায়। সে থমকে দাঁড়ালো।

"কি গো বাছা? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?" দাসীর তিরস্কারে সুমিত্রা শিউরে উঠে আবার চলতে থাকে।

আরেকখানা ঘর। এক তরুণী পালঙ্কের ওপর শুয়ে। সুমিত্রাকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করলো: "ও কে হেমা?"

দাসী হেমা যেতে যেতে উত্তর দিলো, "বলো না গো তুমি কে?"

সুমিত্রার মুখ লাল হয়ে উঠলো। তার পা যেন আর চলতে চায় না। তবু সে চলে।

হঠাৎ দাসীর হুকুম: "দাঁড়াও।"

সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

"ঐ ওখানে জমিদার বসে রয়েছেন।"

বিরাট বারান্ডা। বারান্ডায় নানারকমের গাছ—যেন কুঞ্জ।

ফুরফুরে হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো কাঁপছে। মাথার ওপর তারকোজ্জ্বল নীলাকাশ।

সুমিত্রার বুকে কে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগলো। কপাল ঘামে নেয়ে উঠলো।

"তুমিও চল!" অনুরোধের সুরে সে দাসীকে বললে।

"আমি কি যাব গো? অত লজ্জা যদি তবে আসা কেন বাপু?"

সাহসে ভর কোরে সুমিত্রা পা বাড়ালো।

উন্নতললাট দিব্যকান্তি সাহেবী পোশাক পরা এক তরুণ গদিমোড়া চেয়ারের ওপর হেলান দিয়ে বোসে। সামনে তার একখানা ছোট পাথরের গোল টেবিল। টেবিলের ওপর কতকগুলি বোতল ও গেলাস। একটা গেলাসে লাল মতো খানিকটা কি ঢালা।

আবহাওয়ায় একটা উগ্র অথচ মিষ্টি গন্ধ। সুমিত্রা মদের নাম শুনেছে কিন্তু মদ কি জিনিস তা কখনো চোখে দেখেনি। কাজেই ভাবলে কোন বিশেষ রকমের সরবৎ হবে হয়তো। দরজার কাছে সে দাঁড়িয়ে রইল। তার নিঃশ্বাস আগুনের চেয়ে গরম।

সে দেখলো অমরেশ তার পুষ্ট হাতখানি বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে গেলাসটা তুলে এনে মুখের কাছে ধরছে। দু চুমুক পান কোরেই গেলাসটা সে আবাব টেবিলের ওপর রাখলো। তারপর আবার দু চুমুক খেল।

হঠাৎ মানুষের ছায়া দেখে অমরেশ প্রশ্ন করলো, "কে?"

সুমিত্রা জবাব দিতে পারে না। তার স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে।

অমরেশ আবার প্রশ্ন করে, "কে?"

"আমি, আমি উত্তরপাড়ার ভট্চায্যিদের—" সুমিত্রা আর বলতে পারে না। তার গলা কাঁপছে।

"কি চাও তুমি?" তেমনি নির্লিপ্ত ভাবেই অমরেশ জিগগেস করে।

"আমার একটা প্রার্থনা আছে আপনার কাছে।"

"প্রার্থনা? আমার কাছে? বেশ, বলো শুনি।"

"আপনি, আপনি. আপনি—"

অমরেশ হেসে উঠলো, "হা-হা-হা। আমি, আমি, আমি কি?"

"আপনি আমাদের জিনিসপত্তর কোরোক করবার আদেশ করেছেন কেন?"

"করেছি? তা হোতে পারে। তোমরা আমার খাজনা বাকী ফেলেছ কেন?"

"আমাদের অবস্থা—"

"আমার তো তা জানবার দরকার করে না।"

"জানবার দরকার করে না? আপনি না আমাদের জমিদার?"

ক' মাস ধরে অমরেশ নিজের হাতে জমিদারি পরিচালনা করছে। কখনো এমন

কথা কারও কাছে শোনেনি। বয়স্ক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা পর্যন্ত তাকে সমীহ কোরে চলে।

সে চমকে উঠলো। মাথাটা তুলে সুমিত্রার দিকে চাইলো: একি! এ যে স্বর্গের অপ্সরা!

বিদ্রূপ, তাচ্ছিল্য, ঔদ্ধত্য, কোনটাই সে প্রকাশ করতে পারলো না।

"আমার জানবার দরকার করে?" বলতে বলতে সে রমণীর দিকে ঘুরে বসলো।

"নিশ্চয়ই।" সুমিত্রা দুপা পেছিয়ে এল।

"বেশ, কি করতে হবে বলো।"

"কাল সকালে পেয়দা আসছে কোরোক করতে। কোরোক যাতে না হয় তার ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে।"

অমরেশ গেলাসটা মুখের কাছে তুলে আবার চুমুক দিলো: "এই কথা? বেশ, তাই হবে।"

একি শুনলো সুমিত্রা! সে যে এতোটা আশাই করতে পারেনি। সারা পথ সে ভাবতে ভাবতে আসছিল হয়তো তাকে হাঁকিয়েই দেওয়া হবে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞ চিত্তে সে বললে, "তবে আসি আমি।"

"হ্যাঁ। না। একটু দাঁড়াও। হ্যাঁ, কি বললে? উত্তরপাড়ার—"

"উত্তরপাড়ার ভট্চায্যিদের—রমানাথ ভট্চায্যির মেয়ে আমি।"

"ও, তাই নাকি? কিন্তু তুমি কি জানো না তোমার বাবা আমার কি সর্বনাশ করেছে?"

"সর্বনাশ! না, তিনি তো আপনার কোন সর্বনাশ করেননি।"

"করেননি?"

"না। যে জিনিস আপনার নয় তা আপনার বোলে মিথ্যে সাক্ষি তিনি দেননি এই তাঁর অপরাধ। আমি বরং বলবো যদি তিনি দিতেন তা হোলে বরং আরেকজনের সর্বনাশ করা হোত।"

কথাগুলো অমরেশের অন্তরে যেন চাবুক-পেটা করলো। সত্যিই কি সে তা অস্বীকার করতে পারে?

পরক্ষণেই কিন্তু তার ভেতরকার সাঁচ্চা মানুষটি সরে গেল। সে বোলে উঠলো, "কিন্তু আমাদের খেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে—"

"ও সেইজন্যে আপনি আমাদের শাস্তি দিতে চাইছেন?"

"হ্যাঁ।"

"সেদিক থেকেও আমি বলবো অন্যায়।"

"কেন?"

"ভেবে দেখুন আপনি কতো বড় আর আমরা কতো ছোট। আমাদের আঘাত করলে আপনার হাত শুধু কলঙ্কিতই হবে।"

"বাঃ! বেশ কথা বলতে শিখেছ তো!" অমরেশ আবার গেলাসে চুমুক দিলো।

"আমায় ক্ষমা করবেন যদি আমার কথায় কিছু—"

"না, না, ভালোই লাগছে, ভালোই লাগছে তোমার কথা শুনতে। তার চেয়ে আরও ভালো লাগছে তোমায় দেখতে।"

"তা হোলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। যাতে ক্রোক না হয় আমি দেখছি।"

সুমিত্রা চেয়ে দেখলো অমরেশের চোখদুটো অস্বাভাবিক লাল হোয়ে উঠেছে। তার কেমন যেন ভয় করতে লাগলো। খুব মৃদুস্বরে সে বললে, "আমাকে তাহোলে এবার যেতে আদেশ দিন।"

উত্তরের অপেক্ষা না কোরেই সে আস্তে আস্তে সরে এলো। কয়েক পা আসতেই শুনতে পেল পিছন থেকে জমিদার হাঁকছেন, "কি হোল? চলে গেলে? না, না, যেও না। শোন, শোন।"

কিছুদূর এগিয়ে এসে সুমিত্রা চারদিক চাইতে লাগলো। কোথা গেল সেই দাসীটি? আশপাশে সে উঁকি মারতে লাগলো। না, কেউ নেই। এখন উপায়? এই বিরাট প্রাসাদ থেকে কেমন কোরে বেরোবে?

কয়েক পা পরেই দেখতে পেলো সেই ঘরটাতে সেই রমণীটি তেমনি ভাবেই শুয়ে সেই পালংকের ওপর।

রমণী তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো।

সুমিত্রার কেমন যেন সংকোচ হোতে লাগলো। অনেক কষ্টে লজ্জা কাটিয়ে সে তাকে জিগগেস করলো, "আমাকে যে এনেছিল সে কোথায় বলতে পারেন?"

"সে তো চলে গেছে।"

"আমি তাহোলে কেমন কোরে যাব?"

"আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তাকে ডাকছি।"

সুমিত্রা দাঁড়িয়ে রইলো। রমণীটি বিছানার ওপর উঠে বোসে হাতপাখাটা নাড়তে নাড়তে তার সঙ্গে কথা জমাবার চেষ্টা করতে লাগলো :

"দেখা হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"কি জন্যে এসেছিলে? খাজনার ব্যাপারে বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"কাজ কিছু হোল?"

সুমিত্রা মাথা নেড়ে জানালো, হয়েছে।

"লজ্জা কি? আমিও তো তোমারই মত জমিদারের অনুগ্রহপ্রার্থী। ক'দিন হোল এখানে এসে রয়েছি।"

সুমিত্রা কিছু বুঝতে না পেরে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রমণী আবার বলতে লাগলো, "বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে শোন বলি। আমার বাবার ইনি ছিলেন ছাত্র। সেই সূত্রেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা। আর ঘনিষ্ঠতার ফলে আমাদের একটি ছেলে হয়েছে। কিন্তু কি জানি কেন উনি আর আমায় আমল দিচ্ছেন না।"

"কেন?"

"বোধ হয় আমার পোড়া কপাল।"

সুমিত্রার কেমন যেন হেঁয়ালি বোধ হোতে লাগলো।

হঠাৎ রমণী জিগগেস করলো, "তোমার বাবা আছেন?"

সুমিত্রা যেতে পারলে যেন বাঁচে। কোন রকমে উত্তর দিলো "হ্যাঁ আছেন।"

"তিনি এলে পারতেন তোমাকে না পাঠিয়ে।" তারপর একটু থেমে: "এতো রাত্তিরে তোমার আসা উচিত হয়নি।"

এমন ভাবে রমণী ইঙ্গিতটি করলে যার অর্থ বুঝে নিতে সুমিত্রার বিলম্ব হোল না। অমরেশের সামনে দাঁড়িয়ে তারও মনে হচ্ছিল তার আসা উচিত হয়নি। কিন্তু আসা ছাড়া উপায় ছিল না যে।

মাথা নিচু কোরে সে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময়ে একটি ছোট্ট ছেলে ছুটে এসে মহিলাটিকে জড়িয়ে ধোরে শোবার বায়না করতে লাগলো। রমণী তার কপালে একটি চুমু খেয়ে বললে, "হেমাকে ডেকে নিয়ে আয় তো বাপি।" তারপর সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে, "আমার ছেলে।"

ছেলেটি আবার ছুটে গেল। খানিক পরেই সে হেমার কোলে চড়ে রমণীর সামনে এসে উপস্থিত হোল।

"আমায় ডাকছিলে দিদিমণি?" রমণীকে হেমা শুধোল।

"হ্যাঁ। একে একটু এগিয়ে দিয়ে এসো না হেমা।"

"কেন উনি কচি খুকী নাকি যে ঘাড়ে কোরে বোয়ে দিয়ে আসতে হবে? কই, এস।"

হেমা এগোল।

সুমিত্রাও সসংকোচে বিদায় নিয়ে তার পেছন পেছন চলতে লাগলো।

খানিক পরে দেখা গেল অমরেশ বেরিয়ে এসে একে ওকে ডেকে জিগগেস করছে কেউ তারা একটি সুন্দরী মেয়েকে একটু আগে চলে যেতে দেখেছে কিনা।

•

শৈবলিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশপাতাল ভাবছেন: রাজী হোলে হয়? না হোলে বেচারিদের কি দুর্গতিই যে হবে!

হঠাৎ সুমিত্রা এসে হাজির। কিন্তু তিনি এমন তন্ময় যে তাঁর লক্ষ্যই না।

"কি অতো ভাবছো ঠাকুমা? প্রার্থনা মঞ্জুর।" সুমিত্রা বললে।

"সত্যি?"

"সত্যি।"

"বাঃ, ধন্যি মেয়ে! আমি তো ভাবতেই পারিনি। বাপ মা শুনলে কত খুশীই না জানি হবে। চ তবে।"

আলোটা তুলে নিয়ে শৈবলিনী সুমিত্রার আগে আগে চলতে চলতে বললেন, "হ্যাঁ, কি বললেন জমিদার?"

"তার আগে বলো তুমি অত কি ভাবছিলে?"

শৈবলিনী খুব রসিকও বটে। বললেন, "ভাবছিলুম তোর জন্যে যদি একটা টুকটুকে বর—"

"যাও! নাতনীর জন্যে তো ঘুম ধরে না। বলে নিজে আবার একটা পেলে বর্তে যান!"

সুমিত্রার মনটা সত্যিই খুব খুশিতে ভরে উঠেছিল। এর আগে আর কখনও বোধ হয় এত খুশী সে হয়নি।

শৈবলিনীও ছাড়বার পাত্রী নন. "তা যাই বটে লো। কিন্তু বর যদি আসে আর আমাদের দুজনকে যদি দেখে তাহোলে তোকেই লুফে নিয়ে যাবে, আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না।"

সুমিত্রার কর্ণমূল রাঙা হোয়ে উঠলো। হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা ঠাকুমা, তোমার বর তোমায খুব ভালবাসতো, না?"

"বাসতো বৈকি দিদি।"

"তুমিও বাসতে?"

"কথা দেখ মেয়ের! আসুক আগে নাতজামাই, তখন বুঝবি।"

"কেন, আমি তো বলিনি যে আমি ভালবাসবো না!"

সুমিত্রার মুখে যেন খই ফুটছে। কিন্তু শৈবলিনীর মন পড়েছিল জমিদার কি বললেন শোনবার জন্যে। কাজেই তাড়াতাড়ি কথাটা ঘোরাবার জন্যে বললেন, "বাসবি বৈকি দিদি, বাসবি। এখন বল্‌তো যে জন্যে এলি তার কি হোল?"

"ও, এই আমার বরের জন্যে ভাবা হচ্ছিল? যাক গে, শোন তবে, কোরক হবে না।"

"আঃ, বাঁচা গেল। তবে কেন বাপু সকলে অত দোষ দেয় জমিদারকে?"

বৃদ্ধা পঞ্চমুখ হোয়ে যুবক জমিদারের প্রশংসা করতে লাগলেন। রায় বংশের অনেক ইতিহাসই তাঁর কণ্ঠস্থ। একটার পর একটা তিনি বোলে যেতে লাগলেন।

সুমিত্রা অবাক হোয়ে শুনতে লাগলো। রায়েদের ঐশ্বর্য ও গৌরবের কাহিনী তার সামান্যই জানা আছে। জানবার আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে যায়। প্রশ্নের পর সে প্রশ্ন করে।

অমরেশের বাবা নিখিলেশ রায়ের কথা উঠলো। সে কি পরাক্রম তাঁর! যেদিন সুন্দরবন থেকে সাতহাত বাঘটা মেরে আনলেন পঁচিশখানা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছিল দেখবার জন্যে। তবে তাঁর চরিত্র তেমন ভালো ছিল না।

অবশ্য ছেলের সম্বন্ধে এখনও কিছু শোনা যায়নি। তবে পুরুষমানুষকে বিশ্বাস নেই—বিশেষ বড়লোকদের, ওদের মতিগতিই আলাদা।

সুমিত্রার মনটা খুবই খুশী হোত যদি শৈবলিনী অমরেশ সম্পর্কে এই শেষ মন্তব্যটুকু না করতেন। সে ভাবতে লাগলো : অমন সুন্দর চেহারা যার সে খারাপ হোতে পারে? না, না। এই তো মুখ দিয়ে কথাটা বার করামাত্র কেমন রাজী হোয়ে গেলেন!

সুমিত্রার ইচ্ছে হোল এখনি বাড়ী বাড়ী ঘুরে সে সকলকে জানিয়ে দেয় তাদের নতুন জমিদারের মতো ভাল লোক আর হয় না। হঠাৎ একটা কথা তার মনে পড়ে। সত্যিই তো! ওটা অমরেশ কি খাচ্ছিল? কিন্তু কি সুন্দর ওকে দেখাচ্ছিল! সুমিত্রার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। পরক্ষণেই তাব মনে পড়লো সেই বমণীটির কথা। আচ্ছা, ওকে কেন—

হঠাৎ শৈবলিনীর প্রশ্নে সুমিত্রার চমক ভাঙে "কি লো, অমন চুপ হোয়ে গেলি কেন?"

"আমি কি তোমার মতো অতশত জানি ঠাকুমা যে বলবো? তুমি বরং এইবার আলোটা আমাব হাতে দাও। সেই থেকেই তো তুমি বইছ।"

সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে এসে শৈবলিনীব হাত থেকে আলোটা নিলো। তারপর চলতে লাগলো।

আকাশে কাস্তেব ফালির মতো চাঁদখানা। ফিকে জোৎস্নায় গাছপালা কেমন যেন ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছিল। আশপাশ থেকে ভেসে আসছিল ঝিঁঝির ডাক। তাই শুনে বোধ হয কালো মেঘটা যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

"উঃ!" শৈবলিনী ককিয়ে উঠলেন।

"কি হোল ঠাকুমা?"

পিছনে ফিরে সুমিত্রা দেখে শৈবলিনী বোসে পড়ে পা থেকে কাঁটা বার করছেন। তাড়াতাড়ি সে এগিয়ে এসে ক্ষতস্থানে হাত দিয়ে দেখতে লাগলো কাঁটাটা সম্পূর্ণ বেরিয়ে গেছে কিনা।

একটা ডোবার পাশে একটা চালার সামনে দাঁড়িয়ে দুজন লোক খড়ের গাদি লাগাচ্ছিল। একজন চেঁচিয়ে উঠলো, "কে গো?"

সুমিত্রা দুহাতে শৈবলিনীর পাদুটো চেপে ধোরে বললে, "আরেকটু বোস ঠাকুমা, ভালো কোরে একটু দলে দি। না হোলে টাটাবে।"

শৈবলিনী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "না দিদি, আর না। গরীবের তো আর শত্তুরের অভাব নেই। জানাজানি হোয়ে গেলে দেখবি কাল সকালে কমিটি বসে

গেছে, আর তোদের ঠানদি ছুটে এসে বলছে, শুনেছ গা? রমানাথের মেয়েটা কাল গিয়েছিল জমিদারের পায়ে ধরতে।"

লোকটি ওদিকে হেঁকেই চলেছে, "কে গো? নন্দর মা নাকি?"

"আ মর্! লোকটা চেঁচায় দেখ। গাঁ জড় করবে নাকি?" বলতে বলতে সুমিত্রার কাঁধে হাত রেখে শৈবলিনী চলতে শুরু করলেন।

"কত কষ্ট পেলে ঠাকুমা আমাদের জন্যে!"

"না লো না, দাঁড়াসনি, চলে চল্।"

লোকটা তখনও চেঁচাচ্ছে, "কে গো? বেগম বৌ। বলি কে গো? সরো পিসী?"

জানলা থেকে লণ্ঠনটা দেখতে পেয়ে সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। এতক্ষণ যে কি উদ্বেগের মধ্যে তাঁর কেটেছে তা বলবার নয়। উদ্‌গ্রীব হোয়ে তিনি বেল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ওদিকে শৈবলিনীর বাড়ীর কাছ বরাবর এসে সুমিত্রা শৈবলিনীকে বললে, "আর আসতে হবে না ঠাকুমা, এবার তুমি যাও। অনেকটা রাত হয়ে গেছে।"

"যেতে পারবি তো? ভয় করবে না?"

"না। ঐ যে দেখতে পাচ্ছ না মা দাঁড়িয়ে?"

বলতে বলতে তারা আরও কয়েক পা এগিয়ে আসে।

সাবিত্রীকে লক্ষ্য কোরে একটু উঁচু গলায় শৈবলিনী বললেন, "হয়েছে গো, কাজ হয়েছে। মেয়ের কাছে সব শুনখোন। আমি বরং এখন চলি। আর হাঁটতে পারছি না।"

তাঁর পাটায় সত্যিই খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল।

"হ্যাঁ মাসীমা, এস। কত কষ্টই না জানি দিলুম।"

"ম'লে বাপু নাম কোর।" হাসতে হাসতে শৈবলিনী বললেন।

"তুমি ম'লে আর আমাদের এমন কোরে কে দেখবে মাসীমা?"

"ভগবান আছেন বৌ, তিনিই দেখবেন।"

"লণ্ঠনটা ঠাকুমা," বলতে বলতে সুমিত্রা এগিয়ে গিয়ে আলোটা তাঁর হাতে দিলো।

শৈবলিনী চলে গেলেন।

সুমিত্রা মার কাছে এগিয়ে এল।

"কি বললেন মা জমিদার?" সাবিত্রীর গলা কেঁপে ওঠে।

"কোরোক হবে না।"

"হবে না? আঃ, নারায়ণ!"

আবেগে, উত্তেজনায় সাবিত্রী মেয়ের কাঁধে মাথা রেখে ছোট্ট মেয়ের মতো ফোঁপাতে লাগলেন।

পরদিন প্রভাতে রোদ্দুর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গাছের ডগাগুলো চক্‌চক্‌ করছে। কয়েকটা বক আকাশের কোল ঘেঁষে উড়ে যাচ্ছে।

"রমানাথ ভট্‌চায্যির বাড়ী এই?" পেয়দা প্রশ্ন করলো।

সব্জীর ঝাঁকা মাথায় কোরে হাটের পথে যেতে যেতে চাষীটি দাঁড়িয়ে পড়লো। রাখাল যাচ্ছিল গরু নিয়ে। সেও দাঁড়িয়ে পড়লো মুখে আঙুল দিয়ে।

সাবিত্রী গিয়েছিলেন ঘাটে। গোলমাল শুনে হাতের আধমাজা বাটিটা সুদ্ধ উঠে এসে দেখেন তাঁর বাড়ির সামনে একখানা গোরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আর তার পাশে বেল্ট-পরা গাঁট্টাগোট্টা একজন লোক। লোকটা একখানা কাগজ থেকে একবার কোরে কি পড়ছে আর একবার কোরে সকলের মুখের দিকে চাইছে। তার বাঁদিকে আরও একজন চশমাপরা বেঁটে লোক। সে লোকটিকে সাবিত্রী এর আগে অনেকবার দেখেছেন—জমিদার বাড়ীর গোমস্তা। সে সেই বেল্ট-পরা লোকটিকে মাঝে মাঝে কি বলছে আর তাঁদের বাড়ীখানা আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখাচ্ছে।

ভয়ে সাবিত্রীর প্রাণ উড়ে গেল। বাটিটা তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। ঊর্ধ্ব-শ্বাসে বাড়ীর ভেতর ছুটে এসে তিনি আহ্নিকরত স্বামীকে বললেন, "ওগো কি হবে? ওরা যে কোরোক করতে এসেছে। শীগগির বেরিয়ে গিয়ে দেখ গে।"

কাঁপতে কাঁপতে তিনি উঠোনে বসে পড়লেন।

রমানাথ অবাক হোয়ে গেলেন। অবাক হবারই তো কথা। আগের রাত্রে তিনি শুনলেন মেয়েকে জমিদার বলেছেন ক্রোক হবে না, সেই শুনে তাঁর বুক থেকে দুশ্চিন্তার পাথরখানা সবে গিয়েছিল, কন্যার মাথায় হাত রেখে তিনি তাকে আশীর্বাদও করেছিলেন, জমিদারেরও সুখ্যাতি করেছিলেন। তারপর আজ সকালে উঠে কোশাকুশি নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পুজোয় বসেছেন। কিন্তু এ কি শুনছেন এখন! সাবিত্রী এ কি বলছে? চমকে উঠে তিনি বোলে উঠলেন, "সে কি! সে কি!"

তাঁর হাত লেগে কোশাটা উল্টে গেল, কুশাসনটাও গেল ভিজে।

"কি জানি গো! উঠে গিয়ে দেখ গে।"

কাঁপতে কাঁপতে রমানাথ বেরিয়ে গেলেন।

সুমিত্রার ঘরের দরজা তখনো বন্ধ। তখনো তার ঘুম ভাঙেনি। সে স্বপ্ন দেখছে · তাদের ঘরে আর অভাব নেই, লোকজনে বাড়ী গম্‌গম্‌ করছে, শৈব ঠাকুমা তার মাকে বলছে, দেখছো বৌ, মেয়ে হোতেই তোমার দুঃখ দূর হোল।

হঠাৎ এমন সময়ে দরজায় ঘা পড়লো। তার ঘুম গেল ভেঙে। খিল খুলে বেরিয়ে এসে সে দেখে সামনে মা দাঁড়িয়ে, মা কাঁদতে কাঁদতে বলছে: "ওরে মিত্রা, তুই যে বললি ওরা আর কোরোক করতে আসবে না, কিন্তু একি হোল মা?"

সুমিত্রা কিছুই বুঝতে পারে না। কাল রাত্রের ঘটনা, সকাল বেলাকার এই স্বপ্ন, মার এই করুণ মূর্তি, সব মিলে তার কাছে এ যে এক দুর্বোধ্য হেঁয়ালি। সে চোখ মুছতে মুছতে মার দিকে চেয়ে থাকে নির্বাক বিস্ময়ে। বেশ কয়েক মুহূর্ত লাগলো অবস্থাটা তার হৃদয়ঙ্গম করতে।

"কোরক করতে এসেছে? সে কি!" অস্ফুট স্বর তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

"ঐ শোন্ না বাইরে কি রকম হৈচৈ হচ্ছে!"

সাবিত্রী ফোঁপাতে লাগলেন।

"সে কি! জমিদার যে কথা দিলেন!"

"কি কথা দিলে মা বুঝি না। যার বাপ সত্যি বললে তাড়িয়ে দেয় সে কখনো গরীবের দুঃখ বুঝতে পারে? এখন কি করি? হা নারায়ণ!"

দরজার ধারে বোসে পড়ে সাবিত্রী ফোঁপাতে লাগলেন।

ভিড় ক্রমশই বাড়তে লাগলো। প্রতিবেশীরা ছুটে এল—রাধু চক্রবর্তী, নিতাই মোড়ল, হরি পোদ্দার, তিনু ঘোষাল, ঠানদি, রাধু চক্রবর্তীর মা শৈবলিনী, আরও কত স্ত্রী পুরুষ ছেলে মেয়ে।

পেয়াদা রমানাথের দিকে চেয়ে গোঁফে মোচড় দিতে দিতে বললে, "তাওলে আম্‌নার অস্তাওর সম্পত্তি কোরোক হোল।"

রমানাথ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ এক প্রৌঢ়া ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে এলেন। সকলে অবাক হোয়ে দেখে—শৈবলিনী। জনতা চঞ্চল হয়ে উঠলো।

পেয়াদার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে শৈবলিনী বললেন, "বাবা, বুড়ীর একটা কথা শুনবে? বোধ হয় জমিদার চান না যে তোমরা কোরোক কর।"

পেয়াদা গরম হোয়ে ওঠে: "শোন কথা! জমিদার না চাইলে আমরা এসতে পারি? পারি কোরোক করতে? জমিদার নালিশ করেছেল, আদালত তাই ডিগ্‌রি দিয়েচে।"

শৈবলিনী মাথা হেঁট কোরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আশপাশে গুঞ্জন উঠলো।

তিনু ঘোষাল বোলে উঠলেন, "যাও না রমানাথ, মেয়ে বৌকে সরিয়ে নাও না, ওদের কাজ তো ভাই ওরা করবেই।"

রমানাথ তবু নিশ্চল।

সুমিত্রাও বেরিয়ে এসেছিল। আর সে থাকতে পারলো না, উচ্ছ্বসিত চোখদুটি মুছতে মুছতে ভেতরে চলে গেল।

লোকজন নিয়ে পেয়াদা এবার বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো।

কাজ শুরু হোল: যা যেখানে ছিল টেনে টেনে তারা বার করতে লাগলো। ঘটি, বাটি, হাঁড়ি, বেড়ি, ধুচুনি, চুবড়ি, মাদুর, লণ্ঠন, কিচ্ছু বাদ দিল না; সমস্ত

বয়ে এনে বাইরে সেই বেল গাছটার নীচে জড় করতে লাগলো। গোরুটাকে বেঁধে দেওয়া হোল গাছের গুঁড়িটাতে। জন্তুটা সমানে চিৎকার করতে লাগলো। তারপর দুজন লোক দুখানা তক্তপোষ ধরাধরি কোরে বাইরে নিয়ে এল। টানাটানিতে দুটো পায়া ভেঙে গেল। তারা ভ্রূক্ষেপও করলো না। একজন ট্রাঙ্কদুটো এমনিভাবে ছুঁড়ে দিলো যে ডালাদুটো ছেড়ে পড়লো। নফর কুণ্ডুর দোকান থেকে ধারে কিনে আনা সেই চালগুলোর সামান্যই গত রাত্রে খরচ হয়েছিল, বাকীটা সাবিত্রী ঝেড়েঝুড়ে একটা কাপড়ে বেঁধে ঘরের এক পাশে রেখে দিয়েছিলেন। একজন কাপড়টা খুলে চালগুলো ছড়িয়ে দিলো। শৈবলিনীর দেওয়া কলাদুটো তোলা ছিল একটা তক্তায়। একজন করলো কি কলাদুটো দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে খেতে লাগলো।

উঠোনের একপাশে মা ও মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো আর কাঁদতে লাগলো।

হঠাৎ বাইরে কলরব শোনা গেল : "জমিদার আসছেন! জমিদার আসছেন!"

একটা আকস্মিক চঞ্চলতা সকলের চোখেমুখে ফুটে উঠলো। অনেকগুলি ঠোঁট একসঙ্গে নড়ে উঠলো : "জমিদার! কেন?"

নিমেষের মধ্যেই জমিদার এসে উপস্থিত হলেন। পুরুষরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। স্ত্রীলোকেরা ক্ষিপ্র হাতে যে যার মাথার ঘোমটা টেনে দিলো। একটি খুব ঢেঙামত মেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো একটা ছোট্ট মেয়ের আঁচল ধোরে, "মর্ ছুঁড়ি! সরে আয় না। গাড়ীর তলায় পড়বি?"

সাহেবী পোশাকে সজ্জিত তরুণ জমিদার গম্ভীরভাবে মোটর থেকে নামলেন।

নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে ভেবে গোমস্তা, পেয়াদা ও তাদের লোকজন সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো। গোমস্তা সহজে জমিদারের সামনে আসতে সাহস পায় না; তায় আবার আগের দিন হিসেবের কি একটা গরমিল হয়েছিল বোলে তারই চোখের ওপর দুজন গোমস্তার জবাব হয়েছে সে দেখেছে। সভয়ে এগিয়ে এসে সে বললে, "আপনি এলেন যে হুজুর? কোন আদেশ আছে?"

বুকপকেট থেকে রুমালটা বার কোরে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে অমরেশ বললে, "পেয়দা কোথায়? ডাকো তাকে।"

সকলে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ কোরে শুনছিল। এইবার তাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো বেল্ট-পরা পেয়াদার ওপর।

পেয়াদা কাছেই ছিল। জমিদারের কথা শেষ না হোতেই সে ছুটে এসে হাত জোড় কোরে দাঁড়ালো।

অমরেশ প্রশ্ন করলো, "তুমি পেয়দা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"শোন। ক্রোক করার আর প্রয়োজন হবে না। তোমার কাগজখানা দাও আমি সই কোরে দিচ্ছি।"

"যে আজ্ঞে।"

"এই সব জিনিস বুঝি বার করা হয়েছে?" গাছের তলায় ইতস্তত ছড়ানো জিনিসগুলোর দিকে চেয়ে অমরেশ প্রশ্ন করলো।

"এজ্ঞে।"

"যাও, যা যেখান থেকে বার করেছ সমস্ত সেখানে রেখে তোমরা চলে যাও।"

স্তব্ধ জনতা নড়ে উঠলো। পেয়াদা ও গোমস্তা আদেশ পালনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

নিতাই মোড়ল চিৎকার কোরে উঠলো, "এই তোরা ওদিকে অমন দাঁড়িয়ে রইছিস কেন? শুনতে পেলি না?"

তারপর ছুটে গিয়ে জিনিসপত্রের মধ্যে থেকে একটা হাতপাখা তুলে এনে অমরেশকে হাওয়া করতে লাগলো।

অমরেশ রুমালটা পকেটের মধ্যে রাখতে রাখতে এগিয়ে গেল। সকলে পথ ছেড়ে দিলে।

"এমন জমিদারের রাজ্যিতে কি চোখের জলটি ফেলবার যো আছে? আহা, যেন সাক্ষাৎ দেব্‌তা!" ঘোমটার আড়াল থেকে ঠানদি বললেন, এমন ভাবে যাতে জমিদারের কানে যায়।

অমরেশ কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না কোরে জিগগেস করলো, "ভটচায্যি মশাই কই?"

অনেকগুলি লোক একসঙ্গে বোলে উঠলো, "ঐ যে! ঐ যে!"

নিতাই মোড়ল চিৎকার কোরে উঠলো, "রমানাথদা করছো কি? শীগগির হ্যাথায় এসো।"

রমানাথ এগিয়ে এলেন। তাঁর চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু।

নমস্কার কোরে অমরেশ বললে, "আপনার কোন ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

বৃদ্ধের চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, "নারায়ণ তোমায় দীর্ঘজীবী করুন বাবা।"

"আপনার বাড়ীর আর সব লোকজন কোথায়?" অমরেশ শুধোল।

"ভেতরে আছে বাবা। তারা আর কোন্‌ লজ্জায় বাইরে আসবে?"

"চলুন, ভেতরেই যাই।"

"গরীবের বাড়ী পায়ের ধুলো দেবে বাবা? চল বাবা, চল।"

বৃদ্ধের পেছন পেছন অমরেশ এগোল।

দরজার ভেতরে পা দিয়েই রমানাথ হাঁকলেন, "মিত্রারে, জমিদার এসেছেন, শীগগির আয়।"

সুমিত্রার কানে কিন্তু কথাটা গেল না। সাবিত্রীই ছুটে এলেন চোখের জল মুছতে মুছতে।

লোকজন এদিকে বাইরে থেকে জিনিসপত্র ঘরে বই করতে শুরু কোরে দিয়েছে। প্রতিবেশীরা কিছু বাইরে, কিছু ভেতরে। তাদের মধ্যে ঠানদি-তিনু ঘোষালের দলও আছে। অনেকে আবার গাছতলায় দাঁড়িয়ে জোট পাকাতে লাগলো।

"এস বাবা এস, ব্রাহ্মণের মান রাখলে! নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন।" ঘোমটাটা টানতে টানতে সাবিত্রী বললেন।

অমরেশ চারদিক চাইতে লাগলো।

সাবিত্রী আস্তে আস্তে স্বামীকে বললেন, "তোমার কুশাসনটা কোথা গেল? তাড়াতাড়ি একটু দেখে শুনে এনে দাও না। কিসে বসতে দোব?"

রমানাথ এধার ওধার খুঁজতে লাগলেন। একজন শুনতে পেয়ে ছুটে গিয়ে এনে দিলো। সাবিত্রী তাড়াতাড়ি দাওয়ায় উঠে গিয়ে আসনখানা পেতে দিলেন।

তাঁকে ছোটাছুটি করতে দেখে অমরেশ বললে, "আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মা? আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না।"

"সে কি হয় বাবা? এস, বোস। মিত্রা! মিত্রা! এগিয়ে আয় মা, প্রণাম কর্।"

সুমিত্রা প্রণাম কোরে উঠে দাঁড়ালো।

অমরেশের বুকের ভেতরটা দুলে উঠলো। এই কি সেই!

খানিকটা রোদ্দুর এসে পড়েছে সুমিত্রার গায়ে। তার চুলগুলো উস্কোখুস্কো। অশ্রুভরা চোখদুটি চক্‌চক্ করছে। মুখখানা যেন সদ্যফোটা পদ্ম।

বিস্মিত দৃষ্টিতে অমরেশ তাকে দেখতে থাকে।

এমন সময়ে বাইরে থেকে দুজন লোক একখানা তক্তপোষ আনতে আনতে তাদের সামনে একেবারে হুড়মুড়িয়ে পড়লো। অমরেশ ধাক্কা দিয়ে সুমিত্রাকে ঠেলে দিলো। না হোলে তার খুব চোট লাগতো।

লোকগুলি তাড়াতাড়ি নিজেদের সামলে নিয়ে তক্তপোষখানা একপাশে রাখলে।

"পাজীগুলো! চোখের মাথা খেয়েছিস?" বলতে বলতে অমরেশ সুমিত্রাকে তোলবার জন্যে এগিয়ে গেল।

সুমিত্রার পায়ে লেগেছিল। সে বসে পড়েছিল।

অমরেশ আস্তে আস্তে তার পাটা ডলে দিতে লাগলো।

"আপনি গুরুজন, পায়ে হাত দেবেন না।" সুমিত্রা বলে।

সাবিত্রীও এগিয়ে এলেন ঃ "থাক্ বাবা, থাক্। আমরা তোমার প্রজা, তুমি আমাদের মাথার মণি। তুমি পায়ে—"

"তাতে কি হয়েছে মা? আমি যদি পড়তুম, আপনারা কি কিছু করতেন না?"

"একশোবার করতুম বাবা, হাজার বার করতুম। নারায়ণ বাঁচিয়েছেন, তাই তোমার কিছু হয়নি।"

অপরাধীর মতো লোকগুলি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে তক্তপোষখানা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।

"এইবার মনে হয় ঠিক হয়েছে। ওঠতো দেখি।" অমরেশ বলে।

সুমিত্রা আস্তে আস্তে উঠে প্রথমে তার পায়ে হাত দেওয়ার জন্যে অমরেশের পায়ের ধুলো নিলো. তারপর বাইরের দিকে চাইতেই দেখলো সব চোখ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে। তার লজ্জা করতে লাগলো। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে তক্তপোষের ওপর বসে পড়লো।

"চলো বাবা, তুমিও ঘরে চলো। এখানে বসতে হয়তো অসুবিধে হচ্ছে।" সাবিত্রী বললেন।

দুজনেই ঘরে গেলেন।

দীনহীন ঘবখানির চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে অমবেশ বসতে যাবে এমন সময় সুমিত্রা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আঁচল দিয়ে তক্তপোষের খানিকটা মুছে দিয়ে বললে "এইবার বসুন।"

অমরেশ বসলো।

রমানাথ দেখা দিলেন ঃ "বসেছ বাবা? বোস। গল্প করো। আমি ততক্ষণ এদের একটু দেখিয়ে দি, না হোলে বড্ড সব এলোমেলো কোরে রাখছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি দেখুন। আমার জন্যে ভাববেন না।"

"আচ্ছা বাবা, আচ্ছা।"

রমানাথ চলে গেলেন।

অমরেশ সাবিত্রীর দিকে চেয়ে বললে, "একটু জল খাওয়াবেন মা?"

"জল? এক্ষুনি আনছি বাবা।"

"আমি আনছি মা, তুমি বোস।" দাঁড়িয়ে উঠে সুমিত্রা বললে।

"না, না, তোর পায়ে লেগেছে। আমি যাচ্ছি।" বলতে বলতে সাবিত্রী বেরিয়ে গেলেন।

অমরেশ ডাকলো "মিত্রা!"

সুমিত্রা নীরব।

"তুমি খুশী হয়েছ তো?"

"হ্যাঁ।"

সুমিত্রার মুখ লাল হোয়ে ওঠে। তার বুকের প্রত্যেক ওঠাপড়াটি কাপড়ের ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে। নির্নিমেষ নযনে অমরেশ তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

"মিত্রা!" অমরেশ আবার ডাকে।

সুমিত্রার নিশ্বাস আগুনের মত গরম হয়ে উঠেছে।

"আমার নাম মিত্রা নয়, সুমিত্রা।" কম্পিত কণ্ঠে সে বললে।

"এইমাত্র যে শুনলুম তোমার মা-বাবা তোমায় মিত্রা বোলে ডাকলেন!"

"ওঁরা আমায় ঐ বোলে ডাকেন—আমার নাম কিন্তু সুমিত্রা।"

"কেন, ওঁদের মতো আমিও কি ডাকতে পারি না মিত্রা বোলে?"

সুমিত্রার মাথার মধ্যে কেমন যেন করতে লাগলো। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। বিশ্বের যত লজ্জা এসে যেন তার উপর ভর করেছে। সে চুপ কোরে রইলো।

"মিত্রা!" আবার অমরেশ ডাকলো।

"বলুন!" মাথাটি নীচু কোরে সুমিত্রা জবাব দিলো।

"তোমার আমায় আর কিছু বলবার আছে?"

"না।"

"আর কিচ্ছু না?"

"না।"

"কিচ্ছু না?"

"না।"

ওদের কথোপকথন শুনতে শুনতে সাবিত্রী জল নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন।

এক চুমুকে সমস্ত জলটা নিঃশেষ কোবে অমরেশ গেলাসটা তার দিকে এগিয়ে দিলো। অগত্যা সে হাতটি বাড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখদুটিও অমরেশের জ্বলজ্বলে চোখের ওপর পড়লা। লজ্জায় সে দৃষ্টি নামিয়ে নিলো।

তার ব্রীডানত মুখখানিব দিকে আব একবার চেয়ে অমরেশ বললে "তা হোলে উঠি?"

মা সামনে দাঁড়িয়ে। সে কি বলবে? তাব মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

"চল্লুম তাহোলে। চল্লুম মা।" বলাব সঙ্গেসঙ্গেই বুমাল দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে অমবেশ বেরিয়ে গেল।

শশব্যস্ত ভাবে সকলে দবজা ছেড়ে দিলো। অমবেশ এক লাফে একেবারে গাড়ীর ভেতরে গিয়ে বসলো। মুহূর্তেব মধ্যে গাড়ী চোখের বাইবে চলে গেল।

জিনিসপত্র তুলে দিযে অনেকক্ষণ হোল জমিদারের লোকজন চলে গেছে। মধ্যে একবার চারদিক অন্ধকার কোরে এক পশলা বৃষ্টি হোয়ে গেল। উঠোনে বেশ জল জমেছে।

ডেওঢাকনা গুছোতে গুছোতে সাবিত্রী বললেন, "অত কোরে যখন বললে মা, ওঁকে চাকরীটা আবার দেবাব জন্যে যদি একবারটি মুখ ফুটে বলতিস, হয়তো ও রাজী হোয়ে যেত। কি উদার মন!"

সুমিত্রা জবাব দিল না। নীরবে ঝাঁটাগাছটা দিয়ে উঠোনের জলটা বার কোরে দিতে লাগলো।

রমানাথ বললেন, "কেন মা তা হোলে বল্লি না?"

সুমিত্রা তবু জবাব দিলো না। আপন মনেই কাজ কোরে যেতে লাগলো।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে রমানাথ আবার বল্লেন "আহা, একবার যদি বলতিস মা?"

সায় দিয়ে সাবিত্রী বল্লেন "আমি বলছি ও কক্ষনো 'না' করতো না। "

তবু কিন্তু সুমিত্রা নিরুত্তর। অগত্যা দুজনেই নীরব হোয়ে গেলেন।

বেশীক্ষণ কিন্তু চুপ থাকা রমানাথের পক্ষে সম্ভব হোল না। অনেক কথাই তাঁর মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। তিনি বলতে লাগলেন "ক্লোকটা যেমন বন্ধ হোল সেই রকম যদি—"

সুমিত্রাও যে তা না ভাবছে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে বাবামার যে কথা এখন মনে হচ্ছে তার সে কথা সে সময়েই মনে হয়েছিল। কিন্তু তবু সে বলতে পারেনি। কেন? অমরেশ কি মনে করবে? মনে করবে তারা হ্যাংলা। তারা গরীব হোতে পারে কিন্তু হ্যাংলা নয়। অভাব আছে বোলে কি আত্মসম্মান থাকবে না?

তবু পিতামাতার কথার প্রতিবাদ না কোরে সে আপন মনে ঝাঁট দিতে লাগলো।

উঠোনের কাজ শেষ হোলে সে ঢুকলো গোয়ালঘরে। গোয়ালঘরের চালাটার আধখানা নেই। ফলে গরুটা জলে নেয়ে গিয়েছিল। আঁচল দিয়ে সে তার গাটা ভাল কোরে মুছিয়ে দিল। এইবার চালার ভেতর থেকে খড়ের শেষ আঁটিটা পেড়ে আধখানা কুঁচিয়ে দিলে তাকে খেতে।

গোরুটা এক নিমিষে সব নিঃশেষ কোরে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার চাহনিতে অতৃপ্ত ক্ষুধা। সুমিত্রার চোখ জল ভরে উঠলো। কিন্তু তবু আঁটিটার বাকী আধখানা তুলে রাখতেই হয়, ভবিষ্যতের জন্যে।

গোরুর গলার ওপর মুখখানা রেখে সে খানিকক্ষণ বোসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে উঠলো। এগোল তুলসীগাছটার দিকে। বৃষ্টির ঝাটে নুয়ে পড়া গাছটা একটা কাঠি দিয়ে সোজা কোরে দিয়ে গেল সে পুকুরে স্নান করতে।

রমানাথ গুম হয়ে বোসে রইলেন।

স্নান সেরে এসে সুমিত্রা রান্নাঘরে ঢুকলো, ভাতের হাঁড়িটা উনুনে বসিয়ে দিল।

ওদিকে সাবিত্রী অবিন্যস্ত জিনিসগুলি সাজিয়ে সাজিয়ে রাখছিলেন আর সকালের সেই ঘটনাটি নিয়ে নানা কথা ভাবছিলেন। কাজ শেষ হোলে তিনি দাওয়ায় বেরিয়ে এলেন, তারপর পুরোন ছেঁড়া মাদুরটা পেতে তার ওপর পা ছড়িয়ে বোসে শুরু করলেন পিদিমের সলতে পাকাতে। এক সময়ে স্বামীকে ডেকে বললেন, "যাওনা, চানটা করে এস না। বেলা যে অনেক হোল!"

রমানাথ হাঁহুঁ কিছু না বোলে একটু নড়ে বসলেন মাত্র।

"শুনচো? শুধু বোসে বোসে ভেবে আর কি হবে বলো? যা হবার হবে, এখন ওঠ।" সাবিত্রী আবার বললেন।

সুমিত্রা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে কপাটের কাছে বাঁশের খুঁটিটা ধোরে দাঁড়ালো। পিতার প্রতি সমবেদনায় তার চোখদুটি অশ্রুসিক্ত হোয়ে উঠলো।

হঠাৎ বাইরে দরজায় আঘাত পড়লো।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

"বাপ বাড়ী আছে গা?" আগন্তুক প্রশ্ন করলো।

গলা পেয়ে রমানাথ দাঁড়িয়ে উঠলেন ঃ "কে মহেশ?"

আগন্তুক হাতের ছাতাটার ওপর ভর দিয়ে পা টিপে টিপে রমানাথের সামনে এসে দাঁড়ালো।

উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে রমানাথ বললেন, "দীনু রাজী হোল মহেশ?"

"না দাদা। বল্লে ও বুড়ো মানুষ। হিসেবপত্তর কি ঠিক রাখতে পারবে? আমাব সোনারূপোর কাজ, একটু ভুলচুক হোলেই সব মাটি হোয়ে যাবে।"

"আর টাকাটার কথা?"

"হ্যাঁ তাও বলেছিলুম। বল্লে ও তো শোধ কবতে পারবে না। তাছাড়া এখন টাকাই বা কোথায়? এই সেদিন ছেলের বিযে দিলুম, তাতে অনেকগুলো টাকা ব্যয় হয়ে গেল।"

হঠাৎ চিড়বিড় কোরে আবার বৃষ্টি নেমে এল। মহেশ তাড়াতাড়ি ছাতাটা খুলে মাথায় ধরলো।

রমানাথ বল্লেন "উঠে এস মহেশ দাওয়ার ওপব। বৃষ্টি থামলে যেও।"

"না দাদা, দাঁড়ালে চলবে না। বৌটার বড্ড ব্যামো একবার কব্‌রেজের বাড়ী যেতে হবে। হ্যাঁ, শুনলুম নাকি জমিদাব নিজে এসে ক্রোক বন্ধ কোরে গেছেন? খুব ভালো হয়েছে। আচ্ছা একসময়ে সব শুনবখন। এখন চল্লুম। তাইতো, এভাবে যে তুমি কদ্দিন চালাবে?"

মহেশ চলে গেল।

রমানাথের ঠোঁটদুটি থেকে শুধু বেবিযে এলো "হা নারায়ণ!"

বৃষ্টি আসায় সুমিত্রা দাওয়ার ওপব উঠে মার পাশে বোসে পড়েছিল।

সাবিত্রী বললেন "দেখলি মা! এ যেন আমাদের ওপর নারায়ণের অভিশাপ!"

সুমিত্রা আর থাকতে পারলো না। মার কাঁধেব ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে সাবিত্রী পুনরায় স্বামীকে স্নান করবার কথা মনে করিয়ে দিলেন। রমানাথ তবু নিশ্চল।

সুমিত্রা পিতার পাশে এসে দাঁড়ালো।

"বাবা!" সে ডাকলো।

"কি মা?"

"আমার ওপর রাগ করেছ বাবা?"

"না মা। তুমি অত বড় কাজটা করলে, তোমার ওপর কখনো রাগ করতে পারি?"

"তবে ওঠ, নেয়ে এস।"

রমানাথ যেন আর শুনতে পেলেন না। চুপ কোরে বোসে রইলেন।

সুমিত্রা আবার ডাকলো "বাবা!"

রমানাথ তেমনি নীরব। অন্ধকার অথৈ জলে মাঝি যেমন হাঁকপাঁক করতে থাকে তাঁর অবস্থাও যেন ঠিক সেই রকম। ক্ষুধা তৃষ্ণা কোথায় উবে গেছে, নড়ে বসবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত।

সুমিত্রা আর সাহস করলোনা তাঁকে বিরক্ত করতে। বরং একলা থাকতে দেওয়াই ভালো ভেবে সে আস্তে আস্তে সরে গেল। মার মুখের দিকে একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল। মা নিরুত্তর। অগত্যা রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ কোরে সে গেল নিজের ঘরে, ভাঙ্গা তক্তপোষটার ওপর আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো।

শুয়ে শুয়ে সে আকাশ-পাতাল ভাবে। এর কি কোন প্রতিকার নেই? নিত্যই শুধু চোখের জল আর হাহুতাশ। ভাবতে ভাবতে সুমিত্রার মাথা গরম হয়ে ওঠে।

এদিকে খিদেয় পেটের নাড়ীতে পাক দিচ্ছে। আস্তে আস্তে সে তক্তপোষ থেকে নেমে আরেকবার বাইরে উঁকি মেরে দেখলো। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বাপ-মাও তেমনি বোসে। গোরুটা মাঝে মাঝে পা ছুঁড়ছে।

কলসী থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে নিয়ে সুমিত্রা খেলো। গেলাসটা রেখে যেমন উঠতে যাবে মাথা ঘুরে গেল। সে পড়ে গেল। আবার উঠলো। হাত দিয়ে কাপড়টা ঝেড়ে আবার শুয়ে পড়লো।

হঠাৎ গেলাসটার দিকে চোখ পড়তেই তার কানদুটো রাঙা হোয়ে উঠলো। ঐ গেলাসে কোরেই না অমরেশ জল খেয়েছিলো!

তার চিন্তার মোড় ঘুরে গেল। মনের পরদার ওপর ফুটে উঠলো এক স্বপ্নময় ছবি। তার মনে হোল সে যেন অমরেশের স্পর্শ অনুভব করছে। এক অনাস্বাদিত তৃপ্তি সেই স্পর্শের মধ্যে।

সে জাল বুনে চলেছে ঃ আচ্ছা, কেন উনি ও কথা বললেন 'ওঁদের মতো আমিও কি ডাকতে পারি না মিত্রা বোলে?' কিইবা এসে যাবে তাঁর এতে? উনি হলেন জমিদার, কত রাজরাজড়ার মেয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা কোরে বোসে আছে, আর সে? তাঁরই এক নগণ্য প্রজার মেয়ে—দুবেলা খাওয়াই যাদের জোটে না!

সুমিত্রার কান রাঙা হোয়ে ওঠে। নাঃ সে এ কি ভাবছে?

জানলার ভিতর দিয়ে আঁকা বাঁকা পথটার দিকে সে চায়। কয়েক ঘণ্টা আগে এই পথ দিয়েই অমরেশ মোটর হাঁকিয়ে গেছে।

হঠাৎ শৈবলিনীর কণ্ঠস্বরে তার ধ্যান ভাঙে।

"কি হচ্ছে লো?"

সে ধড়মড়িয়ে ওঠে ঃ "এসো ঠাকুমা, এসো।"

শৈবলিনী তখন ঘটনাস্থলে পেয়াদার কাছে ধমক খাবার পরও ছিলেন। তারপর যখন দেখলেন জমিদার নিজে এসে ক্রোক করতে নিষেধ করছেন তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বাড়ী চলে গেলেন।

ছেলে ও নাতীরা তারপব বাড়ী ফিরে এসে কাজকর্ম সেরে খেতে খেতে ব্যাপারটা নিয়ে কত কি গল্প করতে লাগলো। পরিবেষণ করতে কবতে বৌও যোগ দিলো। জমিদারের কথা, বমানাথের কথা, রমানাথের মেয়ের কথা, সবই হোতে লাগলো। শৈবলিনী কিন্তু হাঁও দিলেন না, হুঁও দিলেন না, শুধু নীরবে শুনে যেতে লাগলেন।

বাধু চক্রবর্তী বললেন, "এ রকম কখনো কেউ শুনেছো? জমিদাব এসে গরীব প্রজার মেয়েব পায়ে ধবে! অথচ ওরই জন্যে ওদেব আদ্দেক জমিদারি চলে গেছে। কে জানে বাবা এর মধ্যে কি রহস্য আছে?"

শৈবলিনী অবাক হয়ে গেলেন। পায়ে ধরেছে! ছেলেব কথা তাঁর বিশ্বাস হোল না। দাওযায় ওদের আলোচনা চলেছে এমন সময়ে আবাব জোরে বৃষ্টি এল। শৈবলিনী অপেক্ষা কবতে লাগলেন কখন বৃষ্টি থামে, থামলে সাবিত্রী ও সুমিত্রার নিজেব মুখ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা শুনে আসবেন।

তাবপর ঝাড়া দুঘণ্টা লাগলো বৃষ্টি থামতে। শৈবলিনী আর দাঁড়ালেন না, জল ছপ্ ছপ্ কবতে করতে একেবাবে বমানাথের বাড়ী এসে হাজির। এসে কিন্তু দেখেন আনন্দের বদলে বিষাদেব ছায়া! রমানাথ দাওযাব খোঁটায় হেলান দিয়ে আকাশেব দিকে চেয়ে বোসে আর সাবিত্রী একটু দূবে একটা মাদুবের ওপর ছোট্ট মেযেটিব মতো ঘুমোচ্ছে। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে তিনি সুমিত্রার ঘরে ঢুকলেন।

"ওমা মেয়ের ছিবি হয়েচে দেখ! চোখমুখ যে কপালে বসে গেছে! কেন লো? খাস্ নি নাকি?"

মুচকি হেসে সুমিত্রা উত্তর দিলো "না।"

"কেন? তবে যে আমি জানলা থেকে দেখলুম তুই ঘাট থেকে চাল ধুয়ে নিয়ে এলি? রাঁধিস নি?"

"হ্যাঁ বেঁধেছিলুম।"

"তবে?"

"বিধি মাপায় নি।"

সুমিত্রা তেমনি মুচকে মুচকে হাসতে লাগলো।

শৈবলিনী চটে গেলেন ঃ "ন্যাকামি বাখ্। কেন খাস্ নি বল্।"

"ঐ যে বল্লুম বিধি মাপায় নি।"

"মাবাবাও খায় নি?"

"না।"

শৈবলিনী এবার আরও চটে উঠলেন ঃ "ভাল মেয়ের নিকুচি করেছে! তবু বলবে না কেন? চল্লুম তবে আমি।"

হন্‌হন্‌ করে শৈবলিনী চলে গেলেন। যা শুনতে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা, তা আর তাঁর শোনা হোল না।

রমানাথ ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি বুঝতে পারলেন না কেনই বা শৈবলিনী এলেন আর কেনই বা অমন বকতে বকতে চলে যাচ্ছেন।

বিকেল এলো। বেশ ভাবুকের মতো থমথমে বিকেলটি।

ভিজে সোঁদা গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত।

প্রতিবেশিনীরা একে একে ঘাটে এসেছে সারাদিনের কাজকর্ম সেরে। যুবতীরাই বেশী। তাদের চুড়ির শব্দ, হাসির শব্দ ও কথার শব্দ জলের শব্দের সঙ্গে মিশে এক সুমধুর সঙ্গীত রচনা করেছে।

"কি লো? এতো দেরী?" একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করলো।

"আরে ভাই, কেন বলিস? ঠানদির কাছে সুমিত্রাদের কথা শুনতে শুনতে দেরী হোয়ে গেল। মেয়েটা ভাই নিশ্চয়ই যাদু জানে। কম কথা! জমিদারকে বশ করা!"

আরেকজন গায়ের কাপড়খানা জলে ফেলে পিঠখানা গামছা দিয়ে রগড়াতে রগড়াতে বললে "ঠিক বলেছিস। তা না হোলে কিনা যার বাপ হোতে ওদের এতো বড় সব্বনাশ হোল তারই পায়ে এসে হাত বুলোতে বসে!"

"তুইও পারতিস লো যদি তোরও অমন বিশ্ববিজয়ী রূপ থাকতো", আরেকজন বললে।

একটি মেয়ে নখ পরিষ্কার করছিল। বললে, "লোভ হচ্ছে বুঝি লা?"

তার পিঠটা ঈষৎ ঠেলে দিয়ে তৃতীয় যুবতীটি বলে "আ মরণ! নিজের থাকতে আবার পরেরটায় লোভ করতে যাবো কেন লা?"

শৈবলিনীর নাতনী রাসুও ছিল। সে বললে, "তা সত্যি ভাই, সুমিত্রাদি সুন্দরী বটে। আমার শ্বশুর বলেন ও নিশ্চয়ই কোন দেব্‌তার কন্যে, হয়তো কারও শাপে মানুষের ঘরে জন্মেছে।"

আরেকজন রমণী জলভর্তি ঘড়াটা সিঁড়ির ওপর থেকে কাঁখে তুলছিল। তুলতে তুলতে বললে, "রেখে দে লো তোর দেবতার কন্যে। এক রাজ্যি লোকের সামনে কি ঢলানিটাই না ঢলালো! দেখে লজ্জায় মরি।"

হঠাৎ সকলে চুপ হয়ে গেল—সুমিত্রা ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে। বাবা ও মার ছাড়া কাপড় নিয়ে সে এসেছে গা ধুতে।

একপাশ দিয়ে আস্তে আস্তে সুমিত্রা নামতে লাগলো। একজনের গায়ে হাতটা ঠেকতেই সে ঠাট্টা কোরে উঠলো ঃ "দেখিস্ লো, দেখিস্; নাই বা হলুম তোর মতো সুন্দরী। নাই বা এলো জমিদার বাড়ী বয়ে সাধতে।"

অন্যেরা মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে।

তাদের হাবভাবে সুমিত্রার বুঝতে বাকি রইল না যে এতক্ষণ তার সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্ছিল। তাদের কিছু কিছু মন্তব্যও তার কানে গিয়েছিল।

কোন কথা না কয়ে সে একধারে বোসে কাপড় কাচতে লাগলো।

পরদিন সকালে কাছারীবাড়ীতে জোর আলোচনা চলেছে। ম্যানেজারবাবু তো অবাক। কেমন কোরে সম্ভব হোল? জমিদারই তো রমানাথের সম্পত্তি ক্রোক করবার জন্যে তাঁকে বারবার চাপ দিচ্ছিলেন। না, না, এ হোতে পারে না।

অন্যান্য কর্মচারীরা নাছোড়বান্দা ঃ হতে পারে না কি, হয়ে গেছে।

শেষে ম্যানেজার স্থির করলেন ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে জমিদারের সঙ্গে দেখা করবেন।

সারাদিন আর দেখা হোল না। অবশেষে সন্ধ্যা এল।

সন্ধ্যা এলো চুপি চুপি। চলেও গেল চুপি চুপি। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত বৃষ্টি এমন হচ্ছিল যে না দেখা গেল সূর্যাস্ত, না শোনা গেল পাখীর কলকাকলি।

বৃষ্টির জন্যে অমরেশের বন্ধুবান্ধবও এখনও এসে পৌঁছয়নি। সে একা। সুমিত্রার চিন্তা তার মন জুড়ে।

হঠাৎ ম্যানেজারবাবুর দেখা। পা ঘসতে ঘসতে তিনি বললেন, "একটা কথা জিগগেস করবো বাবাজী?"

কথাটা অমরেশের কানে গেল না।

ম্যানেজারবাবু আবার বল্লেন "একটা কথা জিগগেস করবো বাবাজী?"

"কে? ম্যানেজার কাকা? বসুন, বসুন।" চেয়ারখানা এগিয়ে দিয়ে অমরেশ বললে।

"বলছিলুম কি", বসতে বসতে ম্যানেজারবাবু বললেন, "বলছিলুম কি রমানাথ ভটচায্যিকে নাকি—"

"হ্যাঁ, ওঁর খাজনাটা আমি মকুব কোরে দিয়েছি।"

"কিছু মনে কোর না বাবাজী, কিন্তু তোমারই তো নির্দেশে আমি—"

"হ্যাঁ আমি স্বীকার করছি ম্যানেজার কাকা আপনার কাজ আপনি ঠিকই করেছেন। আর আপনাকে খেলো করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে কিনা ভটচায্যি মশায়ের অবস্থাটা তো খুবই খারাপ। সেইজন্যেই শেষে ভেবেচিন্তে আমি তাঁকে অব্যাহতি দিলুম।"

"যে মানুষ হোতে এতো বড় ক্ষতি হোল, রাজাসাহেবের অকালমৃত্যু হোল, তাকে অব্যাহতি বাবাজী!"

অমরেশ খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো, কিছু বলতে পারলো না।

"জিনিসটা বোধহয় ভালো হোল না, বাবাজী।"

"সেটা তো আমার বিবেচ্য ম্যানেজার কাকা।"

ম্যানেজারের মুখ দিয়ে আর কথা সরলো না। তিনি অত্যন্ত অপমানিত বোধ কোরে আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

কিন্তু তবু তিনি স্থির থাকতে পারলেন না অবশেষে মাকে ব্যাপারটা জানানো কর্তব্য মনে কোরে তিনি কাশীতে তাঁকে চিঠি পাঠালেন।

সুমিত্রার চিন্তা অমরেশকে খুবই অস্থির কোরে তুলেছে। ওঃ কি দুর্নিবার মেয়েটার আকর্ষণ। যা সে করতে পারে বোলে কখনো বিশ্বাসও করতে পারেনি তাই কিনা তাকে দিয়ে করিয়ে নিলে!

কিন্তু না, কদিন কেটে গেছে, আর সে থাকতে পারছে না। তাকে একবার যেতেই হবে।

নীচে নেমে এসে সে গাড়ীখানা বার করলো।

তারপর নিজেই চালিয়ে নিয়ে একেবারে রমানাথ ভটচাযির দরজার সামনে এসে উপস্থিত হোল।

সাবিত্রী তখন সবেমাত্র বেরিয়েছিলেন চন্ডীমন্ডপে কথকতা শুনতে যাবেন বোলে।

"এসো বাবা এসো", বলতে বলতে তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা করলেন।

"আপনি কি কোথাও যাচ্ছিলেন মা?" খুব বিনয়ের সহিতই সে জিগগেস করলো।

"হ্যাঁ বাবা, চন্ডীমন্ডপে যাচ্ছি রামলীলা শুনতে।"

"তা হোলে?"

"তাতে কি হয়েছে বাবা? তুমি ঘরে চলো।"

"ভটচাযি মশাই কোথা?"

"উনি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন এতক্ষণে। এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তো তোমার কথাই হচ্ছিল।"

চৌকাঠে পা দিয়ে সাবিত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন "মিত্রারে, শীগগির আয় মা পিদিমটা নিয়ে। কে এয়েছেন দেখ্ এসে।"

সুমিত্রা ছুটে এলো।

অমরেশকে দেখেই সে চমকে উঠলো "আপনি!" সে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারছে না।

অমরেশেরও বুকের মধ্যে আনচান করতে থাকে।

আলো দেখিয়ে সুমিত্রা মা ও অমরেশকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো।

"বোস বাবা, এই তক্তপোষটাতেই বোস। তোমায় বসতে দেবার উপযুক্ত কিছু তো নেই।"

"তাতে কি হয়েছে মা?"

"ওঁকে ডেকে দোব কি?"

"আমি ডেকে দিচ্ছি মা" বলতে বলতে সুমিত্রা বেরিয়ে গেল।

অমরেশ বল্লে "না না, বিরক্ত করবার দরকার নেই। আমি এসেছিলুম এদিকে একটু বেড়াতে। তাই ভাবলুম একবার দেখা কোরে যাই। তা ছাড়া আসার আরও একটা কারণ আছে।" বলতে বলতে সে পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার কোরে তা থেকে পাঁচখানা দশ টাকার নোট টেনে নিয়ে সাবিত্রীর সামনে ধরলো তারপর বললে "এটা রাখুন মা।"

"কি বাবা?"

"টাকা।"

"টাকা!"

"হ্যাঁ।"

সাবিত্রী যেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

অমরেশ বলতে লাগলো "আমায় সংকোচ করছেন? আমি তো আপনার ছেলের মতো মা।"

রমানাথ এসে পড়লেন।

"এই যে ভটচায্যি মশাই এসেছেন। ভালোই হয়েছে। আপনিই না হয় রাখুন ভটচায্যি মশাই" বলতে বলতে সে তাঁর দিকে টাকাটা বাড়িয়ে দিল। তারপর বললে, "মনে হচ্ছে বর্তমানে আপনাদের—"

"সে কথা আর বলতে বাবা? তা না হোলে আর খাজনা দিতে পারি না? মাসের মধ্যে আদ্দেক দিন জোটে, আদ্দেক দিন জোটে না। তোমার কাছে বলতে তো লজ্জা নেই।"

"নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না। আচ্ছা, আমার যখন এবার নজরে পড়েছে, আর কষ্টে কাটাতে হবে না। কিন্তু টাকাটা—"

টাকাটা হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে রমানাথ বললেন "তোমার দানকে তো আর অসম্মান করতে পারি না বাবা। নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। তুমি চিরসুখী হও।"

মুহূর্তখানেক চুপ থেকে অমরেশ বল্লে "আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন যে!"

"তাতে কি হয়েছে বাবা? তুমি বোস", সাবিত্রী বল্লেন।

বসতে বসতে অমরেশ বললে, "দেখছি বড্ড অসময়েই এসে পড়েছি। ভটচাযিয় মশায়েরও ঘুমটা নষ্ট হোল, আপনারও কথকতা শোনায় বাধা পড়লো।"

"তাতে কি হয়েছে বাবা? তুমি আসবে এ আমাদের কত বড় সৌভাগ্য।"

রমানাথ বললেন "একশোবার। তুমি যদি না মুখ তুলে চাইতে আজ আমাদের কি অবস্থা হোত?"

আলোচনা বেশ জমে উঠলো।

অমরেশ বল্লে "কেন ভটচায্যি মশাই, আপনার কি জমিজমা কিছু নেই?"

"না বাবা। কিচ্ছু নেই। তোমাদের কাছারীতে কাজ করতুম, তাইতেই কোন রকমে চলতো। যজমান অবিশ্যি দুচার ঘর আছে। কিন্তু তাতে আর কি হয়? ফলে এখন বড্ডই কষ্টে পড়েছি।" চোখের জলে রমানাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হোয়ে গেল।

অমরেশের মনটা নড়ে উঠলো। বল্লে "আপনি কি আবার চাকরী করবেন?"

"তুমি যদি দাও বাবা তো করি। আমি গরীব মানুষ, আমার আর লজ্জা কি? তবে কোনদিন অধর্ম করিনি, করতেও পারবো না। আজ কি বাবা আমার এমন অবস্থা হোত যদি আমি তোমার বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষি না দিতুম? কিন্তু কি করবো বলো? ধর্ম তো ত্যাগ করতে পারি না!"

অমরেশ নীরবে শুনছিল বটে, কিন্তু খুবই বিরক্ত হচ্ছিল।

সাবিত্রী ও সুমিত্রাও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। সাবিত্রী তো মনে মনে চটেই যাচ্ছিলেন এসব প্রসঙ্গ তোলার জন্যে। চোখ-ইসারায় তিনি রমানাথকে চেপে যেতে অনুরোধ জানালেন।

শুধুমাত্র সুন্দরী সুমিত্রার জন্যেই অমরেশ রমানাথকে সহ্য করছিল। তার মন জয় করবার জন্যে সে বললে "আচ্ছা থাক্, আপনাকে আমি বরং একটা মাসোহারার ব্যবস্থা কোরে দিচ্ছি। আপনি আমাদের পুরনো কর্মচারী, অনেকদিন কাজ করেছেন, আপনাকে দেওয়া কর্তব্য।"

"নারায়ণ তোমায় রাজরাজেশ্বর করুন বাবা, আর কি বলবো" বলতে বলতে রমানাথের চোখ দুটি আবার অশ্রুসজল হোয়ে উঠলো।

"তবে আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ—আপনি শচী সামন্তর সঙ্গে মেলামেশা আর করবেন না।"

"শচীনন্দনের কথা বলছো বাবা! ওর সঙ্গে তো আমার অনেকদিনই দেখাসাক্ষাৎ নেই।"

আলোচনার মাঝে মাঝে অমরেশ সুমিত্রার দিকে চাইছিলো। সে না তাকিয়ে পারছিল না। সুমিত্রাও তাকাচ্ছিল তার দিকে। তারও চোখে বিস্ময়।

কিছুক্ষণ থেমে সে আবার সকলকে বসবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলো। বললে,

"ভটচায্যি মশাই আপনি বসবেন না মাও বসবেন না, মিত্রা তুমিও বসবে না। তবে আমিই বা কেন—"

তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে সাবিত্রী বল্লেন "আচ্ছা বাবা আচ্ছা, আমরা বসছি। ওগো তুমি বোস না ঐ চৌকিটার ওপর। মিত্রা তুই বোস্ তো মা তক্তপোষটায়।"

রমানাথ বসলেন। সুমিত্রা ইতস্তত করতে লাগলো।

অমরেশ ঃ "কই মিত্রা, বোস।"

অগত্যা সুমিত্রা বসলো, কিন্তু খুব সংকোচের সহিত, এবং অমরেশকে একটু দূরে রেখে।

"আর আপনি?"

"আমি এই চৌকাঠটায় বসছি বাবা।" বলতে বলতে সাবিত্রী চৌকাঠের ওপর বসলেন।

"তা কি হয়? আপনি বসবেন নীচে আর আমরা ওপরে? না, না, আপনি এইখানে বসুন, মিত্রার পাশে। মিত্রা তুমি বরং একটু সরে এসো।" বলতে বলতে সে সুমিত্রার হাতখানি ধোরে তাকে নিজের দিকে আর একটু সরিয়ে নিয়ে এলো।

সুমিত্রা এখন তার খুবই কাছে। তারও লাগছিল খুব ভালো।

সাবিত্রী উঠে এসে পাশে বসলেন।

আবার আলোচনা চলতে লাগলো।

বাইরে ঝিঁঝির শব্দ। ওদিকে রমানাথ ঝিমোচ্ছেন।

হঠাৎ হাতঘড়িটার দিকে চোখ পড়তেই অমরেশ বোলে উঠলো 'ইস! এতো রাত হোয়ে গেছে? আজ তবে উঠি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে দাঁড়িয়ে উঠলো।

"উঠছো বাবা? চলো তাহোলে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

"না মা, মিত্রা বরং এগিয়ে দিক। আপনি ভটচায্যি মশাইকে শুইয়ে দিন। উনি বড্ড ঢুলছেন।"

"তা সেই ভালো। মিত্রা, তুই মা পিদিমটা নিয়ে—"

"আলোর দরকার হবে না মা। চাঁদের আলো আছে। পিদিমটা বরং এখানে থাকলে আপনার সুবিধে হবে। চলো মিত্রা।"

সুমিত্রা অমরেশের পেছন পেছন গেল।

দরজা থেকে কয়েক হাত দূরে বেলগাছটার তলায় মোটরখানা দাঁড়িয়েছিল। সুমিত্রা দরজা পর্যন্ত এল।

"আরেকটু যাবে না?" খুব মিনতির সহিত অমরেশ বললে।

সুমিত্রার কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে। এতক্ষণ বাপমা পাশে ছিলো—সে একরকম। কিন্তু এখন?

সে ইতস্তত করতে থাকে।

"গাড়ীটা পর্যন্ত আমায় এগিয়ে দেবে না মিত্রা?" অমরেশ আবার অনুরোধ জানালো।

সুমিত্রা না এগিয়ে পারলো না।

যেতে যেতে অমরেশ মাঝে মাঝে তার কাঁধে হাতখানা রাখছিল।। সুমিত্রা আপত্তি করতে পারছিল না। তার বরং ভালই লাগছিল।

জ্যোৎস্না চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গত কয়েক দিনের বৃষ্টির জলে গাছপালা-গুলো আরও সবুজ হোয়ে উঠেছে। তার ওপর এখানে ওখানে ঝিঁঝির ডাক। সমস্ত মিলে যেন এক স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করেছে।

স্বপ্ন আকাশে, স্বপ্ন মাটিতে, স্বপ্ন ওদের চোখেও।

গাড়ীর কাছাকাছি এসে অমরেশ ডাকে, "মিত্রা!"

"কি বলছেন?"

"মোটরে চড়েছ?"

"না।"

"চলো না তবে মোটরে কোরে খানিক দূর বেড়িয়ে আসবে।"

সুমিত্রা উত্তর দেয় না।

"কি বলো? যাবে?"

"না।"

"কেন?"

সুমিত্রা নীরব।

"কি ভাবছো অতো? চলো না।"

"না।"

"কিন্তু সেদিন তো আমার প্রাসাদে গিয়েছিলে?"

"সে দরকার ছিলো বোলে। তাছাড়া শৈবঠাকুমা সঙ্গে ছিলেন।"

"বেশ তো এখন না হয় আমারই সঙ্গে চলো।"

সংকোচের সহিত সে বলে "লোকে কি বলবে?"

"কে জানতে পারবে এতো রাত্তিরে?"

"মা, বাবা। দেরী দেখলে তাঁরা যখন জিগগেস করবেন?"

অমরেশ কি ভাবে। তারপর বলে "কিন্তু আমি যে তোমায় ছেড়ে যেতে পারছি না মিত্রা। তোমার কি? তুমি তো এখনই বাড়ী গিয়ে সব ভুলে যাবে।"

"ঠিক উল্টো। আপনার বিরাট প্রাসাদ, কতো দাসদাসী, কত লোকজন। আপনিই বরং আমাদের ভুলে যাবেন।"

"তা যদি পারতুম তাহোলে আবার আসবো কেন? ঐ দেখ ঐ চাঁদের দিকে। কি বিরাট আকাশ জুড়ে কতনা নক্ষত্রের মাঝে ও বোসে রয়েছে। কিন্তু তবু একা। আমিও ঠিক তাই।"

"আপনি বিয়ে কোরে ফেলুন না কেন, তা হোলে তো আর এমন একা-একা থাকতে হবে না।"

"মনের মতো কাউকে না পেলে কেমন কোরে করি বলো?"

"এতো বড় পৃথিবীতে আপনার মনের মতো কেউ নেই?"

"আছে। এতো দিন পরে তার সন্ধানও পেয়েছি। কিন্তু সে যদি আমায় ধরা না দেয়?"

"আপনাকে ধরা দেবে না এমন মেয়ে কে থাকতে পারে?"

"কেউ থাকতে পাবে না?"

"না।"

"আছে। শুনবে কে?"

সুমিত্রার কৌতূহল বাড়তে থাকে ঃ "কে?"

"সে তুমি।"

লজ্জায় সুমিত্রা মাথা হেঁট করে।

অমরেশ বলে "তা হোলে? বলো, বলো তুমি রাজী?" বলতে বলতে সে তার কোমরটি ধোরে তাকে নিজের আরও কাছে টেনে নেয়।

আবেশে অভিভূত হোয়ে পড়ে সুমিত্রা। মাথাটি হেঁট কোরে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

"বলো রাজী তো?" তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে অমরেশ আবার জিদ করতে থাকে।

"অত অত, অত সৌভাগ্য কি আমার—" সে আর বলতে পারে না।

"মিত্রা! মিত্রা!" বলতে বলতে অমরেশ তাকে জড়িয়ে ধোরে তার মুখে, ঘাড়ে, গলায় চুমুর পর চুমু খেতে থাকে।

কলরবমুখর কাছারী। বিকেল আন্দাজ সাড়ে পাঁচটা। প্রকাণ্ড জানলাগুলো দিয়ে হাওয়া ও আলো আসছে প্রচুর। সাদা ধবধবে চাদরের ওপর বোসে কর্মচারীরা কর্মব্যস্ত। প্রত্যেকের কোলের কাছে ডেস্ক। কারও কারও বা হাতে হুঁকো, কানে কলম।

চাকররা কেউ পান পরিবেষণ করছে, কেউ তামাক ফিরিয়ে দিচ্ছে, কেউ কেউ অন্যান্য ফরমাইস খাটছে।

বাইরে সদ্য-ধোওয়া বারাণ্ডার ওপর ঘোমটা মাথায় বোসে এক রমণী। তার পাশে তার অন্ধ স্বামী। ওরা এসেছে ওদের এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে। প্রতিবেশী তাদের জমির ওপর জোর কোরে চাষ দিচ্ছে আর বোলে বেড়াচ্ছে জমি তার। অন্ধ খুব মিনতি কোরেই জানাচ্ছিল যে সন্ধ্যা হোয়ে গেলে বাড়ী ফেরা তাদের পক্ষে মুশকিল হবে, নৌকো পাওয়া যাবে না, কাজেই অভিযোগটা

এখন শুধু লিখে নিলেই তারা চলে যেতে পারে। মজা এমন যে বারবার বলা সত্ত্বেও তার কথা কারও কানে পৌঁছোচ্ছিল না।

ম্যানেজারবাবুর গলা শোনা যাচ্ছে ঃ "কি রহস্য কিছু বুঝতে পারছি না তো! জমিদারের কি মাথা খারাপ হোয়ে গেল? যে রমানাথের ওপর এই সেদিনও পর্যন্ত ছিল এত আক্রোশ, হঠাৎ তার ওপর এতো দয়া। খাজনা মাপ, পঞ্চাশ টাকা কোরে মাসোহারা, কি ব্যাপার।"

তামাক খেতে খেতে আর একজন বললে, "অথচ আরেক দিকে দেখুন. খরচ কমাবার জন্যে কাল পাঁচ-পাঁচজন কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হোল।"

এক বৃদ্ধ সামনের খোলা খাতাটার ওপর ঝুঁকে পড়ে কাজ করছিলেন, বললেন, "তাই তো হয়।"

ম্যানেজার ঃ "অথচ ঐ রমানাথের বিরুদ্ধে নালিশ করতে একটু দেরী করেছিলুম বোলে ওঃ আমায় সে কি বকাবকি।"

ত্রিশবত্রিশ বছব বয়সের এক কর্মচারী কলমের ডগা দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে বললো "তখন কি জমিদার জানতেন যে রমানাথের ঘরে সুন্দরী মেয়ে আছে?"

হঠাৎ মোটরের শব্দ পেতে সকলে চুপ হোয়ে গেল। স্কুল কমিটির সভা সেরে জমিদার ফিরছেন।

লাল কাঁকর ফেলা রাস্তার ওপর দিয়ে মোটরখানা এগিযে এসে কাছারীর সামনে দাঁড়ালো। অমরেশ গাড়ীর ভেতর থেকে হাঁকলো "ম্যানেজার কাকা!"

ম্যানেজারবাবু ছুটে এলেন।

"টাকাটা রমানাথ ভটচাযিকে পাঠিয়েছেন নাকি?'

"না এখনো—"

"এখনো প্যাঠান নি? নাঃ আপনাবা সব কাজেই বড্ড গড়িমসি করেন। যাক, কাল সকালেই যেন পাঠানো হয়।"

"হ্যাঁ বাবাজী, কাল ঠিক পাঠিযে দোব।"

"আব হ্যাঁ, শুনুন। ওঁব বাড়ীঘবেব অবস্থা দেখে এলুম বড্ডই খারাপ. মেরামত টেরামত যা দরকার হয় কোরে দেবেন তো।"

"খরচপত্তর?"

"খরচপত্তব জমিদারী থেকেই হবে।"

"আচ্ছা।"

অমরেশ যাবার জন্য গাড়ীতে স্টার্ট দিল।

"একটু দাঁড়িয়ে যাবে কি বাবাজী? দু-একটা কথা আছে।"

"বলুন।"

"বলছিলুম কি যেসব কর্মচারীর ওপর নোটিস হয়েছে তারা আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।"

"না না, কোন লাভ নেই। ওদের বোলে দেবেন এখন আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। কাজেই ওদের ছাড়াতে হয়েছে, আর এজন্যে আমি খুবই দুঃখিত। আচ্ছা। চলি তাহোলে।"

"আর একটা কথা।"

"বলুন।"

"বাসুদেবপুর থেকে বলরামবাবু লিখে পাঠিয়েছেন—"

"বলরামবাবু কে?"

"আমাদের একজন গোমস্তা। রাজাসাহেবের আমল থেকেই উনি কাজ করছেন।"

"ও। তা বলরামবাবু কি লিখেছেন?"

"লিখেছেন ওখানকার প্রজারা এ বছর খাজনা দিতে পারবে না বোলে গণদরখাস্ত করেছে।"

"মাথায় ঝাড়ু গণ-দরখাস্তের। খাজনা দিতে পারবে না কেন?"

"বলছে এ বছর নাকি ভালো ফসল হয়নি।"

"ওসব শুনতে চাই না। আমাদের চলবে কি কোরে? সরকার কি তার পাওনা ছাড়বে? অন্যান্য পাওনাদাররা?"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"ওখানকার প্রজারা ভারী একরোখা।"

"মগের মুল্লুক নাকি? আপনাদের এই সব দুর্বলতার জন্যেই প্রজারা জো পায়। বাবা বলতেন চাবুক মেরে খাজনা আদায় করবে। সে কথা ভুলে গেছেন?"

"অবিশ্যি—"

"অবিশ্যি টবিশ্যি নয় ম্যানেজার কাকা। বলরামবাবু না কি নাম বললেন ওঁকে লিখে দিন খাজনা আদায় করবার জন্যেই ওঁকে রাখা হয়েছে, খাজনা যদি উনি আদায় করতে না পারেন ওঁকে বরখাস্ত করা হবে।"

ম্যানেজারের জবাবের আর অপেক্ষা না রেখেই অমরেশ চলে গেল।

প্রাসাদে পা দিতেই হঠাৎ তার চিন্তাটা অন্যদিক ঘুরে গেল। একবার সুমিত্রার কাছে ঘুরে এলে হয় না? একটু থমকে দাঁড়ালোও। পরক্ষণেই ভাবলো, নাঃ এত ঘন ঘন যাওয়া ঠিক হবে না।

অন্যান্য দিনের মতো আজও ঘুম থেকে উঠতে অমরেশের দশটা বেজে গেছে। বারাণ্ডায় বোসে চা খেতে খেতে সে অলসভাবে খবরকাগজের পাতাগুলো

ওল্টাচ্ছে, কিছুতেই আর মন বসছে না, এমন সময়ে হঠাৎ 'হ্যালো' শুনে চমকে উঠলো। মুখ তুলে দেখে একেবারে তাব সামনে তার প্রিয় বন্ধু সলিল চৌধুরী উপস্থিত।

"আরে সলিল!" বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠে সে তাকে আলিঙ্গন করলো।

তারপর সামনের সোফাখানা এগিয়ে দিয়ে বললে "বোস্, বোস্। ওঃ কতকাল পরে!"

"তুই তো আর সম্পর্ক রাখবি না!" বলতে বলতে সলিল বসলো। তারপর বললে "চিঠি দিলে চিঠির উত্তর পর্যন্ত দিবি না।"

"ওটা ভাই স্বীকাব করছি আমার বদ অভ্যেস। এই দ্যাখ্না মা কাশী রয়েছেন, মাকে পর্যন্ত একখানা চিঠি দিতে পাবি না। মা এজন্যে কত দুঃখ করেন।"

পকেট থেকে সিগারেটের কেসটা বার কোরে নিজে একটা নিয়ে ও অমরেশকে একটা দিয়ে সলিল বললে "তাবপর?"

"কিসের পর?"

"বিয়ে থা করবি না?"

অমরেশ মুচকি হাসে।

"হাসছিস যে? করেছিস নাকি?"

"না।"

"করবি না?"

"এখনো ঠিক করতে পারিনি। তুই করেছিস?"

"করবো বোলেই তো তোকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"বাহবা! বাহবা!" আনন্দে অমরেশ সলিলের পিঠ চাপড়াতে থাকে। "কোথায় কর্বছিস?"

"সব শুনতে পাবি। এখন তাড়াতাড়ি নে দেখি। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।"

"দূর! সে কি কোরে সম্ভব?"

"সম্ভব করতেই হবে ভাই। আমায সন্ধের আগে কোলকাতায় পৌঁছতেই হবে।"

"বিয়ে কবে?"

"পরশু।"

"বেশ তো, আমি কালই যাচ্ছি।"

"সে হয় না। মা বলেছেন তোকে সঙ্গে কোবে নিয়ে যেতে।"

"ওঃ, মার খুব বাধ্যবশ ছেলে দেখছি।"

"মার অনুরোধ তাহোলে রাখবি না?"

"আমি কি তাই বলছি? মাসীমা কেমন আছেন?"

"ভালোই।"

"কিন্তু বল্, 'চল্' বললেই কেমন কোরে সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া যায়?"

"কেন? তোর যখন পিছটানই নেই—"

"বারে! কাজকর্ম আছে তো?"

"সে তো লোকজনরা করবে। আর যদি কিছু তেমন জরুরী থাকে তো এক্ষুনি ডেকে বুঝিয়ে দেওয়াও তো যায়।"

বলতে বলতে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে সলিল তার হাত ধোরে দাঁড়িয়ে ওঠে।

"দেখ দেখি! ছেলে যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলো। মানুষ তো হাতে কিছুটা সময় নিয়ে আসে! এদ্দিন পরে এলি, দুএকদিন থাক্, একটু ঘুরে ফিরে দেখ্, তা না—"

"সে ভাই পরে হবেখন। বলিস্ তো সস্ত্রীকই আসবো।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এখন থেকেই নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি।"

"নিমন্ত্রণ তোর ভাই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলুম। এখন নে, ওঠ্।"

"কি মুশকিলেই পড়লুম! অন্তত একটু চা-টা খা।"

চাকরদের ডেকে অমরেশ চায়ের অর্ডার দিল।

সলিল দাঁড়িয়েই রইলো।

বন্ধুর দিকে চেয়ে অমরেশ বলে "যাবো যাবো যে করছিস, এখন ট্রেন কোথা? সেই দুটোর আগে ট্রেন নেই।"

"তাহোলে?"

"কেন? সন্ধেব আগে ফিরতে চাস তো?"

"হ্যাঁ।"

"তাই হবে।"

আশ্বস্ত হোযে সলিল বসলো। "তা হোলে শুধু চা কেন, খাওয়া-দাওয়াটাও সেরে যেতে পারি।"

"এতক্ষণে ঘটে বুদ্ধি এলো। নে, এখন একটু ঠাণ্ডা হোয়ে বোস্।"

সলিল আব একটা সিগারেট বার করলো, অমরেশকেও একটা দিলো। তারপর বললে "মাসীমা তা হোলে এখন কাশীতে?"

"হ্যাঁ।"

"শীগগিরই ফিববেন তো?"

"সেটা তাঁর ইচ্ছে।"

"ফিরলে জানাস। প্রণাম কোরে যাবো। এদিক ওদিক চাইছিস কেন?"

"দ্যাখ্ না। চাকরগুলো কি কুড়ে! কখন যে চা আনবে?"

"দাঁড়া, এই তো বললি। জল গরম হবে তবে তো।"

উভয়েই সিগারেট ধরালো।

সিগারেট খেতে খেতে সলিল বলে "কোলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক তা হোলে কেটে দিলি?"

"না ভাই কাটিনি, তবে বর্তমানে বড় জড়িয়ে পড়েছি। তখন মাথার ওপর বাবা ছিলেন. কাজেই ঝক্কি ছিল না। এখন সব কাজ নিজেকেই দেখাশুনো করতে হচ্ছে।"

চা এলো। তার সঙ্গে অন্যান্য উপকরণ।

সলিল পরম আগ্রহে খেতে শুরু কোরে দিল।

"একঘন্টা পরে ভাত, তারপর বিশ্রাম, তারপর দুটোর মধ্যে বেরিয়ে পড়া।" অমরেশ যেন মুখস্থ পড়ে গেল।

"তবে এতো আনতে বললি কেন? খিদের সময় খাবার সামনে রেখে কেউ কম খেতে পারে?"

"বেশ তো, ভালো লাগে খা'না।"

একজন চাকরকে ডেকে অমরেশ বলে দিলে সলিলের স্নান প্রভৃতি যখন যা প্রয়োজন যেন ঠিক ঠিক ব্যবস্থা হয়।

আরেকজনকে ডেকে বললে "ঠাকুরকে খবর দাও, আমার সঙ্গে আমার বন্ধু খাবেন—ঠিক স' বারোটায় আমরা খেতে বসবো।"

তারপর ম্যানেজারের ডাক পড়লো। ম্যানেজাব আসতেই সে বললে, "ম্যানেজার-কাকা, চিনতে পারছেন এঁকে নিশ্চয়?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। নমস্কাব। খবর সব ভালো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" সলিল প্রত্যভিবাদন করলো।

অমরেশ বলতে লাগলো "এঁর বিয়ে। আমায় নিতে এয়েছেন। আমি দুটোর ট্রেনে চলে যাচ্ছি। ফিরতে বোধ হয়—"

সলিল তাড়াতাড়ি বোলে উঠলো "অন্ততঃ সপ্তাখানেক।"

"না ভাই অদ্দিন থাকলে কাজের ক্ষতি হবে।"

"আচ্ছা, সে সেখানে গিয়ে বিবেচনা করিসখন্। আগে চ'তো।"

"তা হোলে ম্যানেজারকাকা?"

"হ্যাঁ বাবাজী, ঠিক আছে। কাজও যেমন দরকাব আনন্দও তেমনি। তার ওপর বন্ধুর বিয়ে। যান বরং ঘুরে আসুন। শরীরটা তো কিছুদিন যাবত ভালো যাচ্ছে না, কাজেই দিনকতক বেড়িয়ে এলে ভালোই হবে।"

"তা হোলে ছুটি মঞ্জুর? ব্যাস, যান, আপনাকে আর আটকে রাখবো না। না, দাঁড়ান, একবার ড্রাইভারকে ডেকে বোলে দিন তো সে যেন দুটোর আগে আমাদের স্টেশনে পেঁাছে দেয়। আর হ্যাঁ, ভাল কথা, ভটচায্যি মশাইকে সেই টাকাটা পাঠিয়েছেন তো?"

"হ্যাঁ বাবাজী। আচ্ছা, আমি তা হোলে এখন—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ আসুন।"

ম্যানেজার চলে গেলেন।

সলিলকে হঠাৎ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে দেখে অমরেশ বললে "কি হোল? আর খোল না?"

"না, এক্ষুনি আবার খেতে হবে তো?"

"তা হোলে আর একটু পরে স্নান। কেমন? এখন চাস তো বোসে বোসে কাগজগুলো একটু নাড়াচাড়া কর্। আমি ততক্ষণে আরও দুএকটা দরকারী কাজ সেরে নি।"

"ঠিক আছে।"

"তোর কোন অসুবিধা হবে না তো?"

"না না, তুই যা। এ তো আমার নিজেরই বাড়ী।"

অমরেশ নিজের ঘরে গেল, তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি লিখে হেমাকে ডেকে পাঠালো, বললে "উত্তরপাড়ায় তোমার যাওয়া আসা আছে হেমা?"

"উত্তরপাড়ায়?"

"হ্যাঁ।"

"ওমা খুব। সেখানে যে আমার মাসীর বাড়ী।"

"সেখানে একবার তোমায় যেতে হবে।"

"কোতা বলুন তো?"

"রমানাথ ভটচায্যির বাড়ী।"

"রমানাথ ভটচায্যি! যে আমাদের—"

তাকে আর বলতে না দিয়ে অমরেশ তাড়াতাড়ি বললে, "হ্যাঁ।"

হেমা অবাক হোল। অবশ্য এ কদিন সে এ সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনছে। বললে "চিনি না, তবে খুঁজে নিতে পারি।"

"পারবে তো? বেশ। এই নাও, এই চিঠিখানা তাঁর মেয়েকে দিয়ে আসতে হবে।"

"তাঁর মেয়েকে?"

"হ্যাঁ।"

এতক্ষণে হেমা বুঝতে পারলো। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল "বুঝেছি।"

"কি বুঝেছো?"

হেমা বোকা নয়। নিজেকে সে চেপে গেল, বললে, "চিঠিখানা রমানাথ ভটচায্যির মেয়েকে দিয়ে আসতে হবে।"

"হ্যাঁ। এই নাও।"

চিঠিখানা নিয়ে হেমা যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

"শোন", অমরেশ ডাকলো। "কথাটা নিয়ে যেন পাঁচ কান কোরে বেড়িও না। এখানকারও কেউ যেন না জানতে পারে।"

মুচকি হেসে দাসী বললে "তা কখনো পারি? এ যে আপনার চিঠি!"

"আর হ্যাঁ, খুব খাতির কোরে ওঁদের সঙ্গে কথা বোল। আচ্ছা এসো।"

হাতে চিঠি ও বুকে কৌতূহল নিয়ে হেমা বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে ভাবলো, এও সম্ভব!

অমরেশ খানিকক্ষণ বোসে এদিক ওদিক চিন্তা করতে লাগলো। হঠাৎ তার মনে পড়লো সলিলের বৌয়ের জন্যে উপহার নিয়ে যেতে হবে যে। যাক, যাবার পথে কোলকাতা থেকে কিনে নিয়ে যাওয়া যাবে।

আরও খানিকক্ষণ পরে সে উঠলো। একবার বন্ধুর তদারকেও গেল। তারপর নিজের প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দিলো।

যথাসময়ে মোটর উপস্থিত হোল। দুই বন্ধু গাড়ীতে গিয়ে বসলো। চাকর ও কর্মচারীরা বিদায় জানালো। গাড়ী স্টেশনের দিকে ছুটলো।

"কাঁহারে হেমা?" দরোয়ান দেবনন্দন পাণ্ডে হেমাকে জিজ্ঞেস করলো।

হেমা চলেছে উত্তরপাড়ায়। চলেছে জমিদারের চিঠি রমানাথ ভটচায্যির মেয়েকে দেবার জন্যে। প্রথমে সে উঠবে মাসীর ওখানে। তারপর সেখান থেকে খোঁজখবর নিয়ে যাবে রমানাথের বাড়ী। কিছুদূর সে গেছে এমন সময়ে দেবনন্দনের সঙ্গে দেখা। দেবনন্দন ফিরছিল তাগাদা সেরে।

এই মরেছে! লুকিয়ে কি কিছু করবার জো আছে? রাগত স্বরে হেমা জবাব দিল, "যমের বাড়ী।"

"ও তো বহুত আচ্ছা জায়গা আছে।"

"হ্যাঁ বহুৎ। তুমি যাবে?"

"তুমহার সাথ হামি যমরাজকে পাশভি যাতে পারি।"

"ওঃ বড় পীরিত যে।"

"পীরিত হোবে না? তুমহারে যে হামার খুউব ভালো লাগে।"

কথাটা হেমার ভালো যে লাগলো না তা নয়। কথাটা সত্যিও বটে। সত্যিই দেবনন্দন হেমাকে ভালোবাসে। সে তার স্বল্প বেতন থেকে তাকে মধ্যে মধ্যে কাপড়টা সাবানটা কিনে এনে দেয়। ভালোবাসা না থাকলে কেউ এমনটি পারে না। কিন্তু হেমা যে তাকে ভালোবাসে এমন কথার আভাসও সে কোন দিন তার কাছে পায়নি। বরং মনে হয় সে যেন তার প্রতি অসন্তুষ্ট—দেখা হোলেই বিরক্তি প্রকাশ করে, ঝগড়া করে। অবশ্য তার মনের গোপন কোণে অন্য কিছু হয়তো থাকতে পারে। কেননা এটাও লক্ষ্য করা যায় যে দুদিন যদি দেবনন্দনের সঙ্গে দেখা না হয় সে ছটফট করতে থাকে।

হাসতে হাসতে হেমা উত্তর করে "কিন্তু এখন থাক পাঁড়েজী। পরে যেওখন।"

"কেনো? এখোন কি হোল?"

"এখন আমাকে একলাই যেতে হবে।"

"হামি গেলে কি কুছ্ নুকসান হোবে?"

"আঃ, কি মুশকিলেই পড়লুম! হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।" বলতে বলতে হেমা আর না দাঁড়িয়ে চলে গেল।

কিছু দূর গিয়ে সে দেখে দেবনন্দন ঠিক তার পিছু পিছু আসছে। বিরক্ত হোয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো "আ মর মিনসে! এতো কোরে বারণ করলুম, তবু শোনা হোল না?"

দেবনন্দন হটে না, বলে, "বেশ তো, হামি তো তুমহার সঙ্গে যাচ্ছি না, পিছে পিছে চলেছি। এতে তুমহার কি আপত্তি থাকতে পারে?"

"হ্যাঁ, এতেও আমার আপত্তি। তুমি ফিরে যাও।"

দেবনন্দন দাঁড়িয়ে পড়লো।

কিছু দূব গিয়ে হেমা পিছন ফিরে দেখে দেবনন্দন মুখটি বিষণ্ণ কোরে তাব দিকে চেযে দাঁড়িয়ে আছে।

বোজকার মতো আজও উত্তবপাড়ার সেই পুকুরটির ঘাটে মেয়েদের ভিড়। সবাই যে যার দেহের পবিচর্যা নিয়ে ব্যস্ত। ফাঁকে ফাঁকে চলেছে ঠাট্টা তামাসা আর তাব সঙ্গে হাসিব ফোয়াবা।

হঠাৎ অপরিচিত কণ্ঠস্বব শোনা যায়ঃ "হ্যাঁগা মেযেবা, রমানাথ ভটচাযির বাড়ী কোন্‌টা বলতে পার?"

"কোত্থেকে আসছো গা তুমি?" একজন বর্ষীয়সী প্রশ্ন করলেন।

"জমিদাববাড়ী।"

"ও তাই বল। ঐ যে গাছটা দেখতে পাচ্ছ ঐখানে।"

একজন যুবতী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকে নিরীক্ষণ করছিল। সে তাড়াতাড়ি বোলে উঠলো, "এই যে গো, যাঁর জন্যে এসেচ তাঁর মেয়ে এখানে।"

"কই? কই? ওমা!" হেমা চিনতে পারলো। এতক্ষণে তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হোয়ে গেল। "ওঃ, ঘাট যেন আলো কোরে রয়েচে। এস, এস, দিদি, উঠে এস। বলে, যাব রাজরানী হোয়ে সিংহাসনে বসবার কথা—"

সুমিত্রাব মুখ রাঙা হোয়ে ওঠে। একটা স্নিগ্ধ গর্বে তার বুক দুলে ওঠে। সে মুখ তুলে দেখে জমিদারবাড়ীর দাসী হেমা, যার দয়ায় সেদিন সে জমিদারের সাক্ষাৎ পেয়েছিল। তাব মুখ আরো লাল হোয়ে উঠলো।

সেই যুবতীটি বোলে উঠলো, "ওঠ্ না ভাই সুমিত্রা, কাপড়খানা নয় আমিই ধুয়ে দিচ্ছি।"

আর একজন ঃ "হ্যাঁ হ্যাঁ ও হবেখন। তুই যা সুমিত্রা।"

সুমিত্রা আশ্চর্য হোয়ে গেল এদের ব্যবহারের পরিবর্তন দেখে। অথচ একটু আগে পর্যন্ত কতনা ঠাট্টা করছিল।

কিন্তু সে রাজী হোল না। দাসীর দিকে চেয়ে ধীরভাবে বললে, "তুমি একটু দাঁড়াবে ভাই? আমার এক্ষুনি হোয়ে যাবে।"

"ওমা সে কি হয়? আমি কেচে দিচ্ছি, সরো সবো।" হেমা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে তার হাত থেকে কাপড়টা ছিনিয়ে নিল।

সবাই অবাক হোয়ে চেয়ে রইল।

গা ধোয়া হোলে সুমিত্রা হেমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর দিকে গেল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে তার বুকটা ছ্যাঁৎ কোরে উঠলো। যদি হেমা জমিদারবাড়ীতে তার যাওয়ার কথাটা ওদের বলে দিত?

বাড়ীতে পা দিয়েই সে চেঁচিয়ে উঠলো, "মাগো, কে এসেছে দেখ!"

সাবিত্রী দাওয়ায় বেরিয়ে এলেন। হঠাৎ একজন অজানা স্ত্রীলোককে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। প্রশ্ন কবলেন, "কে গা?"

"আমি মা জমিদারের কাছ থেকে আসচি। আমি হলুম জমিদারবাবুর সব থেকে পেয়ারের ঝি।"

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সে সাবিত্রীর পাযেব কাছে ঢিপ কোবে মাথা ঠুকে প্রণাম করলো।

সাবিত্রী বিচলিত হলেন। জমিদাবের পেয়াবেব ঝি! না জানি কত মাননীয়া অতিথি! তিনি ছুটে গিয়ে রান্নাঘরের ভেতর থেকে একখানা পিঁড়ি এনে সসংকোচে তাকে বসতে দিলেন।

পিঁড়ির ওপর বোসে দাসী গল্প জুড়ে দিলো। কযেক মধ্যে কয়েকজন বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনীও এসে উপস্থিত হোলেন।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি কাপড ছেড়ে এসে তাদের সামনে দাঁড়ালো। হেমা দেখলো সেদিন রাত্রে যার চোখে অনুগ্রহভিক্ষাব মিনতি ছিল আজ আব তাব চোখে তার চিহ্নমাত্র নেই।

কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিযে হেমা বললে, "তোমাব ঘর কোন্‌টা দিদি? চলনা সেইখানেই গিয়ে একটু বসিগে।"

সাবিত্রী বোলে উঠলেন, "হ্যাঁ যাও না, যাও।" তারপব সুমিত্রার দিকে চেয়েঃ "যা না মিত্রা, তোর ঘরে নিয়ে যা। আমি বরং ততক্ষণে সন্ধেটা দোবার ব্যবস্থা করি।"

হেমাকে নিয়ে সুমিত্রা ঘরে গেল। প্রতিবেশিনীরাও উঠলেন।

একটু পরে প্রদীপ দিতে এসে সাবিত্রী দেখেন হেমা কাপড়ের ভেতর থেকে একখানা চিঠি বার কোরে সুমিত্রার হাতে দিচ্ছে। তিনি তাড়াতাড়ি সরে গেলেন।

"আমায় চিঠি দিয়েছেন!" সুমিত্রার বিস্ময় আর ধরে না।

"হ্যাঁ। এই দেখো না তোমার নাম লেখা।"

"আমার!"

"মেয়ের রকম দেখো। এতে আশ্চয্যি হবার কি আছে?"

"তিনি যে ভাই জমিদার আর আমি—" সুমিত্রা কথাটা শেষ করতে পারে না। সে ভাবে, এ কি স্বপ্ন? পেঁজা কাপড়ের ভেতরে তার বুকটা দ্রুত ওঠানামা করতে থাকে।

"কি যে বলো দিদি কিচ্ছু বুঝতে পারি না।"

"তাহোলে সত্যিই তিনি আমায় ভালবাসেন?"

হেমা তার কাঁধটা ধোরে নাড়া দিয়ে বলে, "নাঃ, তুমি দেখছি বড্ড ছেলেমানুষ। এ কি আর বোলে দিতে হয়?"

"কিন্তু আমাদের তো ভাই কিচ্ছু নেই। কি দেখে তিনি আমায়—"

"ওমা কি নেই তোমার? বলে অমন দিগ্‌বিজয়ী রূপ! আর কি দরগারটা মেয়েমানুষের শুনি? পুরুষ মানুষের মন কাড়তে ঐ তো সব।"

সুমিত্রা মাথা নীচু কোরে থাকে।

হেমা বলে, "চিঠিখানা পড়বে না? জমিদার কি লিখেচেন দ্যাখো। আমাকেও একটু শোনাও। আমি এতটা পথ বয়ে নিয়ে এলুম।"

খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা প্রদীপের কাছে নিয়ে গিয়ে সুমিত্রা ফিস্‌ফিস্‌ কোরে পড়ে "প্রিয়তমে!"

পড়বামাত্র লজ্জায় তার মুখ রাঙা হোয়ে ওঠে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়। বুকের মধ্যে কেমন যেন করতে থাকে।

আঁচল দিয়ে সে মুখখানা মোছে।

কিন্তু শব্দটির মধ্যে যেন যাদু আছে। তার আবার পড়তে ইচ্ছে করে, যে এমন আনন্দের জিনিস তার কাছে বয়ে এনেছে তাকেও পড়িয়ে শোনাতে ইচ্ছে করে। আবার সে পড়ে ঃ "প্রিয়তমে—"

হাসতে হাসতে হেমা বলে, "দেখলে তো দিদিমণি? যা বলেছিলুম তাই। হ্যাঁ তারপর?"

সুমিত্রার যেন সম্বিত ফিরে আসে। কি বেহায়া সে! এ যে শুধু তারই জন্যে লেখা—গোপনীয়! এ চিঠি কখনো অপরকে পড়ে শোনায়?

এদিকে হেমা অধীর হোয়ে ওঠে ঃ "কি হোল? থেমে গেলে কেন?"

সুমিত্রা উত্তর দেয় না, পড়তে থাকে মনে মনে।

পড়া শেষ হোলে হেমা বলে, "আমায় বলতে লজ্জা হচ্ছে? আচ্ছা আচ্ছা থাক। কিন্তু আমারও হাতযশ তোমায় মানতে হবে দিদিমণি। আমি সেদিন যদি তোমায় জমিদারের কাছে নিয়ে না যেতুম তা'লে কি তুমি জমিদারের চোখে পড়তে পারতে? বলো।"

"হ্যাঁ ভাই, সেজন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।"

"অবিশ্যি তোমারও ভাগ্য ভালো বলতে হবে। পূর্বজন্মে অনেক পূণ্য না করলে এমনটি হয় না। কিন্তু আর নয়। এইবার উঠি।" বলতে বলতে হেমা দাঁড়িয়ে উঠলো।

"তুমি কি ভাই রাগ করলে?"

"ওমা সেকি কথা! রাত হোয়ে গেল কিনা তাই। এতোটা পথ আবার যেতে হবে তো!"

"আবার এসো কিন্তু।"

"সে আর বলতে? আসবো বৈকি। এ তো এখন আমাদেরই ঘর।"

হেমা চলে গেল।

সুমিত্রা কুলুঙ্গি থেকে আরশিখানা পাড়লো।

সত্যিই কি সে এত সুন্দরী!

আরশিখানা সামনে ধোরে সে নিজেকে দেখতে লাগলো।

হঠাৎ সাবিত্রী দবজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। সুমিত্রার মুখ লজ্জায় রাঙা হোয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি সে আরশিখানা যেখান থেকে নিয়েছিল সেখানে রেখে দিলো।

"ও কি জন্যে এসেছিলো রে মিত্রা?" সাবিত্রী প্রশ্ন করলেন।

"চিঠি দিতে।" সলজ্জকণ্ঠে মাথাটি নত কোবে সুমিত্রা বললে।

চিঠি দিতে সাবিত্রীও দেখেছিলেন। আর সেইজন্যেই তাঁর এত কৌতূহল।

"চিঠি কি জমিদারই দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

লজ্জায় সুমিত্রা মাথা তুলতে পারে না।

সাবিত্রী ভেবেছিলেন সুমিত্রা নিজে হোতেই এ সম্বন্ধে কিছু বলবে। কিন্তু সে আর কিছু বললো না। অথচ তিনি নিজের কৌতূহলও আর চেপে রাখতে পারছিলেন না। জিগগেস করলেন, "কি লিখেছেন?"

সুমিত্রা তেমনি সলজ্জ ভাবেই পায়ের বুড়ো আঙুল মেঝের ওপর ঘসতে ঘসতে বললে, "লিখেছেন তাঁর এক বন্ধুর বিয়েতে হঠাৎ তাঁকে আজ বাইরে চলে যেতে হচ্ছে।"

"আর কিছু না?"

"হ্যাঁ, লিখেছেন হপ্তাখানেক পরে ফিরে আসবেন।"

সাবিত্রী তবু সন্তুষ্ট হোতে পারছেন না, আবার প্রশ্ন করলেন, "আর কিছু না?"

"হ্যাঁ, আরও লিখেছেন। ফিরে এসে এখানে আসবেন।"

আনন্দে সাবিত্রীর হৃদয় নেচে ওঠেঃ "হ্যাঁ?" তারপর কিছুক্ষণ থেমে বলেন, "আমার কি মনে হয় জানিস মা? নাঃ, বেশী আশা করবো না। যা পোড়া কপাল আমাদের—"

দরজার ধারে ঠানদির গলা পেয়ে তিনি থেমে গেলেন।

"জমিদার বাড়ীর ঝি কেন এসেছিলো বউ?" বলতে বলতে ঠানদি একেবারে উঠোনে এসে হাজির। তাঁর পিছন পিছন আরও কয়েকজন।

"এই যে মাসীমা, এস, এস।" বলতে বলতে সাবিত্রী ফিরে দাঁড়ালেন।

"আর আমাদের খাতির কি বেশী দিন থাকবে গা?"

"অমন কথা কেন বলছো মাসীমা?"

"আর কি। দেখতে তো পাচ্ছি তোমার বাড়ী এখন জমিদার আসছেন, জমিদারের ঝি আসছে।"

"তাতে কি? আমরা কি তাতে তোমাদের পর হোয়ে গেলুম?"

"তা যদি বলো বাপু আচ্ছা থাক্‌গে ও সব কথা। এখন বলো তো ঝি কি বললে?"

"ঝি তো কিছু বলতে আসেনি। এসেছিলো জমিদার মিত্রাকে চিঠি দিয়েছেন তাই দিতে।"

"চিঠি! বটে!"

প্রতিবেশিনীদের চোখে একইসঙ্গে ঈর্ষা ও বিস্ময় ফুটে ওঠে।

ওদিকে অবজ্ঞাত অবহেলিত সাবিত্রীবও বুকখানা দুলতে থাকে আনন্দে।

সন্ধ্যাব অন্ধকাব ঘন হোযে ছড়িযে পড়েছে। চারদিক থেকে এখনও ভেসে আসছে শাঁকেব আওয়াজ। তার সঙ্গে আসছে শিয়ালের হুক্কাহুয়া—মাঝে মাঝে, থেমে থেমে।

হেমা ফিরছে রমানাথ ভটচায্যির মেয়েকে চিঠি দিয়ে।

চাষীবা প্রায় সবাই ঘরে ফিরে গেছে। কেবল যা দুএকজনকে এখনও মাঠে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে।

হেমা চলেছে ভাবতে ভাবতে।

মাথার ওপর আকাশে তারাগুলো ক্রমশই স্পষ্ট হোয়ে উঠছে। হেমা একবার আকাশের দিকে চাইলো থমকে দাঁড়ালো, ভাবলো রাত্রিটা মাসীর বাড়ীতেই কাটিয়ে যাবে।

মাসীর বাড়ীর পথই ধরলো সে।

কিন্তু মনটা ক্রমশই চঞ্চল হোয়ে উঠছে। কিছুই ভালো লাগছে না তার। মনের মধ্যে কিসের যেন এক অভাব অনুভব করছে, নিজেকে যেন বড্ড একা একা লাগছে।

সত্যিই, এ জগতে কে আর আছে তার? পরের বাড়ী কাজ কোরে পরের চিঠি বয়ে বেড়াবার জন্যেই যেন সে জন্মেছে, তার নিজের জন বলতে কেউ নেই।

হঠাৎ সুমিত্রার প্রতি তার হিংসে হয়। কই! তাকে তো কেউ কোনদিন অমন ভাবে 'প্রিয়তমে' বোলে ডাকেনি!

না, না, এ কি ভাবছে সে? সে তো ইচ্ছে কোরেই নিজেকে বঞ্চিত কোরে রেখেছে। সে তো ইচ্ছে করেই তার প্রতি একজনের প্রাণঢালা ভালোবাসাকে কেবলই অপমান কোরে ফিরিয়ে দিয়েছে। যতবারই সেই মানুষটি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ততবারই সে তার প্রতি রূঢ় আচরণ করেছে। আর, আর প্রতিদানে সেই মানুষটি করেছে কি? প্রতিবারই করেছে তাকে ক্ষমা।

তার অন্তর অনুতাপে ভ'রে ওঠে। হৃদয় কেঁদে আকুলিবিকুলি করে। না, না, না, সে তার প্রতি অবিচার করেছে, অপরাধ করেছে। আজই, এক্ষুনি, হ্যাঁ, এক্ষুনি গিয়ে সে তার কাছে ক্ষমা চাইবে।

হেমা পথ পরিবর্তন করে। দেবনন্দন পাণ্ডের কাছে চলে।

যেতে যেতে ভাবে, হায়, কেন, কেন সে সকল সময়েই তার সঙ্গে অমন ব্যবহার করে? সে তার অন্তরে অনুসন্ধান করে, কারণ খুঁজে পায় না।

সত্যিই, এ এক হেঁয়ালি। দেবনন্দনকে হেমারও যে ভালো না লাগে তা নয়। তবু এমনি মজা, দেখা হলেই দুটো কথা তাকে না শুনিয়ে সে পারে না।

জমিদারবাড়ীর চৌহদ্দির ভেতরেই যদিও দরোয়ানদের ঘর, কিন্তু দেবনন্দন একটু একা থাকতে ভালোবাসে বোলে বিশেষ অনুরোধ কোরেই সে নিজের জন্যে প্রাসাদের বাইরে পেছনে একখানা ঘর বানিয়ে নিয়েছে।

হেমা একটু ঘুরে অন্য পথ দিয়ে যায়। যাতে কেউ না দেখতে পায়।

আর একটু গেলেই দেবনন্দনের বাসা।

"পাঁড়েজী! পাঁড়েজী!" সে ডাকে।

সাড়া পায় না।

অথচ দরজা খোলা, ভেতরে আলো জ্বলছে।

সে চারদিক চাইলো। কেউ যদি দেখে ফেলে? না, আশেপাশে কেউ নেই।

সে ভেতরে ঢোকে। আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে কে যেন তাকে ভেতরে টেনে নিয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় পাঁড়েজী? সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের জিনিসপত্র দেখতে থাকে। একপাশে খাটিয়ার ওপর বিছানা পাতা অপর পাশে মেঝেয় একটা পেতলের থালায় কিছু আটা তাল কোরে মাখা, পাশে একটা বাটিতে কিছু শব্জী কুঁচোনো। সে বুঝলো রান্নার জন্যেই পাঁড়েজী তৈরী হচ্ছিল, হঠাৎ বোধ হয় বাইরে কোন প্রয়োজন হোয়ে পড়ায় বেরিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই তাহোলে আশেপাশেই আছে।

সে ভাবলো আর তার থাকা ঠিক হবে না। এখনই যদি পাঁড়েজী এসে পড়ে?

এবং তাকে এ অবস্থায় এখানে দেখে? ইস্! কি ভাববে সে? না, না, আর এক মুহূর্তও না।

তাড়াতাড়ি সে বেরোতে যাবে এমন সময়ে দরজার সামনে দেবনন্দন পাণ্ডের সঙ্গে মুখোমুখী। বিরাট অনাবৃত বক্ষ, হাতে জ্বালানি কাঠ।

দুজনেই দুজনের দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকে।

অবশেষে দেবনন্দনই কথা কয়, বলে "হামার সঙ্গে কুছ্ দোরকার আছে হেমা?"

"না।"

"তোবে?"

লজ্জায় হেমার বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করতে থাকে। কি উত্তর দেবে সে? সত্যি বললে যে নিজের দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে!

শেষে সে মিথ্যার আশ্রয় নিল ঃ "এমনিই এসেছিলুম। এখান দিয়ে যাচ্ছিলুম কিনা. তাই ভাবলুম একবার—"

সে আর বলতে পারে না। তার গলা শুকিয়ে যায়।

"বহুত আচ্ছা! বহুত আচ্ছা। তা থোড়া বোসে যাবে না?"

"না, আমার কাজ আছে।"

"কাজ তো সোবারই থাকে।"

"না পাঁড়েজী, আমায় যেতেই হবে।"

"তুমি তো কোখ্খনো আসো না, তাই বোলছি।"

"আচ্ছা আব একদিন আসবখন। আজ বড্ড রাত হোয়ে গেছে। আজ যাই।"

"তা ঠিক। লোগ যদি দেখে কি বোলবে এই তো?"

"লোকের ভয় হেমা করে না।"

"তবে কেনো ও বাত বোলছো?"

"আচ্ছা মুশকিলেই পড়লুম তো।"

"আচ্ছা আচ্ছা, রাগ করছো কেনো? যাও।"

দেবনন্দন পথ ছেড়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে তাব ব্যথাকাতব অন্তর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

যেতে যেতে হেমা তা শুনতে পেল। জনহীন পথে চলতে চলতে সে ভাবে, মিছিমিছি অমন রূঢ় ব্যবহার না কোরে একটু বোসে এলেই তো হোত। সে তো তার কাছে তাব এই রূঢ় আচরণেব জন্যে ক্ষমা চাইবে বোলেই গিয়েছিল। সে বুঝতে পারে না কেন সে ভাবে একরকম আর কোবে বসে অন্যবকম। তার চোখে জল আসে।

হঠাৎ প্রতিবেশীরা দেখলো রমানাথের বাড়ী নতুন কোবে তৈরি হচ্ছে। জন দশবারো মজুর উপুড় হোয়ে পড়ে কাজ করছে—কেউ বাঁশ কাটছে. কেউ চালা খুলছে, কেউবা জিনিসপত্র একধার থেকে নিয়ে অপর ধারে রাখছে।

প্রতিবেশীরা বিস্ময়ে হতবাক। ঈর্ষায় ছটফট করতে থাকে অনেকে।

একজন কর্মচারী রোজ কাছারী থেকে একবার কোরে এসে দেখে শুনে যায়। রমানাথ তামাক খেতে খেতে তার সঙ্গে আলোচনা করেন।

রমানাথ আর এখন সে রমানাথ নেই। দুশ্চিন্তা ও বিষাদের কালিমা তাঁর মুখ থেকে সরে গেছে। সে জায়গায় এসেছে হাসি। সে জীর্ণ মলিন বসনও আর তাঁর পরনে নেই। তিনি যেন এক নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন।

বাড়ীর আর দুটি মানুষের জীবনেও এসেছে নতুন আশা, নতুন আলো, নতুন আনন্দ। চোখে নতুন স্বপ্ন নিয়ে নতুন কোরে ঘর গুছোতে তারাও যেন উঠে দাঁড়িয়েছে।

রমানাথ দেখলেন বাড়ীর সামনেটা দেখতে ভালো না। তা ছাড়া জমিদার যদি কখনো-সখনো আসেন? সেখানটায় বেড়া দিয়ে কিছু সুগন্ধি ফুলগাছ দেওয়ার ইচ্ছে হোল তাঁর।

একদিন তিনি মাটি কোপাচ্ছেন এমন সময় জমিদারের কর্মচারী উপস্থিত। কর্মচারীটি তাড়াতাড়ি তাঁর হাত থেকে কোদালটা টেনে নিয়ে কয়েকজন লোক লাগিয়ে দিল, তাঁর পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে।

ক্রমে রমানাথের ভাগ্যপরিবর্তনের খবরটা দূরেও ছড়িয়ে পড়লো। "শুনেছ হে, বমানাথেব মেয়েকে জমিদাব বিয়ে করছে?" হয়তো বা একজন আরেকজনকে বলে।

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"সে কি! ওর সঙ্গে যে ভয়ঙ্কর শত্রুতা ছিল।"

"সবই সম্ভব হে। সুন্দরী মেয়ে ঘবে থাকলে তুমিও জমিদারের শ্বশুর হোতে পারতে।"

"মেয়েটা তাহোলে এতই সুন্দরী?"

"দেখিনি ভাই, তবে শুনেছি অতো সুন্দর মেয়ে নাকি বাংলা মুল্লুকে আর নেই।"

"হুঁ?"

দেখা যায় যারা কোনদিন উঁকিও মারেনি তারাও এখন রমানাথের পাশে এসে ভিড় করছে।

সলিল চৌধুরীর বিয়ে শেষ হোলেও উৎসব ও আমোদপ্রমোদের শেষ হচ্ছে না—রোজই কিছুনা কিছু লেগেই থাকে, আজ অভিনয়, কাল নাচ ইত্যাদি।

অমরেশেরও বেশ আনন্দে দিন কাটছে। এখানে আসবার আগে সে এতোটা ভাবতে পারেনি। অবশ্য অত আনন্দের মধ্যেও সে সুমিত্রার কথা ভুলতে পারেনি!

প্রায়ই তাকে সে চিঠি লেখে। লেখে সে তাকে বিয়ে করবে এবং তাদেব বিয়েতে তারাও এমনি উৎসব করবে।

কিন্তু আর এখানে থাকা তার উচিত হচ্ছে না। আজ সকালে বাগানে বোসে চা খেতে খেতে সে সলিলকে বললে. "এবার আমায় ছেড়ে দে ভাই। হপ্তাখানেকের ওপর হোয়ে গেল।"

"দূর! তা কখনো হয়?"

সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে সলিল আপত্তি জানালো। তারপর সিগারেটের বাক্সটা বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললে, "আরও দুচারদিন থাক্। কেন, তোর কি ভালো লাগছে না?"

"খুব। এতো আনন্দে আছি যে সময়ে সময়ে বাড়ীর কথা ভুলেই যাই।"

"তবে?"

"বারে! তা বোলে যেতে হবে না? কাজ কর্ম—"

"সে তো তোর ম্যানেজারকাকা আছেন। আরও লোকজন রয়েছে।"

"লোকজনের ওপর নির্ভর কোরে কি বেশীদিন থাকা যায়? তোর হাতে এখনও ভার পড়েনি তাই বলছিস। আমারও মাথার ওপর যদ্দিন বাবা ছিলেন আমিও ঐরকম মনে করতুম।"

"কিন্তু অন্তত এই কটা দিন থেকে যা। বাবা এতো খরচা কোরে পার্টি দিচ্ছেন. গভর্নর আসছেন, আরও অনেক হোমরাচোমবা আসছেন. আইন সভার সদস্যরা, আমাদের জমিদার সংঘের সভাপতি, ওঁরাও আসছেন। এঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও তো করতে পারবি।"

"দ্যাখ্. এসেছি তোর বিয়েতে। যদি থাকি তো তোর জন্যেই থাকবো, হোমরাচোমরাদের জন্যে নয়।"

"আরে বোকা! তুই কি ভেবেছিস এসব মেলামেশায় লাভ নেই?"

"আমাব তো তাই মনে হয়।"

"দূর! তাহোলে লোকে আর এতো বড় বড় পার্টি দিতো না।"

"ওটা তোদের বোকামি, নিছক বাজে খরচা।"

"আদৌ না। জানিস আমার পিশেমশাই কি কোরে 'সার' উপাধি পেয়েছেন?"

"কি কোরে?"

"সোজা পাড়ি দিলেন ইংল্যাণ্ডে, সেখানে লাখ দুয়েক টাকা খরচ কোরে গোটা কতক পার্টি দিলেন, ব্যাস, ফেরবার সময়ে নামেব গোড়ায় 'সার' জুড়ে নিয়ে চলে এলেন।"

"তাতে লাভ?"

"তুই একটা আস্ত গাধা। কেবল ঘরের মধ্যে বোসে থাকবি তো এসব জিনিসের

ম্ল্য ব্ঝবি কি? আরে সম্মানই তো সব। মান্ষ সমাজে চায় কি? দহরম-মহরম, প্রভাবপ্রতিপত্তি। এই না?"

অমরেশ অস্বীকাব করতে পারে না। কথাটা তো ঠিক। তার বাবাও তো রাজা খেতাবের জন্যে কতো খরচ করেছিলেন।

"কি ভাবছিস?"

"ভাবছি তোর কথাটা। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস।"

"এতক্ষণ পরে মগজে ঢুকলো? শোন্ তবে বলি বাবা কি জন্যে পার্টি দিচ্ছেন।"

অমরেশ আগ্রহের সহিত শ্নতে থাকে।

সলিল বলে "মন্ত্রী হবার জন্যে।"

"হ্যাঁ?"

"শ্ধ্ মন্ত্রী নয়, ম্খ্যমন্ত্রী। শীগগিরই লাটসাহেব কয়েক মাসের জন্যে বিলেত যাচ্ছেন। ফিরে এলেই শ্নতে পাবি লাটসাহেব বাবাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে আহ্বান করেছেন।"

"তাই নাকি?"

অমরেশের ম্খেচোখে বিস্ময় আর ধরে না। এতো সম্ভাবনা রয়েছে এইসব জিনিসের মধ্যে! অথচ সে কোন খবরই রাখে না! নাঃ শহরে কয়েক বছর কাটালেও সে এখনও একেবারে গেঁয়োই রয়ে গেছে। ঠিকই বলেছে সলিল, সে একটা আস্ত গাধা।

মনে মনে সে বলে, এইভাবেই লোকে তাহোলে হোমরাচোমরা হয়!

সলিল বলে, "আমার কথা শোন্, বরং থেকে যা। লাটসায়েবের বৌ খ্ব মিশ্কে। দ্যাখ্, তাকে ধোরে কয়ে যদি একটা খেতাব টেতাব বাগিয়ে নিতে পারিস। তোর পাওয়াটা শক্ত হবে না। কেননা তোর বাবা গত য্দ্ধে সরকারকে অনেক সাহায্য করেছেন।"

অমরেশের হৃদয় এক অনাস্বাদিত সৌভাগ্যের সন্ধান পেয়ে যেন নেচে ওঠে।

"তা হোতে পারে?" সে জিগগেস করে।

"এ দ্নিয়ায় কিছ্ই আশ্চর্য নয় বন্ধ্।"

"কিন্তু লাটপত্নীর কি এতে হাত আছে?"

"থাকা কি অসম্ভব? প্রত্যক্ষ না থাকলেও পরোক্ষভাবে তো থাকতে পারে।"

"তার মানে?"

"অর্থাৎ গভর্নরপত্নী যদি গভর্নরকে বলেন গভর্নর ঠেলতে পারবেন না, আর গভর্নর যদি ওপরে স্পারিশ কোরে পাঠান, ব্যাস, আর বাধা কিসের? তবে এজন্যে তোকে কিছ্ খরচা করতে হবে।"

"সে তো বটেই। বেশ, আমি প্রস্তুত। তোকে ভাই ধন্যবাদ। আমি

তাহোলে থেকেই যাচ্ছি। কিন্তু আমায় তোকে সাহায্য করতে হবে। তুই এসব বিষয়ে দেখছি আমার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী ওস্তাদ।"

"কিন্তু আমায় কি দিবি বল্?"

"বল্ কি চাস্?"

"আচ্ছা আগে তো কাজ উদ্ধার হোক। ইতিমধ্যে তুই মনে মনে ঠিক কোরে রাখ্ কি চাইবি।"

"আমার তো মনে হয় বাবার যখন 'রাজা' ছিল আমিও তখন ন্যায্যত ঐ খেতাবেরই প্রার্থী হোতে পারি।"

"অর্থাৎ হোতে চাস রাজা অমরেশ রায়। তারপর হোয়ে গেলে? আর চিনতে পারবি না তো?"

"কি যে বলিস? আচ্ছা ভাই, তুইও তো তোর জন্যে কিছু একটা বাগিয়ে নিতে পারতিস। চেষ্টা করছিস না কেন?"

"একই সঙ্গে বাপ ও ছেলে দুজনের কি হয়? আমার পালা পরে।"

হঠাৎ এই সময়ে দূর থেকে শোনা গেল "নমস্কার মিস্টার চৌধুরী।"

দুজনেই সেইদিকে চাইলো।

"নমস্কার মিস অস্টিন।" সলিল প্রত্যভিবাদন জানালো।

"ও কে ভাই?" অমরেশ জিগগেস করে।

"মিসেস অস্টিনের মেয়ে।"

"তোর বিয়ে উপলক্ষে এসেছে বুঝি? কই এদ্দিন দেখিনি তো?"

"না। ওরা—"

বলা শেষ হোতে না হোতেই মিস অস্টিন এসে উপস্থিত হোল। সে হাঁপাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি চেয়ারের হাতলটা ধোরে ফেলে বললে, "ইনি কে মিস্টার চৌধুরী? আপনার বন্ধু?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনি হাঁপাচ্ছেন যে। এত জোরে এলেন কেন? বসুন।"

"আপনি জানেন তো ওটা আমার বদ্ অভ্যেস, আমি না ছুটে চলতে পারিনা। কিন্তু ও কথা এখন থাক্। আপনার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।"

"নিশ্চযই, নিশ্চযই। ইনি আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, নওগাঁর জমিদার, মিস্টার অমরেশ রায়, খুব শীগগিরই হবেন রাজা অমরেশ রায়।"

"তাই নাকি?" বলতে বলতে মিস অস্টিন তাড়াতাড়ি অমরেশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। করমর্দন করতে করতে বললে, "খুব সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে পরিচিত হোতে পারলুম রাজা অমরেশ রায়।"

"না না, এখনও মিস্টার রায়।" অমরেশ হাসতে হাসতে বললে।

"আর দুদিন পরে তো রাজা হবেন। ও একই কথা।"

সলিল বললে, "এইবার আয় অমরেশ, এ'র পরিচয়টা দি। এ'র নাম মিস জেন

অস্টিন। ওঁরা মাসছয়েক হোল এখানে এসেছেন। ওঁর মা মিসেস অস্টিন এখানে একটা ডেইরি করেছেন।"

"কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি ওঁর বাংলা কথা শুনে। কি কোরে উনি এমন শুদ্ধ উচ্চারণ আয়ত্ত করলেন?"

"হি হি হি! আমরা তো বাঙলীই রাজা রায়। আমার গ্র্যান্ডমাদার ছিলেন বাঙালীরই মেয়ে।"

"বটে!"

মুগ্ধ দৃষ্টিতে অমরেশ তার দিকে চেয়ে থাকে। তার মুখে বারবার 'রাজা' কথা শুনতে তার খুব ভালো লাগছিল। যে জিনিসের প্রতি কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তার নজরই ছিল না, হঠাৎ যেন তার প্রতি লোভ তাকে পেয়ে বসলো। মনে মনে সে ভাবতে লাগলো, না, না, এ সুযোগ ছাড়া চলবে না, তাতে যত টাকা লাগুক। আর একটা জিনিসের দিকেও তাকে নজর দিতে হবে। এবার থেকে পাঁচটা সোসাইটিতে মিশতে হবে। না হোলে দেখা যাচ্ছে তাকে অন্ধকারেই থেকে যেতে হবে।

"কি অত ভাবছিস?" তার চিন্তাধারায় বাধা দিয়ে সলিল জিগগেস করে।

"না, কিছু না।"

"মিস অস্টিনকে তোর খুব ভালো লেগেছে, না?"

হঠাৎ এই সময়ে একজন ভৃত্য এসে দাঁড়ালো। সলিল তার দিকে চাইতেই সে জানালো তার শালীরা তাকে ডাকছেন।

সলিল তটস্থ হোয়ে উঠলো।

"ও? আচ্ছা, আমি এখনই যাচ্ছি।" বলতে বলতে সে দাঁড়িয়ে উঠলো। তারপর : "মিস অস্টিন, আপনি কিছু মনে করবেন না আমায় এখনই যেতে হচ্ছে বোলে। আপনি বরং ততক্ষণ বসে বসে আমার বন্ধুর সঙ্গে একটু গল্প করুন। অমরেশ, তুইও ভাই যদি কিছু মনে না করিস—"

"না, না, ঠিক আছে, তুই যা।"

"হ্যাঁ। হ্যাঁ। ঠিক আছে।" প্রতিধ্বনি করলো মিস অস্টিন।

সলিল চলে গেল।

"কি সুন্দর সকালবেলাটি!" জেন শুরু করলো।

"হ্যাঁ, খুব," অমরেশ জবাব দিল।

"আচ্ছা রাজা?"

"কি বলছেন?"

"আপনার বন্ধুর কথা কি ঠিক?"

"কি কথা?"

"ঐ যে উনি বললেন আপনার নাকি আমাকে ভালো লেগেছে।" বলতে বলতে জেন উঠে গিয়ে তার পাশে বোসে হি-হি কোরে হাসতে লাগলো।

জেনের মোমের মতো মসৃণ দেহ, তার রেশমী চুল, তার নীল চোখ অমরেশকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। তার ওপর তার নিজের মুখে এই প্রশ্ন, এই সান্নিধ্য অমরেশের সারা অন্তর যেন মদিরায় ভরিয়ে দিল।

এ আকর্ষণ সে উপেক্ষা করতে পারলো না। তার উরুতে হাতের একটু চাপ দিয়ে সে বললে, "যদি বলি হ্যাঁ?"

"কত না সুখ, কত না আনন্দ তা হোলে হবে আমার!" বলতে বলতে সে অমরেশের ঘাড়ে মাথাটি রাখলো।

অমরেশের সমস্ত রক্ত যেন চনচন কোরে উঠলো। সে নিজেকে আর ধোরে রাখতে না পেরে চুমোয় চুমোয় তার মুখখানা ভরিয়ে দিলো।

কিছুক্ষণ পরে জেন বলে, "এখানে কেউ এসে পড়তে পারে। চলো, পেছন দিকে খুব গাছপালা আছে, সেই দিকে যাই।"

"তাই চলো।"

সারাদিন পরে সন্ধ্যার সময়ে গাড়ীবারান্দার নীচে যখন আবার দুই বন্ধুতে দেখা, সলিল বললে, "কি রে? কোথায় ছিলি? কি ব্যাপার?"

"ব্যাপার আর কি, সকালে সেই তো তুই বাগানে আমাদের রেখে চলে এলি, তারপর মিস অস্টিনের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে একেবারে ওদের বাড়ী। মিসেস অস্টিন ছাড়লেন না। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে সারাদিন কাটিয়ে এই ফিরছি।"

"তা ভালো। আমি ভাবলুম বুঝি চলেই গেলি?"

"না, না, সে কি হয়?"

"তারপর এখন কি করবি বল্।"

"গাহাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম করবো ভাবছি।"

"বেশ, আমি চাকরকে বোলে দিচ্ছি।"

"হ্যাঁ ভাই, তাই দে।"

"আমি তা হোলে এখন বাগানেই আছি। শালীদের নিয়ে একটু বেড়াচ্ছি। ইচ্ছে করিস তো তুইও আসতে পারিস। আসবি নাকি?"

"ও। আচ্ছা, দেখি। না। থাক্। তুই বরং একটু দাঁড়া, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।"

"কথা?"

"হ্যাঁ। আমায় হাজার পাঁচেক টাকা দিবি?"

"বেশ তো, হবে'খন। তাড়া কিসের?"

"না, এক্ষুনি।"

"তোর সবই অদ্ভুত। হঠাৎ এমন সময়ে এতো টাকা নিয়ে কি করবি?"

"দরকার আছে।"

সলিল আর কথা বাড়ায় না, 'না'ও করতে পারে না। তার মনে পড়ে পঠদ্দশায় কোলকাতায় থাকাকালে সেও যখনই অমরেশের কাছে হাত পেতেছে অমরেশ কথাটি না কয়ে তার অনুরোধ রক্ষা করেছে। এখন সে যদি অন্যরকম আচরণ করে, সেটা ভালো দেখায় না।

"বেশ, আমি চাকর ও টাকা এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি," বলতে বলতে সে চলে গেল।

পরদিন বেলা আন্দাজ এগারোটা হবে। নাচঘরের সামনে সলিল দাঁড়িয়ে। নাচঘর মেরামত হচ্ছে। মিস্ত্রিদের সঙ্গে সে আলোচনায় ব্যস্ত এমন সময়ে মিসেস অস্টিন উপস্থিত।

"গুড মর্ণিং।"

"গুড মর্ণিং।"

"আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে মিস্টাব চৌধুরী।"

"বলুন।"

"দয়া কোরে যদি একটু এধারটায় আসেন?"

"ও আচ্ছা, এক মিনিট তা হোলে।"

"ঠিক আছে। আমি দাঁড়াচ্ছি। আগামী নাচের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন বোধ হয়?"

"হ্যাঁ।"

"শুনলুম নাকি গভর্নর আসছেন?"

"হ্যাঁ।"

"সস্ত্রীক?"

"হ্যাঁ।"

"আপনাদের নাচঘরটি কিন্তু খুব চমৎকার। আচ্ছা, আর না, আপনি সেরে নিন। আমি এধারটায় অপেক্ষা করছি।"

একটু পরেই সলিল তাঁর কাছে এগিয়ে গেল।

মিসেস অস্টিন শুরু করলেন, "এটা কি ঠিক হচ্ছে মিস্টার চৌধুরী?"

"কোন্‌টা মিসেস অস্টিন?" বিস্মিত হোয়ে সলিল জিগগেস করলো।

"এই আপনার বন্ধুর ব্যবহার।"

"বন্ধুর ব্যবহার!"

সলিল এবার বুঝতে পারলো কার কথা মিসেস অস্টিন বলছেন। তার মনে পড়লো অমরেশের ব্যাপারটা। কাল সন্ধেব পর থেকে অমরেশের সঙ্গে আর তার দেখাই হয়নি। রাত্রে খাবার সময়েও না, আর আজ সকালেও না। বাগানে, বাড়ীতে, আশেপাশে অনেক জয়গায়ই সে খুঁজেছে—কোথাও না। তার ধারণা হোয়েছিল ছেলেটা

নিশ্চয়ই জেনের প্রেমে পড়েছে ও তার সঙ্গেই কাটাচ্ছে। এখন মিসেস অস্টিনের অভিযোগে তার সেই ধারণাই বদ্ধমূল হোল।

দুজনেই নীরব।

অবশেষে সলিলই মুখ খুললো, বললে, "বন্ধু কি করেছে?"

"অবিশ্যি এজন্যে আমার মেয়েটাই দায়ী। কিন্তু তা হোলেও বলবো অভিজাত ঘরের সন্তান আপনারা, আপনাদের কি—"

"আমি বুঝতে পারছি না মিসেস অস্টিন আপনি কি বলতে চান। আমার বন্ধু কি করেছে অনুগ্রহ কোরে খুলে বলুন।"

"শুনুন তবে। কাল রাত্তির থেকে উনি আমার বাড়ীতে বোসে। কেবলই মদ খাচ্ছেন আর হৈ-হুল্লোড় করছেন। করতে করতে আজ সকালে করেছেন কি, আমার প্রায় পাঁচ মণ দুধ উল্টে দিয়েছেন। এখন বলুন তো আমি কি করি? আপনি তো জানেন আমি গরীব মানুষ।"

মিসেস অস্টিন কাঁদতে লাগলেন।

"কিন্তু তার জন্যে আমার কাছে—"

"আপনার কাছে না এসে আমি কি করতে পারি বলুন? আপনারা হলেন আমার জমিদার। আমি প্রথমে ভেবেছিলুম আপনার বাবাকেই জানাবো কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম উনি যখন আপনার বন্ধু তখন আগে আপনাকেই জানানো দরকার।"

"না, না, বাবার কাছে না গিয়ে ভালোই করেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে উনি আমার বন্ধু বোলে যে আপনার ক্ষতি করবেন তা হোতে পারে না। আপনি যান, ওঁর কাছ থেকে খেসারৎ আদায় কোরে নিন।"

"আমি সেইজন্যেই আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি। কিন্তু মজা এই যে কাল রাত্তিরে কয়েকজন জুয়াড়ের পাল্লায় পড়ে বেচারি তার কাছে যা ছিল সব খুইয়েছে।"

"কত ছিল?"

"তা অন্তত হাজার পাঁচেক।"

"সে কি!"

"আমি তো আগেই বলেছি এজন্যে আমার ঐ শয়তান মেয়েটাই দায়ী। মেয়েটার কয়েকটা জুয়াড়ে বন্ধু আছে। তারা প্রায়ই আসে আর জুয়া খেলে। কালও তারা এসেছিল। তাদের সঙ্গে জুয়া খেলতে গিয়ে আপনার বন্ধুর এই দুর্দশা।"

সলিল এখন বুঝতে পারলো কেন গত সন্ধ্যায় হঠাৎ অমরেশের পাঁচ হাজার টাকাব দরকার হয়েছিল। কিন্তু ভেবে আর কি হবে? ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে নেওয়া দরকার। তা না হোলে মিসেস অস্টিন ছাড়বে না, তার বাবার কাছে যাবে। হয়তো চারদিকে এ নিয়ে রটিয়েও বেড়াবে আর ফলে লোকে খুব হাসাহাসি করবে। তাতে শুধু তো বন্ধুরই দুর্নাম হবে না, হবে তারও। তার খুব রাগ হোল।

এতোটা অসংযম কি ভালো? কিন্তু উপায় কি? রাগ চেপে সে বললে, "আপনার ও দুধের দাম কতো?"

"টাকায় দু'সের কোরে হোলে পাঁচ মণের দাম দেখুন না হিসেব কোরে।"

"এক মণে কুড়ি টাকা, পাঁচ মণ একশো টাকা।"

"তাই হবে।"

"আচ্ছা দাঁড়ান, আমিই দিয়ে দিচ্ছি টাকাটা।"

"আপনি দেবেন? আপনাকে হয়তো একটু বেশীই বিরক্ত কোরে বসলুম মিঃ চৌধুরী। অনুগ্রহ কোরে অপরাধ নেবেন না।"

"না, না। কিছু না।" বলতে বলতে সলিল টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বুকপকেট থেকে ফাউণ্টেন পেনটা বার কোরে এক টুকরো কাগজের ওপর কি লিখলো, তারপর মিসেস অস্টিনকে দিয়ে বললে, "ম্যানেজারবাবুর কাছে এটা নিয়ে যান, তিনি আপনাকে টাকটা দিয়ে দেবেন।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার চৌধুবী। তবে জানবেন, আমার যদি অবস্থা ভালো হোত আমি কখনোই আপনাকে এভাবে বিরক্ত কবতে আসতুম না।"

"ঠিক আছে, মিসেস অস্টিন।"

মিসেস অস্টিন বিদায় নিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল অমরেশকে। তার পা টলছে, চুল উস্কোখুস্কো, চোখ লাল, মদের নেশা তখনও পুরো মাত্রায়।

আশপাশে লোকজন খাটছে। তাদেব সামনে বন্ধুকে এ অবস্থায় দেখে সলিলের লজ্জা হোতে লাগলো।

পাছে চেয়ার টানতে গিয়ে পড়ে যায় ও একটা নাটকীয় দৃশ্যের সৃষ্টি কোরে বসে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সে চেয়ারখানা এগিয়ে দিলো।

টলতে টলতে অমরেশ বসলো।

"শেষ পর্যন্ত একটা জুয়াড়ে হোযে উঠলি?" চাপা গলায সলিল ভর্ৎসনা করলো।

"জুয়াড়ে তো আমরা সব্বাই বাবা।"

সলিল রাগে গুম হোযে বইলো।

কিন্তু বেশীক্ষণ সে নিজেকে চেপে রাখতে পারলো না। বললে, "কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই তো স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু জ্ঞান থাকা দরকার।"

"তা ঠিক।"

"তার পরিচয় কি দিলি ভেবে দ্যাখ্ তো?"

অমরেশ চুপ কোরে রইলো। বোধ হয় এইবাব সে একটু আত্মসচেতন হোয়ে উঠেছে।

সলিল বলতে লাগলো, "আমরা হলুম সমাজের অভিজাত শ্রেণী। আমাদের

চালচলনে আভিজাত্য ফুটে উঠবে না? আসল জিনিস তো ঐটা। এইখানেই তো সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য। জুয়া খেলো, মদ খাও, যা খুশী কেন করো না, জীবনকে ষোল আনাই উপভোগ করো, তাতে কিছু যায় আসে না, কেবল দেখতে হবে আভিজাত্য বজায় রেখে সেটা করছো কিনা।"

"বাঃ! বাঃ! তোর লেকচারটা অনেকটা আমাদের সেই কলেজের প্রফেসার দাসগুপ্তের লেকচারের মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস। আমিও এই আদর্শ মেনে সাধারণত চলে থাকি। তবে—"

"তবে কি?"

"বাঁধা গরু ছাড়া পেলে অনেক সময়ে একটু বেশী দূরই চলে যায়। তুই যাস না?"

সলিল দেখলো আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং নিজের কাজে মন দেওয়াই ভালো।

একজন মিস্ত্রিকে ডেকে সে বললে, "সামনের দরজার পালিশটা এখনও ঠিক হয়নি। বুঝতে পারছো বোধ হয়। এমন করতে হবে যেন ঠিক আরশির মতো হয়, মুখ দেখা যায়।"

"যে আজ্ঞে।" মিস্ত্রি আবার হাত চালাতে লাগলো।

ওদিকে অমরেশ চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। এইবার যেন সে আরও একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছে। সংকোচের সহিত বললে, "সব তা হোলে প্রস্তুত?"

"হ্যাঁ।" শুষ্কভাবেই সলিল উত্তর দিল।

তারপর কিছুক্ষণ দুই বন্ধুই নীরব

হঠাৎ অমরেশ সলিলের হাতখানা চেপে ধোরে বলে, "তুই কি ভাই আমার ওপর রাগ করলি?"

"দূর! চল্ বরং এবার বাড়ী যাওয়া যাক। অনেক বেলা হয়েছে।"

পথে যেতে যেতে সলিল বলে, "গভর্নর রাত্তিরটা এখানেই কাটিয়ে যাবেন বোলে জানিয়েছেন।"

"তাই নাকি? বেশ হবে। আমার বিষয়টা তা হোলে—"

"হ্যাঁ, মনে আছে। বাবার সঙ্গেও কথা কয়ে রেখেছি।"

"বটে! বটে! তোকে ভাই সহস্র ধন্যবাদ।"

"কিন্তু তুই এখনও টলছিস।"

অমরেশ লজ্জা পায়। আরও ঠিকভাবে পা ফেলবার চেষ্টা করে।

চৌধুরীদের বিখ্যাত নাচঘরে নাচ হবে। কথাটা চারদিকে খুব ছড়িয়ে পড়েছে। ক'দিন ধোরে লোকের মুখে কেবলই এই কথা। হাটে বাজারে পথে ঘাটে মাঠে সর্বত্র।

দুপুর উৎরে গেছে। কয়েকজন চাষীকে হাটে বেচাকেনা সেরে নৌকো কোরে

ফিরতে দেখা যাচ্ছে। অধিকাংশেরই কোঁচড়ে মুড়ী ফুলুরী। তারা খাচ্ছে আর গল্প করছে।

"বলি অ মোড়ল, বাবুদের বাড়ী নাচ দেখতে যাচ্ছো তো?"

"আরে দূর! ঘরে জোটে না অন্ন, আবার লাচ!"

"আরে ও তো বারো মাস আছেই।"

নৌকো ঠেলতে ঠেলতে মাঝির পো যোগ দিল, "শুনছি নাকি এবার খুব ভালো লাচ হবে গো।"

তাদের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে একজন প্রৌঢ়া বোলে উঠলো, "হ্যাঁ গা ছেলেরা, শুনছি নাকি নাট সায়েব আসবে?"

"হ্যাঁ গো। নাটসায়েব আসছে, নাটসায়েবের বৌ আসছে, আরও সব অনেক বড় বড় নোকও আসছে।"

মোড়ল "তুমি তো দেখছি অনেক খবরই রাখো। সেদিনের লাচ দেখেছিলে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন হোয়েছিল?"

"খুব সুন্দর।"

"আরে রাখো!" দাড়িওলা মাঝারি বয়সের লোকটি বোলে উঠলো। তারপর কোঁচড়ের ভুক্তাবশেষ নদীর জলে ফেলে দিতে দিতে সে বলে, "ওসব ছেলে-ছোকরাদেরই কাছে ভালো। কেন বলো? সোমত্ত বয়সের এক ছুঁড়ি আধখানা বুক খুলে কোমর থেকে একটুখানি নীচে পর্যন্ত ঘাঘরা না কি বলে পরে ঘুরে ঘুরে সে কি কাণ্ডটাই না করতে নাগলো। নাচছে আর কেবলই ঘাঘরাটা ওপরের দিকে তুলছে। আরে বাপু তার চেয়ে একেবারেই খুলে ফেলে দে না। ছিঃ ছিঃ! চার-দিকে লোকে গিজগিজ করছে। সরম বোলে একটা কিছু নেই! আমি তো আর দেখতে না পেরে পালিয়েই এলুম।"

সকলে হো-হো কোরে হেসে উঠলো। দুজন কৃষকবধূ ওদের সঙ্গে ছিল। লজ্জায় তারা ঘোমটার আড়ালে মুখ লুকোলো।

"তুমি দেখছি জনাদ্দনদা বড্ড সেকেলে। হাওয়া কি বরাবর একই রকম থাকবে?" বক্তাকে উদ্দেশ কোরে মাঝির পো বললে।

"তা বাপু তোমরা যাই বলো, ওসব বড়লোকদেরই পোষায়। আমাদের ঘরে—"

"আমাদের ঘরে হবে কি কোরে? ভগবান তো আমাদের ফুর্তি করতে দেয়নি।"

আরেকজন: "তার কারণ ফুর্তি করতে ওরাই জানে। এই দ্যাখো না ছেলের বিয়েতে কি কম ট্যাকাটা খরচ করলে?"

"তা হোলেই বোঝ।"

"কিন্তু ও টাকা ওরা পেল কোত্থেকে? বলে এতো খেটেও আমরা দুবেলা

দুমুঠো জোটাতে পারিনে, আর চেয়ে দেখ দিকি, আমাদেরই টাকায় মদ নিয়ে, মাগী নিয়ে কি ফুর্তিটাই না করছে।”

নৌকো ঘাটে এসে ভিড়লো।

মাঝির পোর হাতে পেরোনি পয়সা দিতে দিতে সবাই নামতে লাগলো। মোড়ল বললে, “এতো তো বাক্তিমে তুমি দিলে জনার্দন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখো সারা দেশসুদ্ধু লোক যাবে দেখতে।”

“না গো, বাবুরা বলেছে এবার কাউকে ঢুকতে দেবোনি,” মাঝির পো বললে।

“কি কোরে আটকাবে শুনি?

“পাহারাওলা বসাবে।”

“কি বললে?”

“পাহারাওলা বসাবে।”

মাঝির পোব কথা শেষ না হোতেই সকলে অবাক হোয়ে দেখলো বাঁধের ওপর দিয়ে কয়েকজন সেপাই জমিদাববাড়ীব দিকে চলেছে।

সত্যিই এমন নাচঘর বাংলা মুল্লুকে আর দুটি নেই। অপূর্ব কারুকার্য। চারদিকে বাগান, ফোয়ারা, কৃত্রিম পাহাড, আলো হাসি, বর্ণছটা। আর সেই বর্ণাঢ্য পরিবেশের মধ্যে চলেছে নাচ, নাচের তালে তালে বাজনা।

নিমন্ত্রিত হোয়ে এসেছেন বাছা বাছা অভিজাত ঘরের নরনাবী। আব এসেছেন বিদেশীরাজেব স্বজাতীয়-স্বজাতীযাবা। ব্যস, আর কেউ না। কারন এ জলসা শুধু তাঁদেব জন্যে, এখানে তাঁরাই শুধু আমন্ত্রিত। সাধারণ মানুষকে ডাকা তো দূরের কথা, ঢুকতেই দেওয়া হয়নি, তারা অপাংক্তেয়।

অবশ্য তা সত্ত্বেও অপাংক্তেয়দের দু'দশজন দুষ্টুমি কোরে আগে থেকেই কোন-রকমে ঢুকে পড়েছে। আডালে আবডালে দাঁড়িয়ে, অথবা গাছেব মাথায় বোসে তারা দেখছে।

রঙবেবঙের পোশাক-পরা দেশী ও বিদেশী মেয়েবা যেন স্বর্গেব অপ্সরা। পুরুষদেরও বেশভূষা বড কম বৈচিত্র্যময ও মনোবম নয়।

নাচ চলেছে।

সবাই যে নাচ দেখছে তা নয়। কেউ হাই তুলছে, কেউ রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে, আবার কেউ পার্শ্ববর্তী কোন পুরুষ বা মহিলাব দিকে আড়চোখে চাইছে। মাথার ওপব ঘুরছে পাখা, কানে বাজছে যন্ত্রসঙ্গীত, চোখের সামনে নাচ। সৌন্দর্য যেন ফুলঝুরির মতো ঝরে ঝরে পড়ছে।

হঠাৎ কিন্তু ডাইন্যামোটা বাদ সাধলো। সঙ্গে সঙ্গে আলো নিবলো, পাখা বন্ধ হোয়ে গেল।

অগত্যা অন্ধকার নাচঘর থেকে দর্শকরা দলে দলে বেরিযে আসতে লাগলেন।

তাঁদের মধ্যে আছেন লাটসাহেব, লাটসাহেবের বৌ, আছেন আইন সভার সদস্যরা, বাংলার বিখ্যাত জমিদার ও ব্যবসায়ীরা, আর তাঁদের বৌঝিরা।

আকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলো বাগানময়। বৈদ্যুতিক আলো নিবে যাওয়ায় সে আলো আরও রহস্যময়, আরও স্বপ্নময় হোয়ে উঠেছে।

প্রত্যেকেরই আফসোস এমন ভালো নাচটা পণ্ড হোয়ে গেল বোলে। সলিলের পিতা সুব্রত চৌধুরী তো পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে লাগলেন। শেষে মিস্ত্রিদের নিয়ে তিনি ডাইন্যামোটার ওপর উপুড় হোয়ে পড়লেন। কিন্তু কিছুতেই যন্ত্রটাকে আর ঠিক করা গেল না।

বাগানের এখানে ওখানে বেতের চেয়ার ও গোল টেবিল পাতা। দুজন চারজন কোরে এক একটি ক্ষুদ্র দলে।

কোলকাতাব একটি বিখ্যাত বিলিতী হোটেলেব ওপব খাওযা-দাওয়ার ভার। খানা বিলিতী। বিলিতী খানা রাজার খানা। কাজেই অভিজাত মহলে বিলিতী খানারই কদর বেশী। শুধু বিলিতী খানাই বা বলি কেন, বিলিতী বুলি বিলিতী পোশাক, বিলিতী আদবকাযদা, বিলিতী হাবভাব, বিলিতী ধরনে চলা বলা দাঁড়ানো, সবেরই বেশী মূল্য এদেব কাছে। অকৃপণ ভাবেই এবা এগুলি অনুকরণ কোরে চলে এবং এতে গর্ব অনুভব করে। পবাধীনতা ও অনুগ্রহলাভেব ইচ্ছা মানুষকে এমনই ব্যক্তিত্বহীন কোবে ফেলেছে।

ক্রমে চাঁদ উঠলো মাথার ওপর। ওদিকে হোটেলের সুসজ্জিত ভৃত্যরা যথাবীতি পানীয় পরিবেষণ কোরে চলেছে।

হঠাৎ লাটসাহেব বোলে উঠলেন "এমন সুন্দব জ্যোৎস্নায় বোসে ওবা তো বাজাতে পারে?"

সঙ্গে সঙ্গে লাটসাহেবের আদেশ পালিত হোল।

গানের পর গান বেজে চলেছে আব সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হোযে শুনছে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল চাঁদ পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে।

আর নয়, এই সময়। অমরেশকে সঙ্গে নিয়ে সলিল চলেছে লাটসাহেবের বৌয়ের কাছে।

ওদিকে লাটসাহেব, আইন সভাব সদস্যরা ও তার পিতা সকলে মিলে একটা প্রশস্ত জায়গায় গোল হোয়ে বোসে। তাঁদের সভা চলছে।

"আবার তা হোলে শীগগির একটা পার্টি দিচ্ছিস বল্?" অমরেশ বলে।

"কি জন্যে"

"তোর বাবা মুখ্যমন্ত্রী হোলে?"

"ও নিশ্চয়ই। তোকেও তো দিতে হবে।"

"আগে খেতাব পাই তবে তো?"

"পাবি, পাবি, নিশ্চয়ই পাবি।"

"না আঁচালে বিশ্বাস নেই।"

"বেশ, বাজী রাখ্, যদি পাস্?"

"পঁচিশ হাজার টাকা।"

"বহুত আচ্ছা। মনে থাকে যেন।"

"নওগাঁর রায়েরা কখনো কথার খেলাপ করেছে শুনেছিস?"

"কক্খনো না! কিন্তু গভর্নরপত্নী গেলেন কোথায়? চল্ দেখি ওধারটায় যাই।"

এঁকে বেঁকে, লাফিয়ে লাফিয়ে তারা চলতে থাকে।

যেতে যেতে দেখে কেউ মদের নেশায় ঢুলছে, কেউ গুন্‌গুন্ কোরে গান গাইছে। একটা ঝোপের মধ্যে চোখ পড়তেই দেখতে পেল এক বাঙালী যুবক এক ইংরেজ তরুণীকে জড়িয়ে ধোরে চুমু খাচ্ছে। তারা সরে গেল।

সলিল বললে, "কে চিনতে পেরেছিস?"

"খুব। রাজা সূর্যনারায়ণের ছেলে আদিত্যনারায়ণ।"

"ও কিন্তু বরাবরই ঐরকম।"

"সেদিক দিয়ে বিচার করলে আমরা সবাই তো তাই।"

"তা ঠিক।"

"তবে তুই নতুন বিয়ে করেছিস, তোকে এখন একটু সামলেসুমলে চলতে হবে। কিন্তু কি ব্যাপার? লাটসাহেবা কি তা হোলে চলেই গেছেন?"

"উঁহু। সে হোতে পারে না। হয়তো আরে! এই যে!"

"কই?"

"এই যে।"

অমরেশ দেখলো সামনেই একটা পামগাছের তলায় বেতের চেয়ারে বোসে এক ইংরেজ মহিলা। হাতে তাঁর রঙীন পানীয়।

"উনি?" সে জিগগেস করলো।

"হ্যাঁ।"

"আর সামনের ঐ মেয়েটি?"

"ওঁরই মেয়ে।"

তারা ইতস্তত করছে এমন সময়ে গভর্নরপত্নী তাদের দেখতে পেয়ে বোলে উঠলেন, "কে? চৌধুরী না? আরে, এসো এসো।"

দুই বন্ধুতে এগিয়ে গেল।

সলিল অমরেশকে লাটপত্নীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে।

ক্রমে আলাপ জমে উঠলো।

সলিল প্রশ্ন করলো, "কেমন লাগছে আপনার?"

"চমৎকার!" লাটপত্নী উত্তর দিলেন। তারপর প্রসঙ্গক্রমে বললেন, "ভারতবর্ষ আমার বরাবরই খুব ভালো লাগে। ভারতবাসীদের আমি শ্রদ্ধা করি, আমার স্বামীও।"

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, "তোমরা সত্যিই খুব সুন্দর জাত। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে তোমরা বড্ড পেছনে পড়ে রয়েছ। অবিশ্যি পরিবর্তন তোমাদের মধ্যে আসছে। আর তা আসছে আমাদেরই সংস্পর্শে এসে।"

হাসতে হাসতে সলিল বললে, "আপনাদের সংস্পর্শে এসে, কি যুগধর্মের তাগিদে, সে কথা পরে ঐতিহাসিকরাই ঠিক বলতে পারবেন।"

লাটপত্নী ক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু বাইরে কিছু প্রকাশ করলেন না। মুখে হাসি মাখিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, তা বলতে পারো।"

তারপর একথা ওকথা হোতে হোতে সুব্রত রায়ের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কথা উঠলো।

"হ্যাঁ, উনি যে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই," লাটপত্নী মন্তব্য করলেন।

"এবার শীতকালটা কি তা হোলে আপনি ইণ্ডিয়াতেই কাটাবেন?" সলিল প্রশ্ন করলো।

"না, আমি এবার একটু ঘুরতে বেরোবো। প্রথমে যাবো ফ্রান্সে। সেখানে আমার বড় মেয়ের কাছে সপ্তাহ দুয়েক থাকবো। তারপর যাবো হোমে। রাজার জন্মদিনটা ওখানেই কাটাবো। তারপর আমেরিকায়।"

"খুব লম্বা প্রোগ্রাম বলুন।"

লাটপত্নী মৃদু হাসলেন।

সলিল বললে, "আচ্ছা, একটা কথা জিগগেস করতে পারি কি? এবাব রাজার জন্মদিনে বাংলা থেকে কোন্ কোন্ ভাগ্যবান খেতাব পাচ্ছেন?"

"অনেকেরই তো নাম যাচ্ছে শুনেছি।"

"আমি একটা অনুরোধ করবো? যদি আশা দেন তো বলি।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চযই। তোমার অনুরোধ রাখতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো চৌধুরী।"

"যাঁদের নাম যাচ্ছে তাঁদের তালিকায় যদি আমাব এই বন্ধুটির নামও—"

"ও? আচ্ছা, আচ্ছা, আমি চেষ্টা করবো। উনি কি চান? রাজা?"

"সেইটেই তো স্বাভাবিক। ওঁর বাবারও ছিল রাজা খেতাব।"

"কি নাম বললে ওঁর বাবার?"

"রাজা নিখিলেশ রায়।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বটে রাজা নিখিলেশ রায় খুব সুন্দর লোক ছিলেন।

বাংলার মহৎ ব্যক্তিদের অন্যতম। গত যুদ্ধে তিনি অনেক কাজ করেছেন।"

"সুতরাং তাঁর ছেলের এ দাবী আদৌ অসঙ্গত নয়?"

"নিশ্চয়ই না। নিশ্চয়ই না। অল রাইট, আমি কথা দিচ্ছি চেষ্টা করবো।"

"আপনি চেষ্টা করলেই হবে। ওপর তলায় আপনার প্রভাব তো বড় কম নয়!"

"কিন্তু তোমার বন্ধু তো কোন কথা কইছেন না? আমি যে চেষ্টা করবো সেজন্যে উনি আমায় কি দেবেন?" নিঃসঙ্কোচে হাসতে হাসতে বললেন লাট-সাহেবের বৌ।

সলিল অমরেশের দিকে চাইলো।

পরম উৎসাহে অমরেশ বোলে উঠলো, "আপনাকে উপহার দিতে পারবো এ তো আমার সৌভাগ্য।"

"বেশ। তা হোলে শুনুন। হ্যামিলটনের বাড়ী কাল আমরা একটা নেকলেস দেখে এসেছি। আমার মেয়ের সেটা খুব পছন্দ হয়েছে। সেই নেকলেসটা—"

"বেশ! বেশ! এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে?"

আরও দু'এক টুকরো কথাবার্তার পর ঠিক হোল কালই লাটসাহেবেব মেয়েকে নিয়ে দুই বন্ধু হ্যামিলটনের বাড়ী যাবে।

তারা গা তুললো।

যেতে যেতে সলিল বললে, "কাজ একরকম হাসিল ধোরে নিতে পারিস।"

কৃতজ্ঞতাভরে অমবেশ বললে, "আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু কি কোরে ভাই তুই এমন কোরে কথা বলতে শিখলি? আমি তো অবাক বনে গিছলুম। প্রথমটা ভেবেছিলুম, বুঝি তুই আসল কথা ভুলেই গেছিস। তারপর দেখলুম, নাঃ একথা সেকথা কইতে কইতে কতো সহজেই না ভদ্রমহিলাকে একেবারে কাজের কথায় টেনে নিয়ে এলি! ঠিক যেন যাদুকর। সত্যিই ভাই এ ক'দিনে তোর কাছে অনেক কিছুই শিখলুম।"

"রাখ্ এখন আমার প্রশস্তি। সারাদিন তো অনেকেরই আরাধনা হোল। এখন চল্ গিয়ে বরং একটু নিদ্রাদেবীর আরাধনা করা যাক।"

সলিল হাই তুলতে লাগলো।

যেতে যেতে তারা দেখলো অধিকাংশ অতিথিই ঢুলছে। কেবল লাটসাহেবকে ঘিরে সলিলের বাবা সুব্রত চৌধুরী ও আরও কয়েকজন তখনও আলোচনায় মগ্ন।

বিখ্যাত গহনাবিক্রেতা হ্যামিলটনের দোকান। লাটকন্যাকে নিয়ে দুই বন্ধু হ্যামিলটনের দরজার সামনে নামলো।

লাটসাহেবের গাড়ী দরোয়ান চেনে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে লম্বা সেলাম কোরে সে মাননীয় খরিদ্দারদের দরজা খুলে দিল।

কর্মচারীরা ছুটে এল। খুব খাতির কোরেই তারা তাদের বসিয়ে মণিরত্নখচিত নানারকম গহনা দেখাতে লাগলো।

খবর পেয়ে খোদ ম্যানেজারও ছুটে এলেন।

লাটদুহিতা বললেন, "গত কাল আমি যে হারটি পছন্দ কোবে গিয়েছিলুম সেইটেই আমার চাই। এসব থাক্।"

সসংকোচে ম্যানেজার বললেন, "আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু আপনি তো কোনরকম নির্দেশ দিয়ে যাননি। কাজেই এক প্রিন্সেসের সেটি পছন্দ হওয়ায় আমরা তাঁকে সেটি বেচে দিয়েছি। অবিশ্যি আজ আমাদের কিছু নতুন স্টক এসেছে। আমি হলপ কোরে বলতে পারি তার মধ্যে এমন জিনিস আছে যা আপনার আগেরটার চেয়ে পছন্দ হবে।"

"কই দেখি।"

ম্যানেজার নিয়ে এলেন। লাটকন্যা দেখতে লাগলেন।

"সত্যিই। খুব চমৎকাব তো!" তারপর অমরেশেব দিকে চেয়ে "আপনার কি মনে হয় মিস্টার রায়?"

"বাঃ বাঃ চমৎকার! দাঁড়ান আপনাকে পরিয়ে দি।"

অমরেশ হারটা নিয়ে তার গলায় পরিযে দিতে লাগলো।

"বাঃ বাঃ অপূর্ব।" চৌধুরীও চেঁচিযে উঠলো।

সুচতুর ম্যানেজার মন্তব্য কবলেন, "হারটা পরে আপনাকে মনে হচ্ছে যেন স্বর্গ থেকে কোন এঞ্জেল নেমে এসেছেন।"

আরশিতে লাটদুহিতা নিজেকে বাব বার দেখতে লাগলেন।

"দাম কত পড়বে?" এক ফাঁকে অমবেশ জিগগেস কবলো।

"আগে পছন্দ হোক তো!"

"হয়েছে।" হাসতে হাসতে লাটকন্যা বললেন।

"অবিশ্যি দাম সেটার থেকে কিছু বেশীই হবে। দাঁড়ান, দেখে বলছি।"

কয়েক সেকেণ্ডেব মধ্যেই ম্যানেজার ঘুরে এলেন, বললেন, "নিরানব্বই হাজার ন শো নিরানব্বই টাকা।"

"কতো?"

অমরেশ নিজের কানকে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না।

"নিবানব্বই হাজার ন শো নিরানব্বই টাকা," ম্যানেজার পুনরাবৃত্তি করলেন।

"কিন্তু সেটার দাম তো মাত্র চব্বিশ হাজার কতো যেন ছিল না?" লাটকন্যা বললেন।

"মহাশযা, সে জিনিসে আর এ জিনিসে অনেক তফাৎ। এর কারুকার্য দেখুন। আর এই সব মণিমুক্তো! অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। এই দেখুন হীরে ক'খানা। এ রকম জিনিস আর দুটি হয় না।"

"কিন্তু পুরো এক লক্ষ বললেই তো পারতেন। নিরানব্বই হাজার ন শো নিরানব্বই কেন?" হাসতে হাসতে সলিল বললে।

"ব্যাপার কি মশাই, যা প্রকৃত দাম আমাদের কোম্পানি খরিদ্দারদের কাছ থেকে কখনও তার এক পয়সাও বেশী নেন না। এদিক দিয়ে আমরা দাবি করতে পারি আমরা আদর্শ বিজ্‌নেস্‌মেন।"

সলিল চুপিচুপি বললে, "হ্যাঁ বাবা, দোকানদারি শিখেছ বটে।"

দুই বন্ধুর কারও মুখ দিয়েই কিন্তু আর রা বেরোয় না, শুধু এ ওর মুখের দিকে চায়। তারা কল্পনাই করতে পারেনি একটা হারের দাম এতো হোতে পারে। তাছাড়া অমরেশের দিক দিয়ে, অতো টাকা এই মুহূর্তে সে পাবেই বা কোথায়? তার ব্যাঙ্কে যে হাজার দশেক পড়েছিল তা সে এখানে আসবার সময় লাটকন্যার হারের জন্যে তুলেই নিয়ে এসেছে। এখন আর পাবে কোথা? ওদিকে সলিলের কাছ থেকেও বার বার চাওয়া যায় না। এই সেদিন তারই বাড়ীতে বোসে সে তার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার করেছে।

নাঃ, দামটা সত্যিই বড্ড বেশী। কি করবে সে? 'না' বলবে? কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব? সলিল কি ভাববে? লাটসাহেবের মেয়েই বা কি ভাববে? লাটসাহেবের বৌও যখন শুনবেন তিনিই বা কি ভাববেন? নাঃ, তার মানমর্যাদা সব গেল! কেন মরতে সে রাজী হয়েছিল? আর তাও বলি, যদি আগের পছন্দ করা হারটাও থাকতো, তার দাম তবু চব্বিশ হাজার ছিল। কি দুষ্টু লোকগুলো! সেটা বেচে দিলে! নিশ্চয়ই না, আরও দাঁও মারবার জন্যেই এটা বার করেছে।

বোকার মতো চুপচাপ তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অগত্যা লাটকন্যা বললেন, "তা হোলে? না হয় তো—"

"না, না, সে কি হয়?"

নিজের হাতে যে সে তাকে পরিয়ে দিয়েছে! এখন কেমন কোরে বলবে খুলে দিতে এই এতো লোকের মাঝখানে? তাতে যে বেচারিকে খেলো করা হবে! তার নিজেরই কি বড় কম অসম্মান হবে! ইস! কেন সে এমন অবিবেচকের মতো তাড়াহুড়ো কোরে হারটা তাকে পরাতে গেল? কথাটা যখন চারদিকে রাষ্ট্র হোয়ে পড়বে? লোকে বলবে কি? লাটপ্রাসাদেও এ নিয়ে আন্দোলন হবে। সকলেই সমালোচনা করবে। এ তো আর যে সে ঘরের মেয়ে নয়—খাস লাটসাহেবের মেয়ে। লাটসাহেবের বৌও চটে যাবেন। আর তখন তার রাজা খেতাবের আশা একেবারে শিকেয় উঠবে। সুপারিশ করা তো দূরে থাকুক, পাঁচজনকে তিনি বোলে বেড়াবেন তাঁর মেয়েকে সে অপমান করেছে। উঃ, এমন অবস্থায়ও মানুষ পড়ে?

ওদিকে সলিলও হতভম্ব। বন্ধুকে যে এমন অস্বাভাবিক খরচের ধাক্কায় পড়তে হবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। তাছাড়া তার কাছেও এখন এমন কিছু নেই যা দিয়ে সে তাকে সাহায্য করতে পারে।

অবশেষে ম্যানেজারই নীরবতা ভঙ্গ করলেন, বোধ হয় তিনি অবস্থাটা কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিলেন, বললেন, "কি অসুবিধেটা হচ্ছে যদি আমায় দয়া কোরে বলেন?"

"ব্যাপার কি, আপনাকে খুলেই বলি," অমরেশ বলতে লাগলো, "আমাদের কাছে এখন মাত্র হাজার দশেক টাকা আছে, অতোটার জন্যে আমরা ঠিক প্রস্তুত হোয়ে আসিনি।"

"ও! এই কথা? তার আর কি? দশ হাজারই না হয় এখন দিন, বাকীটা পরে দেবেন। আপনাদের মতন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ধার দিতে তো আমরা পশ্চাৎপদ নই। বলুন কার নামে বিল করবো?"

অমরেশ দেখলো এ ছাড়া আর পথ নেই। "আমার নামেই করুন। অমরেশ রায়, নওগাঁর জমিদার।"

"বটে? আপনি কি তাহোলে স্বর্গত রাজা নিখিলেশ রায়ের—"

"আমি তাঁর ছেলে।"

"ও, তাই বলুন।"

লাটকন্যা: "এ'রা সব বাংলার এক একজন দিকপাল।"

মুখে হাসি মাখিয়ে ম্যানেজার বললেন, "তা আর জানি না! রাজা নিখিলেশ তো ছিলেন আমাদের নিয়মিত খদ্দেরদের অন্যতম। প্রচুর জিনিস তিনি আমাদের কাছ থেকে কিনেছেন। আমাদের জুয়েলারি ছাড়া অন্য কোথাকাব জুয়েলারি তাঁর পছন্দই হোত না। মিস্টার রায়, তাঁর ছেলে আপনাকেও আজ থেকে আমাদের খদ্দেরদের তালিকায় পেয়ে সৌভাগ্যবান মনে করছি। বেশ, তা হোলে বিলটা—"

"হ্যাঁ, আমার নামেই করুন। আর এখনকার মতো এই নিন দশ হাজার।"

অমরেশ মানিব্যাগটা বার কোরে দশখানা এক হাজাব টাকার নোট গুণে দিল।

সলিল চুপিচুপি রসিকতা কোরে বললে, "আমার বৌয়ের বেলায কিন্তু এতোটা দরাজহাত হোসনি।"

সেজন্যে ভাই ক্ষমা চাইছি। কিন্তু বুঝতে পারছিস তো এটা হোল—"

"ধন্যবাদ," বলতে বলতে ম্যানেজার একটা কাগজে কি টুকে নিয়ে টাকাটার সঙ্গে সেটা ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চালান ও বিল কোরে আনতে বললেন। তারপর মাননীয় খরিদ্দারদের দিকে চেয়ে বললেন, "কিন্তু এ'র তো পরিচয় পেলুম না?"

লাটসাহেবের মেয়ের মন খুশিতে ভরে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি তিনি বলে উঠলেন, "আমিই দিচ্ছি ওঁর পরিচয়। ইনি হলেন মিস্টার সলিল চৌধুরী। এ'রা হচ্ছেন চব্বিশ পরগনার জমিদার। এ'র বাবা মিস্টার সুব্রত চৌধুরীর নাম আপনি নিশ্চয়ই কাগজে দেখে থাকবেন। শীগগিরই উনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন।"

"বটে! বাঃ! বাঃ! বাংলার এই সব জুয়েল শুধু বাংলার কেন, সমগ্র ভারতেরই গৌরব। ধন্য হলুম ভদ্রমহোদয়গণ আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হোতে পেরে।"

তারপর একটু থেমে ম্যানেজার আবার বলতে লাগলেন, "আমার মনে হয় মিস্টার চৌধুরী, আপনাদের কাছ থেকে আমরা কোন অর্ডারপত্তর পাই না। আমরা বাধিত হবো যদি আপনাদেরও সার্ভ করবার অবকাশ পাই।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি দেখবো।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই চালান ও বিল তৈরী হোয়ে এল। ভালো কোরে দেখে নিয়ে ম্যানেজার চালানখানা অমরেশকে সই করতে দিলেন। তারপর নিজে বিলটা সই কোরে তার হাতে দিতে দিতে বললেন, "আপনার সুবিধে মতো পাঠিয়ে দেবেন। তা হোলেই হবে।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি গিয়েই পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

খুব খাতিরযত্ন কোরেই হ্যামিলটন কোম্পানি খরিদ্দারদের বিদায় দিলো।

ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ আরেকবার অমরেশকে হ্যামিলটনের বাড়ী ঢুকতে দেখা গেল—এবার একা। ধারে সে আর একগাছি কম দামের সৌখীন হার কিনলো।

নওগাঁয় ফিরে এসে যার কথা অমরেশের প্রথমেই মনে পড়লো সে সুমিত্রা। তা হোলে কি ঐ দ্বিতীয় হারটা সে তার জন্যেই কিনেছিল?

তাড়াতাড়ি সে খোঁজ নিলো রমানাথ টাকা পেয়েছেন কি না, তাঁর বাড়ী সারানো হয়েছে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ম্যানেজার জানালেন যেদিনই সে তার বন্ধুর বাড়ী বেরোল সেইদিনই টাকা পাঠানো হয়েছে। আর বাড়ী? হ্যাঁ, বাড়ীমেরামতও শুরু হোয়ে গেছে, এখন সামান্যই বাকী।

অন্যান্য আলোচনাও উঠলো। প্রসঙ্গক্রমে বন্ধুর বাড়ীর কথা এল। খুব গর্বের সহিতই অমরেশ জানালো সেখানে তার কি বিরাট লাভ হয়েছে।

ম্যানেজার, কর্মচারীবৃন্দ ও বন্ধুরা সকলেই আনন্দ প্রকাশ করলো।

ম্যানেজারবাবু বললেন, "এ তো তোমার প্রাপ্য বাবাজী।"

"কিন্তু এর জন্যে আমায় কত মূল্য দিতে হয়েছে জানেন? এক লক্ষ টাকা।"

সকলে সবিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইলো।

সমস্ত কাহিনী অমরেশ সবিস্তারে বলতে লাগলো।

"এক গাছা হারের এতো দাম?" একজন বিশ্বাস করতে না পেরে জিগগেস করলো।

মৃদুহাস্যে অমরেশ উত্তর দিলো, "হুঁ।"

আরেকজন বললে, "আরে এ কি আর যে সে হার!"

"ঠিক বলেছো। কি কারুকার্য! আর কতো হীরেমুক্ত।" একটু থেমে অমরেশ আবার বলতে লাগলো, "সে কি মুস্কিলেই পড়েছিলুম! ব্যাঙ্কে তো পড়েছিল মাত্র হাজার দশেক টাকা।"

"কি কোরে তা হোলে ব্যবস্থা করলেন?"

"ব্যবস্থা অবিশ্যি খুব সহজেই হোয়ে গেল। দশ হাজার টাকা নিয়ে বাকীটার বিল কোরে দিলে।"

"বিল? মানে নব্বই হাজার টাকা!" ম্যানেজারবাবু চমকে উঠলেন।

"হ্যাঁ। না, আর একটু বেশী—আরও হাজার কয়েক টাকা। মানে আরও একটা হার কিনেছি...আমার এক বান্ধবীর জন্যে।"

"অতো টাকা ছাড়লে?" সেই বোকা লোকটি আবার প্রশ্ন করলো।

আরেকজন "আরে কি বোকার মতো বকছো তুমি! এ কি তুমি? না আমি? খোদ নওগাঁর জমিদার! এঁদের ধার দেবে না তো ধার দেবে কাদের? ব্যবসা তা হোলে ওদের চলবে কেন?"

ম্যানেজারবাবুকে যেন খুব উদ্বিগ্ন দেখাতে লাগলো।

হাসতে হাসতে অমরেশ বললে, "কি অত ভাবছেন ম্যানেজার কাকা?"

"ভাবছি বাবাজী, জমিদারির তো এই অবস্থা। অত টাকা—"

"অবিশ্যি তাড়া নেই তো খুব। হপ্তাখানেকের মধ্যে পারবেন না?"

"হপ্তাখানেক ছেড়ে বছরখানেকেও হবে না। বড্ড দেনা পড়ে গেছে যে।"

"নাঃ, ম্যানেজারকাকা, কেবলই আপনার এ কাঁদুনি শুনতে আর ভালো লাগে না। আপনারা কি তা হোলে বলতে চান হাতে পায়ে শেকল বেঁধে বোসে থাকবো? ইচ্ছে মতো যদি খরচই করতে না পারলুম কি জন্যে জমিদারি?"

দু'একজন মোসাহেব সায় দিল, "নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।"

অমরেশ বলতে লাগলো, "শুনেছি বাবারও যখন টাকার দরকার হোত আপনি এই রকম 'টাকা নেই, টাকা নেই' করতেন। অথচ আমার ঐ বন্ধুদের জমিদারিতে এদ্দিন কাটিয়ে এলুম, কই এ জিনিস তো কোনদিন চোখে পড়লো না!"

"হয়তো তাঁদের আদায় ভালো বাবাজী।"

"আপনিই বা আদায় ভালো করবার চেষ্টা করেন না কেন?"

"আমার সাধ্য মতোই তো আমি কোরে থাকি বাবাজী।"

"না। যা করেন তা যথেষ্ট নয়। আপনি প্রজাদের ঠিক মতো চাপ দিতে পারেন না। বাবা বলতেন, ওরা হচ্ছে কুকুর, যেমন কুকুর তার তেমনি মুগুর হওয়া দরকার। আপনি তা হোতে পারেননি। এই জন্যেই প্রজারা এতো যো পায়, খাজনা বাকী ফেলে, আর এদিকে টাকার জন্যে ছটফট কোরে মরতে হয় আমাদের।"

"ব্যাপার কি বাবাজী, খরচও যে এদিকে দিন দিন বড্ড বেড়ে যাচ্ছে।"

"খরচ? দেখে আসুন অন্যদের। আজ নাচ, কাল উৎসব, পরশু পার্টি। এ তো তাদের লেগেই আছে। আমি তো বরং সে তুলনায় কিছুই করি না। বলুন জমিদারি হাতে নিয়ে অবধি এই ক'মাসে কি করেছি? এই যা খরচা করলুম গভর্নরের মেয়েকে উপহার দিতে। কিন্তু বলুন এর প্রয়োজন আছে কি না? বলুন আভিজাত্য বজায় রাখতে হোলে, সমাজে মর্যাদার সহিত থাকতে হোলে এ সবের দরকার হয় কিনা?"

ম্যানেজাব চুপ কোরে রইলেন।

অমরেশ বলতে লাগলো, "না, না, আমি ওসব শুনতে চাই না। আদায় যাতে ভালো হয় সেদিকে নজর দিন ম্যানেজারকাকা। টাকা আমার চাইই। দেখুন কোথায় কোন্ কোন্ প্রজা বাকী ফেলছে। হ্যাঁ, ভালো কথা। বাসুদেবপুরের খবর কি? আপনার সেই বলবামবাবু না কে উনি কেমন কাজ করছেন? আমার অর্ডার তাঁকে—"

"হ্যাঁ বাবাজী, আমি সেইদিনই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি। তবে কথা কি, ওখানকার প্রজারা বড্ড গোঁয়ার। গোলমাল পাকাবার জন্যে নাকি তোড়জোড় করছে।"

"হুঁ? তার জন্যে তা হোলে কি ব্যবস্থা করেছেন?"

"লোকজন পাঠিয়েছি।"

"লোকজন মানে লাঠিধারী লোকজন তো?"

"হ্যাঁ।"

"বহুৎ আচ্ছা।"

কাছারিতে যেতে যেতে ম্যানেজারবাবু ভাবতে লাগলেন, "হ্যাঁ, বাপকা বেটা বটে, কেবলই 'টাকা চাই, টাকা চাই'।"

"একি! আপনি?"

লণ্ঠন হাতে দরজা খুলেই সুমিত্রা চমকে উঠলো।

অমরেশ তাকে টেনে নিয়ে বুকের ওপর চেপে ধোরে বললে, "আমি আসায় কি তুমি খুশী হওনি মিত্রা?"

সুমিত্রার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। আশেপাশে কেউ নেই তো? কিন্তু কি তৃপ্তি! তাব শূন্য হৃদয় ভরে ওঠে যেন।

"বলো তুমি খুশী হয়েছ?"

সুমিত্রা দাঁড়াতে পারছে না। তার দেহ কাঁপছে। তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে তার কোমবটা জড়িয়ে ধোরে সে তার বুকের ওপর মাথাটি রাখে।

অমরেশ একবার এপাশ ওপাশ চাইল। চারদিক অন্ধকার। কোথাও লোব জনের সাড়াশব্দ নেই।

সে তার মুখখানি নিজের মুখের কাছে তুলে ধোরে তার ঠোঁটদুটির ওপর নিজের ঠোঁটদুটি চেপে ধরলো।

গভীর আবেশে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

অমরেশ জিগগেস করলো, "তোমার মা বাবা কোথায়?"

"কথকতা শুনতে গেছেন।"

"বাড়ীতে তা হোলে তুমি একা?"

"হ্যাঁ।"

"চলো, ভেতরে যাই।"

সুমিত্রার চেতনা যেন ফিরে আসে। এ কি! দরজায় দাঁড়িয়ে সে এ কি করছে? তার খুবই লজ্জা করতে লাগলো। কি বেহায়া সে! তাড়াতাড়ি নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত কোরে অস্ফুট স্বরে সে বললে, "আসুন।"

তারা ভেতরে গেল।

সুমিত্রার বিছানার ওপর অমরেশ বসলো।

হঠাৎ সুমিত্রার মনে হোল মা-বাবা থাকলেই যেন ভালো হোত। তার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

"কি হোল? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস।" অমরেশ বললে।

"পাখাটা নিয়ে আসি।" তার কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে। বলতে বলতে সে পাশের ঘরে চলে যায়, দাঁড়াতে না পেরে বাবার বিছানায় বোসে পড়ে।

কিন্তু এ কি করছে সে? যে-সে তো নয়! স্বয়ং জমিদার! তাঁকে একলাটি বসিয়ে রেখে কিনা সে এখানে! ছি ছি! কি ভাবছেন তিনি!

নাঃ, অন্তত মা থাকলেও ভালো হোত।

কিন্তু কি হয়েছে তাতে? এ কত বড় সৌভাগ্য! যাকে সে সমস্ত হৃদয় মন ঢেলে দিয়ে ভালবেসেছে, যার ছবি সে দিনে ধ্যান করে, রাত্রে স্বপ্ন দেখে, সেই তার আকাশের চাঁদ আজ একেবারে তার নাগালের মধ্যে! সে তাকে যতো পারে দেখুক, প্রাণভরে দেখুক, কেউ নেই যে লজ্জা করবে!

কিন্তু, কিন্তু তবু কেমন যেন সংকোচ হয়, কেমন যেন ভয় ভয় করে।

কিন্তু আর দেরী করা যায় না।

সে থাকতেও বা পারছে কই?

সসঙ্কোচে, সলাজ হাসি হাসতে হাসতে সে অমরেশের কাছে এসে উপস্থিত হয়। তাকে সে হাওয়া করতে যায়।

হঠাৎ অমরেশ তখনকার মতো আবার তার কোমরটি জড়িয়ে ধোরে তাকে কাছে টেনে নিলো।

তার বুকখানা উঠতে পড়তে থাকে ঘন ঘন।

"আমার চিঠি নিয়মিত পেতে মিত্রা?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তুমি তো একখানারও উত্তর দিলে না?"

সুমিত্রা চুপ করে থাকে।

"তোমাদের বাড়ীর চেহারা কিন্তু বদলে গেছে।"

"সে তো আপনারই দয়ায়।"

অমরেশ তাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধোরে তার ঠোঁটে গালে চোখে আবার চুমু খেতে লাগলো।

সুমিত্রা নিজেকে আর ধোরে রাখতে পারে না। চুম্বনের আঘাতে আঘাতে তার যৌবনতরঙ্গ যেন দুকূল ছাপিয়ে ভেঙে পড়ে আর কি! বেশভূষা শাসন মানে না।

ওদিকে তার উন্নত বুকে মাথাটি চেপে ধোরে অমরেশ বলে, "তোমাদের তা হোলে এখন আর কোন কষ্ট নেই?"

"না।"

"তোমার বাপ-মা খুশী হয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি হয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

অমরেশ আবার তাকে চেপে ধবে। তারপর · "এই দ্যাখো তোমার জন্যে কি নিয়ে এসেছি।"

অবাক হোয়ে সুমিত্রা দেখে সূক্ষ্ম কারুকার্য করা একগাছা সোনার হার।

"এসো পরিয়ে দি," বলতে বলতে হারগাছাটা খুলে সে তার বুকের আঁচলটা সবাতে যায়।

সুমিত্রা এবার বাধা না দিয়ে পারে না। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে আঁচলটা বুকের ওপব ভাল ভাবে মেলে দেয়।

"কি হোল? আপত্তি আছে? তোমার জন্যেই যে এনেছি মিত্রা।"

মাথাটা নিচু কোরে সলজ্জ কণ্ঠে সুমিত্রা বলে, "যদি কেউ এসে পড়ে?"

"ও। এইজন্যে? তা দোরটা বন্ধ কোবে দিয়ে এসো না।"

"কিন্তু আপনার গাড়ী যে বাইরে।"

"তাতে কি হয়েছে? ও তো আর কেউ চুরি কোবে নিয়ে যেতে পারবে না। দোরটাই বরং দিয়ে এসো।"

সুমিত্রা যেতে গিযে আবার ফিরে দাঁড়ায় · "কিন্তু যদি কেউ দোর ঠেলে?"

"আমাদের আর কতটুকু সময়ই বা লাগবে বলো! এখনই গিয়ে আবার খুলে দিয়ে এসো'খন।"

আস্তে আস্তে বাইরে গিয়ে সুমিত্রা দরজাটা বন্ধ কোরে দিয়ে এসে সসঙ্কোচে আবার অমরেশের কাছে দাঁড়ালো, একটু দূরে।

অমরেশ উঠে গিয়ে তাকে দুহাতে টেনে নিয়ে এল। আঁচলখানা এবার আর সরাতে হোল না, আপনিই খুলে পড়ে গেল।

সুমিত্রার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। কিন্তু সে আপত্তি করে না।

এইবার হারটা সযত্নে অমরেশ তার গলায় পরিয়ে দেয়। তারপর লকেটটা তার বুকের ঠিক মাঝখানে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

সেমিজের গলাটা সেফ্‌টিপিন দিয়ে আঁটা। কাজেই লকেটটা বসতে চায় না। অমরেশ দু'একবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। তার বলিষ্ঠ হাতের বারংবার স্পর্শে সুমিত্রার দেহ রোমাঞ্চিত হোতে লাগলো।

অবশেষে সেফ্‌টিপিনটা খুলে জামাটা সরিয়ে অমরেশ তার নগ্ন স্তন দুটির ঠিক মাঝখানে লকেটটা চেপে বসিয়ে দিলো।

সুমিত্রার রক্তের মধ্যে যেন ঝড় বইছে, দেহ বেতসের মতো দুলছে। উত্তেজনায় সে নিজেকে ধোরে রাখতে না পেরে অমরেশের বুকেব ওপর পড়ে গেল।

কঠিন বাহুবন্ধনে তাকে জড়িয়ে ধোরে অমরেশ চুমুতে চুমুতে তাকে পাগল কোরে তুললো। তারপর আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিলো।

"এখন থাক্, বিয়ের পর হবে." অমরেশের কানে কানে সে বলে।

"বিয়ে তো আমাদের যে-কোন দিন হোতে পারে মিত্রা।"

সুমিত্রা নিজেকে আর সামলাতে পারে না। পুরুষের স্পর্শে এমন মদিরা! তার অন্তর যেন কাঙাল হোয়ে ওঠে।

অনেকক্ষণ পরে যখন আবেশ কাটলো সে চোখ চেয়ে দেখে অমরেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দিকে চেয়ে।

নিজের অনাবৃত দেহ তাকে লজ্জা দিল। তবু আগের মতো অতোটা সঙ্কোচ, অতোটা লজ্জা আর নেই। যেন এটা হয়েই থাকে যেন এইটেই স্বাভাবিক। উঠে কাপড়খানা পরতে পরতে সে শুধু বলে, "কি দুষ্টু ছেলে বাবা আপনি!"

"কিন্তু হারটা পরে কি সুন্দর দেখিয়েছে তোমায় দ্যাখ' বলতে বলতে অমরেশ আবার তাকে বুকে টেনে নিল।

তারপর : "এইবার আসি, কেমন?"

"আর একটু বসবেন না?"

"যদি কেউ এসে পড়ে? রটাবে তো!"

সুমিত্রা সিঁটিয়ে ওঠে। কি হ্যাংলা সে! কি বেহায়া!

সসঙ্কোচে অমরেশকে গাড়ী পর্যন্ত গিয়ে সে এগিয়ে দিলো।

"কে রে ওখানে? মিত্রা?"

দূর থেকে মার গলা পেয়ে সুমিত্রার চমক ভাঙে। পেছন ফিরে সে দেখে

বাবা, মা ও তাঁদের সঙ্গে আরও পাঁচ ছ' জন। ওঁরা ফিরছেন কথকতা শুনে।

"জমিদার এসেছিলেন বুঝি রে?" এগিয়ে আসতে আসতে মা প্রশ্ন করেন।

গাড়ীখানা তখনও দেখা যাচ্ছে।

সুমিত্রার খুব লজ্জা করতে থাকে। ওরা যদি আর একটু পরে আসতো! লজ্জাজড়িত কণ্ঠে সে বলে, "হ্যাঁ।"

সকলেই এবার কাছে এসে পড়েছে।

"বেশ যত্ন কোরে বসিয়েছিলি তো দিদি নাতজামাইকে?" হাসতে হাসতে শৈবলিনী বললেন।

"কি যে বলো মাসীমা!"

পাছে তাঁদের কথাবার্তায় বাধা পায় সেজন্যে রমানাথ আস্তে আস্তে সরে গেলেন।

শৈবলিনী বলতে লাগলেন, "না গো না। ঠিক হবে। আমাকে মিত্রা যে জমিদারের চিঠি পড়ে শুনিয়েছে।"

প্রসঙ্গটা চেপে যাবার জন্যে সুমিত্রা তাড়াতাড়ি শৈবলিনীর হাতটা চেপে ধরলো।

সাবিত্রীর মুখ আনন্দে ভরে উঠলো, বললেন, "নারায়ণের কৃপা আর তোমাদের আশীর্বাদ মাসীমা।"

হঠাৎ এই সময়ে একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "দ্যাখো, দ্যাখো, ঠাকুমা, সুমিত্রা-দির গলায় কি চকচক করছে?"

রমানাথ দরজার ভেতরে পা দিচ্ছিলেন, দাঁড়িয়ে পড়লেন।

লণ্ঠনটা তার গলার কাছে তুলে দেখতে দেখতে ঠানদি বললেন, "বটেই তো! কি লো ওটা?"

সলজ্জ কণ্ঠে মাথাটি নীচু কোরে সুমিত্রা আস্তে আস্তে বলে, "হার।"

"জমিদার দিয়ে গেলেন বুঝি?" সাবিত্রী জিগগেস করলেন।

"হ্যাঁ।" তেমনি সলজ্জ ভাবেই সুমিত্রা জবাব দিলো।

এক হাতে লণ্ঠনটা ধোরে, অপর হাত দিয়ে হারটা দেখতে দেখতে ঠানদি বলেন "খুব দামী হার দেখছি।"

রমানাথ আর কাছে এলেন না, যেখানে ছিলেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। অন্যান্যরা কিন্তু হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে এসে সবিস্ময়ে দেখতে লাগলো।

"এইবার বৌ তা হোলে বলো যা বলেছি ঠিক কি না।" আনন্দের হাসি হাসতে হাসতে শৈবলিনী বললেন।

"আশীর্বাদ করো মাসীমা। মিত্রা, ঠাকুমাকে প্রণাম কর্।"

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি শৈবলিনীর পায়ের ধুলো নিলো।

শৈবলিনী তার চিবুকে হাত দিয়ে হাতখানা নিজের ঠোঁটে ঠেকিয়ে বলতে লাগলেন, "ভগবান করুন দিদি রাজরাণী হ'। দেখে আমাদের চক্ষু জুড়োক।"

সুমিত্রা এইবার মাকে ও তারপর ঠানদিকে প্রণাম করলো।

ঠানদি লক্ষ্য করলেন সাবিত্রী মেয়েকে শুধু শৈবলিনীকেই প্রণাম করতে বললেন। মেয়ে যদিও তাঁকেও করলো বটে, কিন্তু শৈবলিনীকে কোরে তার পর। অপমানিত বোধ কোরে তিনি মনে মনে জ্বলতে লাগলেন।

জ্বালা চেপে রাখার মতো সংযম ঠানদির নেই। অধীর হোয়ে হঠাৎ তিনি নিজের নাতনীর কাঁধটায় ঠেলা দিয়ে বললেন, "মর্ ছুঁড়ী, চল্ না, পরের ঐশর্য্য দেখলে পেট ভরবে? ঘরকন্নার কাজ নেই?"

তারপর আর কারও সঙ্গে কোন কথা না কয়ে নাতনীর হাত ধোরে টানতে টানতে তিনি হন্‌হন্ কোরে চলে গেলেন।

"মনটা ঠানদির ববাবরই ঐ রকম," একজন মন্তব্য করলো। "কারও ভালো দেখতে পারে না।"

"থাক্ ভাই, কিছু আর না বলাই ভালো," শৈবলিনী বললেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই যে যার ঘবে চলে গেল।

মেয়েকে নিয়ে সাবিত্রীও বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন।

স্বামীকে সাবিত্রী বললেন "তুমি হারটা দেখবে না?"

সুমিত্রা তাড়াতাডি হারটা খুলে মাব হাতে দিলো, বাবাকে দেবার জন্যে। উঠোনে দাঁড়িয়ে স্বামী স্ত্রী দুজনেই লণ্ঠনের আলোয় হারটা নিবীক্ষণ কোরে দেখতে লাগলেন। তারপর পরস্পবের মুখের দিকে চাইলেন। ভবিষ্যতেব সম্ভাবনার কথা ভেবে তাঁদের আনন্দ আর ধরে না।

সুমিত্রা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর হঠাৎ কি ভেবে নিজের ঘরেব মধ্যে চলে গেল। বিছানাটা লণ্ডভণ্ড হোয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সে সেটা হাত দিযে দিয়ে ঠিক কোরে দিতে লাগলো।

"এই নে মা, গলায় দে, কোথায় গেলি?" মা হাঁকলেন।

মিত্রা মার কাছে এল। হাবগাছটা নিতে নিতে বললে, "তোমার বাক্সে তুলে রেখে দোব মা?"

"ওমা, শোন মেয়ের কথা! তুলে রেখে দিবি কি? তবে পরেছিলি কেন?"

মাথা নীচু কোরে সে আস্তে আস্তে বললে "আমি পরিনি। উনি পরিয়ে দিয়ে গেছেন।"

"জমিদার পরিয়ে দিয়ে গেছেন! ওগো শুনছো, জমিদার নিজের হাতে মিত্রাকে হার পরিযে দিয়ে গেছেন!"

পা ধুতে ধুতে রমানাথ বললেন, "সবই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা গিন্নী। নারায়ণ! নারায়ণ! খড়মটা কোথা গেল দ্যাখ্ তো মা।"

"আহা জানতুম কি আজ আসবেন?" সাবিত্রী বলতে লাগলেন। "তা হোলে বেরোতুম না। আর একটু কেন থেকে যেতে বললি না মা?"

সুমিত্রা নীরবে খড়মজোড়া পিতাকে এগিয়ে দিল।

"কাল আসবেন নাকি?" সাবিত্রী আবার প্রশ্ন করলেন।

পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে সুমিত্রা সসঙ্কোচে জবাব দিল, "জানি না।"

মেয়ের আর একটু কাছে এগিয়ে এসে সাবিত্রী বললেন, "কি সব কথা হোল একটু বল্ না মা?"

সুমিত্রা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলো। তার মুখ রাঙা হোয়ে উঠলো। সে পালাতে পারলে যেন বাঁচে।

"আচ্ছা, থাক্ থাক্। আয় মা, খাবি আয়। বড্ড রাত হোয়ে গেছে।" বলতে বলতে মা দাওযার ওপর উঠলেন।

ওদিকে ঠানদি বাড়ী পেঁছে হাঁকডাক কোরে বাড়ীসুদ্ধ লোককে জাগিয়ে তুলতে লাগলেন। নাতনীকে উদ্দেশ কোরে বললেন, "দেখলি তো ছুঁড়ি, রমানাথ ভটচায্যির মেয়েকে জমিদার কি রকম ঐশয্যি ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে। কেন দেবে না? তোর মতন তো আর অমন কালিন্দি নয় সে।"

রমানাথ ভটচায্যির বাড়ীর সামনে সেই বেল গাছটার নীচে আজকাল রাত্রির দিকে প্রায়ই অমরেশের মোটরখানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সে নিজেই ড্রাইভ কোরে আসে।

প্রথম প্রথম এ নিয়ে আশেপাশে খুবই কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল, অনেক কথাও হয়েছিল, কিন্তু জমিদারের ব্যাপার বোলে বেশী কেউ কিছু বলতে সাহস করে না। তা ছাড়া যখন শোনা যাচ্ছে রমানাথের মেয়েকে জমিদারের পছন্দ হয়েছে এবং তিনি তাকে বিবাহ করবেন তখন যদি তিনি তাঁর ভাবী শ্বশুরবাড়ী ঘন ঘন আসেন তাতেই বা কার কি বলবার থাকতে পারে?

ফলে ফিসফিস গুজগুজ ক্রমশ কমে আসে। তার জায়গায় এখন শোনা যায় লোকে জিগগেস করছে, "কি গো, মেয়ের বিয়ে কবে?" সুমিত্রার বান্ধবীরাও এসে তাকে ঐ একই প্রশ্ন করে। কেউ কেউ রসিকতা কোরে বলে, "আমরা যে ভাই আর সবুর সইতে পারছি না। কবে হবে?"

রমানাথ ও সাবিত্রী কখনও বাড়ী থাকেন, কখনও বা সুমিত্রা ও অমরেশকে রেখে চণ্ডীমণ্ডপে যান কথকতা শুনতে।

"তোমরা দুজনে গল্প করো বাবা। আমরা একটু কথা শুনে আসি।" বলতে বলতে সাবিত্রী স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন।

অনেক রাত্রি পর্যন্তই অমরেশ থাকে। তারপর বিদায় নেয়। যাবার সময়ে কখনও টাকার তোড়া, কখনও বা কাপড়টা, গহনাটা, কখনও বা অন্য কিছু উপহার দিয়ে যায়।

অনুযোগের সুরে সুমিত্রা বলে, "বিয়েটা আমাদের তাড়াতাড়ি হোয়ে গেলেই ভালো ছিল। পাঁচজনে পাঁচটা কথা বলছে।"

"আর কিছুদিন অপেক্ষা করো মিত্রা। মাকে তো চিঠি লিখেছি। মা এলেই হোয়ে যাবে।"

মাঝে মাঝে অমরেশ যখন দেখে আসাটা বড্ডই ঘন ঘন হচ্ছে আর তা কেমন দৃষ্টিকটু ঠেকছে সে কিছুদিনের জন্যে আসা বন্ধ করে, হেমাকে দিয়ে চিঠি পাঠায়।

হেমা আসে। সময়ে সময়ে দরোয়ান দেবনন্দন পাণ্ডেও আসে তার সঙ্গী হোয়ে।

এখন কি ঘরে, কি বাইরে সুমিত্রার আদর-যত্ন-অভ্যর্থনার অন্ত নেই। যে সুমিত্রা এক সময়ে এক মুঠো ভাতের জন্যে ছটফট করতো, এখন তারই সাহায্যের প্রত্যাশী আর পাঁচজন। যে সুমিত্রা এক দিন বকুলতলার ঘাটে বোসে পেঁজা কাপড় ধোরে ধোরে কাচতো আর মুখটি বুজে অবাক হোয়ে শুনতো অমুকের বাপ তাকে এক শিশি 'জবাকুসুম' এনে দিয়েছে, অমুকের স্বামী এবার পুজোয় তাকে ফরাসডাঙার শাড়ী কিনে দেবে, সেই সুমিত্রার বেশভূষা দেখে এখন তারাই লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

এ কথা আজ কারও অজানা নেই যে জমিদার অমরেশ রায়ের অভিযোগক্রমে জমিদারবাড়ীর পুরনো কর্মচারী শচীনন্দন সামন্তকে গত কয়েক সপ্তাহ জেলে আটক রাখা হোয়েছিল। সম্প্রতি অবশ্য সে ছাড়া পেয়েছে। ছাড়া পাওয়ার কারণ তার বরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট কিছু পাওয়া গেল না।

বাড়িতে পা দিয়েই শচীনন্দন শুনলো তার মামার ভারী অসুখ। সে আরও শুনলো স্কুলটা তার তেমন ভাল চলছে না যাত্রাদলের সভ্যদের মধ্যেও নাকি খুব মনোমালিন্য, গোপাল সামন্তর সঙ্গে জমি নিয়ে অর্জুন মাইতির এমন মারামারি হয়েছে যে দুজনেই নাকি এখন হাসপাতালে। সে আরও শুনলো রমানাথ ভটচায্যির আর এখন সে ট্যানাপরা দৈন্যক্লিষ্ট অবস্থা নেই, জমিদারের অনুগ্রহে তাঁর ভাগ্য ফিরে গেছে।

শচীনন্দন খুবই বিস্মিত হোল। একবার ভাবলো রমানাথের সঙ্গে দেখা করবে। কতদিন দেখা নেই! তারপর আবার ভাবলো, নাঃ, থাক, হয়তো ঠিক হবে না। তারপর দু'তিনদিন স্বগ্রামে থেকে স্থানীয় ব্যাপারগুলির কিছু কিছু

মীমাংসা কোরে মামাকে দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি মামার বাড়ি জগদ্বল্লভপুর রওনা হোল।

এদিকে তার নাম চারদিকে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। সে যে একটা যে-সে লোক নয়, গরীবদুঃখীর জন্যে জমিদার তো দূরের কথা এমন কি গভর্নমেণ্টকেও ভয় করে না, এসব কথা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে খুব আলোড়নের সৃষ্টি করেছে।

জগদ্বল্লভপুর আসতেই অনেকে তাকে দেখতে এলো। সে অবশ্য অনেককেই চেনে। কেননা অনেক সময় সে এখানেই কাটিয়ে গেছে।

জগদ্বল্লভপুরবাসীরা তাকে জানালো তারা একটা বড় সমস্যায় পড়েছে, যদি সে তাদের সাহায্য করে তারা বাধিত হবে।

সে জানতে চাইলো কি সে সমস্যা।

সমগ্র মৌজার মধ্যে সবচেয়ে যিনি বৃদ্ধ তিনিই বললেন। বললেন, "ব্যাপারটা কি বাবা, এ বছর তো চাষআবাদ তেমন হয়নি, তাই আমরা বাবুদের কাছে জানিয়েছিনু খাজনাটা এবার দিতে পারবুনি। তা ওনারা মঞ্জুর করলোনি।"

"মঞ্জুর তো দূরের কথা। এমন জোর জুলুম লাগিয়েছে যে টেঁকা যাচ্ছেনি।" একজন ঢেঙা মতো যুবক বোলে উঠলো।

আরেকজন বললে, "অবস্তা বাপু সত্যিই বড্ড খারাপ। পেবায় গেরামেই দেখতে পাবে দু'চারজন অনাহারে রয়েচে।"

শচীনন্দন খানিকক্ষণ কি ভাবলো, তারপর বললে "আচ্ছা এক কাজ করুন আপনারা। সমস্ত চাষীকে ডাকুন আমরা মিটিং করবো।"

"মিটিন কোরে কি হবে?" বুঝতে না পেরে একজন প্রশ্ন করলো।

"মিটিং কোরেই হবে।" শচীনন্দন বললে। তারপর সকলের মুখের দিকে চেয়ে বললে "যা বলছি করুন, দেখবেন আপনাদের ভালো হবে।"

"বেশ বাবা, তুমি যখন বলছো তাই ডাকছি। কবে মিটিন করবে বলো।" সেই বৃদ্ধ চাষীটি বললেন।

"কবে করলে আপনাদের সুবিধে হবে?"

"বলো না গো তোমরা। সব চুপ কোরে রয়েচো কেন?"

"আমরা আর কি বলবো? তুমি যা ঠিক করবে তাই হবে।"

"তবে এই বুধবার হোক।"

সেই ঢ্যাঙা যুবকটি বললে, "আমি একটা কথা বলবো মোড়ল?"

"বলো না বলো। পাঁচজনের মত নিয়েই তো কাজ হওয়া দরকার।"

"আমি বলি কি কালগের হাটেই এ কথাটা পেরচার কোরে দেওয়া হোক। তালে অনেক লোক জুটবে।"

"ঠিক বোলেচ, ঠিক বোলেচ," সবাই একবাক্যে বলে উঠলো।

শচীনন্দন প্রথমটা ভেবেছিল মামাকে দেখে দু'একদিনের মধ্যেই স্বগ্রামে ফিরে যাবে। এখন দেখলো তা সম্ভব নয়, কিছুদিন তাকে থাকতেই হয়।

জেলে গিয়ে সে এক নতুন শিক্ষা লাভ করেছে। সে দেখেছে চুরি ডাকাতি করলেই যে জেলে রাখা হয় তা নয়। তার মত অনেক নির্দোষ ব্যক্তিকেও সেখানে রাখা হয়েছে। এদের বলা হয় রাজনৈতিক বন্দী। তার নিজের জেলারও অনেকে এই রকম রয়েছে। এরা কেউ কৃষকদের মধ্যে, কেউ বা শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করে।

শচীনন্দন যেন এক নতুন প্রেরণা লাভ করে। জেলে থাকতে সে তাদের কাছ থেকে আরও অনেক কথা জানতে পেরেছে। সে শুনলো তারা মীটিং করে, মিছিল করে, মানুষকে তার অধিকাব সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে, জমি ও কারখানার মালিকদেব ওপব দলবদ্ধ চাপ দিয়ে দাবি আদায়ের চেষ্টা করে।

সে ভাবতো তার নিজের গ্রামেও তো কত অভাব, কত দুঃখ রয়েছে। সেখানকার মানুষের ওপরও তো কত জুলুম। সে তাদেব সম্বন্ধে কত ভেবেছে, কত হাঁকপাঁক করেছে। কিন্তু কি ভাবে যে তাদেব এ অত্যাচার ও জুলুম থেকে রক্ষা করা যায় সে তা খুঁজে পেত না।

জেলেব বন্ধুদের কাছ থেকে এই সব শিক্ষা পেযে সে যেন আরও জ্ঞানী হোয়ে জেল থেকে ফিরেছে। তাব চোখ খুলে গেছে। তার নিজের ওপব বিশ্বাসও বেড়ে গেছে।

গভীরভাবে সে ভাবতে লাগলো কি ভাবে এই মানুষগুলিকে সাহায্য করা যায়।

একবার ভাবলে তাদের নিয়ে নিজে একাই চেষ্টা কববে। মীটিং মিছিল প্রভৃতি যেসব গণআন্দোলনেব পদ্ধতি জেলে বসে সে শুনেছে সেইসব উপায়েই কাজ করবে। আবার ভাবলো, না, তাব চেযে ববং ঐসব বন্ধুদের দু'একজনের পরামর্শ ও সহযোগিতা চাওয়া যাক। শেষ পর্যন্ত সে তাই স্থির করলো।

তার সঙ্গে ছাড়া পেয়েছিল আবও কযেকজন -তাদেব মধ্যে দু'একজনেব বাড়ী খুব বেশী দূবে নয়। সে তাদেব সঙ্গে দেখা কবতে গেল।

অমরেশ ম্যানেজারকে জিগগেস কবছে, "হ্যামিলটনের টাকাটা যোগাড হযেছে ম্যানেজারকাকা?"

সামনে উপবিষ্ট ম্যানেজার "না বাবাজী, এখনও পর্যন্ত কিছুই করতে পারা যাচ্ছে না।"

"তাই তো! দু-দুবাব তাগাদা এসে গেছে যে।"

"ধার করা ছাড়া আব তো কোন উপায় দেখছি না বাবাজী।"

"না হয় তাই কবুন। এ যে মর্যাদার প্রশ্ন ম্যানেজাবকাকা।"

"কিন্তু শুধুহাতে কে অতো টাকা দেবে বাবাজী?"

"দেবে না?"

"না। সেদিন আমার সম্বন্ধিকে বললুম। লটারিতে সে অনেক টাকা পেয়েছে। কিন্তু ঘাড় পাতলো না।"

"কেন?"

"বললে অত টাকা? আসল কথা কিন্তু তা নয়—শুধু হাতে দিতে রাজী না।"

"তাই তো! তা হোলে?" তারপর একটু থেমে "এক কাজ হোক তবে। একটা মৌজাই না হয় বাঁধা দিন। পরে ছাড়িয়ে নেওয়া যাবেখন। কি বলেন?"

"বেশ, তাই হবে।"

ম্যানেজারের কাছে টাকা আছে। অবশ্য সে টাকা তাঁর নিজের। এতো বছর ধোরে চাকরী করছেন, এবং তিনি খরচেও নন, কাজেই টাকা থাকবে না এ হোতে পারে না। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা কর্তব্য যাকিছু তিনি উপায় করেছেন সদুপায়েই করেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে কেন তিনি অমরেশের উড়নচণ্ডেমির জন্যে দেবেন? তাছাড়া যদি একবার দেন তো সে জো পাবে। কথাটা নিয়ে তিনি ক'দিনই ভাবছেন। এখন স্থির করেছেন যদি জমি বাঁধা দিয়ে অমরেশ টাকা নিতে রাজী হয় তবে দেবেন। তাতে অন্তত এই হবে যে সে এতটা বেপরোয়া হোতে ভবিষ্যতে সাহস করবে না। তারপর যদি দেখেন তার উড়নচণ্ডেমি বন্ধ হয়েছে, তার জমি তাকে ফিরিয়ে দেবেন।

প্রশস্ত বারাণ্ডার ওপর রোদ্দুর এসে পড়েছে। মেঝে, থাম, দেওয়াল, সবই চক্‌চক্ করছে। দু'একটা পোষা পায়রা উড়ে এসে এদিক ওদিক বসছে। কুকুর জ্যাক একপাশে শুয়ে লেজ নাড়ছে।

নীচে চাকরবাকর ও মালীরা যে যার কাজে ব্যস্ত। দূরে কাছারীবাড়ীর বারাণ্ডায় কয়েকজন প্রজা বোসে।

চাকর চা দিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে জমিদার ও ম্যানেজারে আলোচনা চলেছে খাজনা আরও ভালোভাবে কি কোরে আদায় করা যায়, কি কোরে খরচ আরও কমানো যায়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এমন সময়ে একজন চাকর এসে খবর দিলে "জগৎবল্লভপুর থেকে ছিকেষ্টবাবু এয়েছেন।"

"কে?" অমরেশ জিগগেস করলো।

"ছিকেষ্টবাবু," চাকর পুনরাবৃত্তি করলো।

অমরেশ ম্যানেজারের দিকে চাইলো।

ম্যানেজার বুঝিয়ে দিলেন শ্রীকেষ্টবাবু হচ্ছেন জগদ্বল্লভপুরের গোমস্তা।

"ও। ডাকো।"

শ্রীকৃষ্ণবাবু উপস্থিত হলেন। অমরেশকে নতমস্তকে নমস্কার কোরে বললেন,

"এই যে ম্যানেজারবাবুও রয়েছেন, ভালোই হয়েছে। নমস্কার ম্যানেজারবাবু।"

"নমস্কার। কি খবর?" ম্যানেজার প্রশ্ন করলেন।

"খবর বড্ড খারাপ। সেইজন্যেই তো ছুটতে ছুটতে আসছি। জমিদারবাবু আদেশ দেন তো বলি।" বলতে বলতে তিনি অমরেশের দিকে চাইলেন।

অমরেশ এতক্ষণ লোকটির বিরাট গোঁফজোড়াটি নিরীক্ষণ করছিল। বললে, "হ্যাঁ বলুন।"

শ্রীকৃষ্ণবাবু বসলেন, চারদিক একবার চাইলেন, তারপর বলতে লাগলেন, "ওখানে হুজুর, মানে জগৎবল্লভপুরে, প্রজারা বড্ড গোলমাল শুরু কোরে দিয়েছে।"

"কেন?"

"বলছে, এ বছব খাজনা দিতে পারবে না।"

"দেখলেন তো ম্যানেজারকাকা? দেখুন কিরকম ষড়যন্ত্র সকলে মিলে করছে! এদ্দিন শোনা যাচ্ছিল বাসুদেবপুরই খাজনা দিতে পারবে না, এখন শোনা যাচ্ছে জগৎবল্লভপুরও। আবার দুদিন পবে শুনবেন জমিদারিসুদ্ধ লোকই পাবছে না। এরা আমাদের কি পেয়েছে বলুন তো?"

শ্রীকৃষ্ণবাবু বলতে লাগলেন, "অবিশ্যি অবস্থা ওখানকার মানুষের সত্যিই খুব খারাপ। তবে ব্যাপারটা ঘোরালো কোরে তুলেছে বাইরে থেকে কতকগুলো দুষ্টুলোক এসে। ওবা ওদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে বলছে 'খাজনা দিও না, আন্দোলন করো, আমরা তোমাদের সাহায্য কববো।'"

"মগের মুল্লুক নাকি?"

"জানেন হুজুর, সেদিন এই নিয়ে দুজন লোক আমায় এমন তেড়ে এলো আপনাকে কি বলবো? মনে হোল আমায শেষ কোবে দেয আব কি।"

"তা হোলে ঐ গুণ্ডাগুলোই—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওদেব জন্যেই যত মুস্কিল। আর ওদেব সর্দার হচ্ছে কে জানেন? আপনারই পুবনো কর্মচারী, আপনাবই প্রজা ঐ শচীনন্দন সামন্ত। লোকটা এখন ওখানে থেকেই এইসব কোবে বেড়াচ্ছে।

"তাই নাকি? ঐ বদমাসটা তা হোলে জেল থেকে বেরিযে এসেছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি ভয়ঙ্কর অরাজকতা? গভর্নমেণ্ট কি এসব লক্ষ্য করছে না? না দেশে গভর্নমেণ্টই নেই? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি আমাব এই জ্যাককে দিয়ে ওর টুঁটি ছিঁড়ে নোব।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শ্রীকৃষ্ণবাবু অধীরভাবে বোলে উঠলেন, "হুজুর, যা হোক একটা ব্যবস্থা করুন। না হোলে ওখানে প্রাণ বাঁচানো আমার দায়।"

"আমি তো সেই কথাই ভাবছি। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি এখনই ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাচ্ছি।"

"শুধু ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালেই হবে না হুজুর! ম্যাজিস্ট্রেট হয়তো বড়জোর গোটাকতক কনোস্টেবল পাঠিয়েই ক্ষান্ত হবে, আর ও বেটারা এসে বোসে বোসে কেবল খৈনীই খাবে, কাজ কিছু করবে না।"

তাকে সমর্থন কোরে ম্যানেজারবাবু বললেন, "হ্যাঁ, অনেক সময়ে তাই দেখা যায় বটে।"

শ্রীকৃষ্ণবাবু "ওদের খবর দিতে চান দিন। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। না হোলে হুজুর একলা আমার পক্ষে ওখানে কাজ করা অসম্ভব। ওরা আমায় নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে।"

"হো হো হো! অতো বড়ো গোঁফজোড়ার মালিক হোয়ে আপনি এতো ভীরু?"

"সেখানকার অবস্থা স্বচক্ষে না দেখলে বুঝতে পারবেন না হুজুর। লোক-গুলো একেবারে বেপরোয়া হোয়ে উঠেছে। যা খুশি তাই করতে পারে।"

ম্যানেজারও সায় দিলেন।

"হুঁ? আচ্ছা দেখা যাক ওরা কত শক্তি ধরে। ম্যানেজারকাকা আপনি উঠুন তো। এক্ষুনি পান্ডে দারোয়ানকে আর তার সঙ্গে জন পঞ্চাশ লেঠেল শ্রীকেষ্ট-বাবুর সঙ্গে পাঠিয়ে দিন।"

ম্যানেজারবাবু উঠলেন।

"হ্যাঁ, ভাল কথা। একটু দাঁড়ান। হ্যামিলটনের টাকাটার তা হোলে একটু তাড়াতাড়িই ব্যবস্থা করবেন।"

"তা হোলে কি--"

"হ্যাঁ, যদি উপায় না থাকে তো একটা মৌজাই বাঁধা দিন। কি করা যাবে?"

ম্যানেজারবাবু যাবার জন্যে পা বাড়ালেন।

নমস্কারান্তে গোমস্তাও ম্যানেজারের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েকজন লোক কয়েকটা হরিণ ও একজোড়া ময়ূর নিয়ে এসেছে বেচতে। জমিদার অমরেশ রায়ের বাগানে রাখবার জন্যে সেগুলি অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। কাছারীর কাছে দাঁড়িয়ে তারা সেগুলি দেখাচ্ছে। সকলে দেখছে ও হাসি তামাসা করছে।

ঝি হেমাও এসেছে দেখতে। এক সময়ে সে জিগগেস করে, "ময়ূরী নাচে না কেন ময়ূরওলা?"

"নাচবে মা, নাচবে। মেঘ উঠুক দেখবে পেখম মেলে নাচছে আমার ময়ূরী।"

চলেছে হাসি ও কথাবার্তা।

হঠাৎ এমন সময়ে আর একজন ঝি এসে চুপিচুপি হেমাকে জানালো দারোয়ান পাঁড়েজী তাকে ডাকছে।

"পাঁড়েজী! কোথায়?"

"তার বাসায়।"

"আমায় ডাকছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"তা জানি না," সংবাদদাত্রী হাসতে হাসতে জবাব দিল।

"মরণ আর কি। আমায় আবার তার কি দরকার পড়লো?"

বাইরে বিরক্তি প্রকাশ করলেও এ কিন্তু হেমার মনের কথা নয়। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল সে খুব অনিচ্ছার সহিতই যেন যাচ্ছে এই রকম ভাব দেখিয়ে পাঁড়েজীর ঘরের দিকে চলেছে।

সেখানে পেৌঁছে সে হাঁকতে থাকে, "পাঁড়েজী কোথা গো? ও পাঁড়েজী"

"কোন্ হ্যায়রে?" বলতে বলতে দেবনন্দন পাণ্ডে বেরিয়ে আসে। হেমাকে দেখা মাত্র তার মন খুশিতে ভরে ওঠে। এগিয়ে আসতে আসতে সে বলে, "আরে! হেমা তুমি!"

"বারে মিনসে। ডেকে পাঠিয়ে এ আবার কেমন ধারা কথা?" হেমা ফোঁস কোরে ওঠে।

"হাঁ, হাঁ, হামি তো ডাকিয়েছি।"

"তবে অমন কোরে কথা বলছো কেন?"

"না, না, রাগ কোর না। হামি বিশওযাস করতে পারিনি তুমি আসবে।"

"এখন বিশ্বেস হচ্ছে তো? বেশ বলো কি খবর? কি জন্যে ডেকেছো?"

"আরে বাবারে! এত্তো তাড়া কেন? ঘরে এসো, বোস, তবে তো।"

হেমার মনটা দুলে উঠলো। সে একবার আকাশের দিকে তাকালো। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। পাখীরা বাসায় ফিরছে কিচিরমিচির করতে করতে। চারিদিকে দ্রুত নেমে আসছে কেমন একটা নিরালা থমথমে ভাব। হেমা বুঝলো এত সত্ত্বেও কিন্তু লুকিয়ে দেখবার লোকের অভাব নেই। কেউ যদি এ সময়ে তাকে পাঁড়েজীর নারীবর্জিত ঘরে ঢুকতে দেখে, নানারকম অপপ্রচার করবে। সেদিন অত রাত্রে সে ঢুকেছিল, তাই বড় মালীর বৌয়ের চোখে পড়েছিল। এখনও সে তা নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করে।

"না পাঁড়েজী," সে বলে, "আমি কাজ করতে করতে কাজ ফেলে এয়েছি। আমায় এখনই ফিরতে হবে। তোমার কি বলবার আছে বলো।"

"বোলবার আর কি আছে? তুম্‌হাকে একটু দেখবার ইচ্ছা হোল, তাই।"

"মরণ তোমার। আমাকে তো রোজই দেখছো। তবু আশা মেটেনা?"

হেমা যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়ালো।

"আরে চলে যাচ্ছ কেন?"

"না যাব না, তুমি আমায় দেখবে বোলে আমি পুতুলের মতন এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো!"

"তুমি তো হামার পুতুল হি আছো। ও কি হোল? সত্যিই চলে যাচ্ছো? হেমা!"

"আচ্ছা পাগল তো! এমনি কোরে চেঁচামেচি করলে যে লোক ছুটে আসবে!"

"তবে তুমি থোড়া বোসে যাও।"

হেমার পা কে যেন দড়ি দিয়ে টেনে রাখে। কিন্তু কি কোরে সম্ভব? সে বলে, "না।"

"কাল থেকে কিন্তু হামাকে আর দেখতে পাবে না।"

"কেন? তুমি কোন্ যমের বাড়ী যাচ্ছো?"

"হামি যাচ্ছি জগৎভালুপুর।"

"কেন?"

"অওডার এসেছে। হামরা তো নওকর আছি, যাঁহা হুকুম হোবে যেতে হোবে।"

"কবে ফিরছো?"

"কা মালুম? দোচার মাহিনা ভি হোতে পারে।"

হেমা মাথা নিচু কোরে কি যেন ভাবে। তারপর বলে, "বেশ। এলে দেখা হবে। এখন চলি।"

"যাবে?"

"হ্যাঁ।"

খানিক পরে হেমা মাথা তুলে দেখে পাঁড়েজী সেখানে নেই, ভেতরে চলে গেছে। কত বড় ব্যথা সে যে পেয়েছে তা আর বুঝতে তার বাকী রইলো না। কিন্তু সে কি করতে পারে?

অনেক দিন পরে আজ আবার অমরেশ এসেছে রমানাথ ভটচাষ্যির বাড়ী। সুমিত্রাকে একান্তে পেয়ে কথাপ্রসঙ্গে সে বলে, "দ্যাখো মিত্রা রাগ কোর না, তোমার বাবার কাজের বিচার করছি না, তিনি অন্যায় করেছেন তাও বলছি না। কিন্তু ভেবে দ্যাখো তিনি বেঁকে বসলেন বোলেই তো আরও অনেকে বেঁকে বসলো, আর ফলে আদ্দেক হোয়ে গেল আমাদের জমিদারি। আজ যদি আগের মতই আমাদের জমিদারি থাকতো কত ভাল হোত। আরও তোমাদের সাহায্য করতে পারতুম। কিন্তু এ কি হোল? ওই যে শচীনন্দন সামন্ত, ওর নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, সে এক সময়ে আমাদেরই সেরেস্তায় চাকরী করেছে। লোকটা এমনি নেমকহারাম যে সমানে আমার বিরুদ্ধে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। কত আক্ষেপের কথা এসব বলো তো!"

সুমিত্রার মনটা খুবই দুলে ওঠে। সাদরে সে তার মাথার চুলগুলিতে আঙুল

ব্লোতে থাকে, কিন্তু কোন কথা বলতে পারে না। যেন তাদের অপরাধের জন্য সেই অপরাধী এবং সেজন্যে সে ক্ষমা চাইছে।

অমরেশ চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ধোরেই সে অমরেশের কথাটা ভাবে। পিতার ওপর তার রাগও হয়। কি দরকারটা ছিল প্রজা হোয়ে জমিদারের সঙ্গে শত্রুতা করতে যাবার?

ভুলে যায় সুমিত্রা যে একসময়ে সেই তার মুখের ওপর তার বাবার সমর্থনে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিল।

জগদ্বল্লভপুর থেকে এইমাত্র খবর এসেছে প্রজারা একেবারে ঠাণ্ডা হোয়ে গেছে লেঠেলদের দেখে। পুলিস নিয়ে দারোগাবাবুও দু'একদিন ঘুরে গেছেন আর তার ফলে লোকে নাকি আরও ভয় পেয়ে গেছে। যারা ছিল গোলমালের সর্দার তারা তো লালপাগড়ী দেখে একেবারে উধাও।

অমরেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। গোমস্তা শ্রীকৃষ্ণবাবুকে সে জানিয়ে দিলো এরপর আর যেন আদায়ে কোনরকম গাফলতি না হয়।

আরও একটা খবর এসেছে—আরও আনন্দের খবর। লাটসাহেবের মেয়ে লিখেছে তার খেতাবের জন্যে তার মা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, খুব সম্ভব কৃতকার্যও হবেন।

অমরেশের উল্লাস আর ধরে না। শিস দিতে দিতে সে বারাণ্ডায় পায়চারি করতে থাকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কথাটা বন্ধুবান্ধব ও কর্মচারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। একটা ছোটখাটো ভোজেরও দিন স্থির হোয়ে গেল।

অমরেশ ম্যানেজারকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "আর একদিনও দেরী না ম্যানেজারকাকা। না হয় ঐ দশ নম্বর মৌজাটাই বাধা দিয়ে হ্যামিলটনের টাকাটা শোধ কোরে দিন।"

ম্যানেজার তৈরীই ছিলেন। জানালেন বন্ধকী কাগজপত্র তৈরী, টাকাও প্রস্তুত, কেবল যা সইয়ের অপেক্ষা।"

"এক্ষুনি নিয়ে আসুন কাগজপত্তর। আমি সই কোরে দিচ্ছি।"

রাত্রে শুতে যাবার আগে সে সলিল চৌধুরী ও আরও দু'একজন দূরের বন্ধুকে খবরটা জানাবার জন্যে চিঠি লিখতে বসলো। লাটসাহেবের মেয়েকেও ধন্যবাদ পাঠাতে ভুললো না। সলিলের চিঠিখানায় লিখলো তার বাবাকে মুখ্যমন্ত্রী-পদে আসীন দেখবার জন্যে সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। শেষে খামে পোরবার আগে পুনশ্চ দিয়ে আবার লিখলো · তার বাড়ীতে বোসে যে পাঁচ হাজার টাকা সে নিয়েছিল তা গত পরশু সে পাঠিয়ে দিয়েছে, দেরী হওয়ার জন্যে যেন সে কিছু মনে না করে।

সুমিত্রাকে তার বিবাহিত বান্ধবীরা প্রায়ই বলে, "অতোটা মাখামাখি বিয়ের আগে কিন্তু ভালো না।"

কথাটা সুমিত্রার মনে কাঁটার মতো বেঁধে। সে নিজেও যে জিনিসটা বোঝে না তা না। কিন্তু এমনি মজা, অমরেশকে বললে সে কানেই নেয় না, হেসে উড়িয়ে দেয়। কখনও বা বলে, "দাঁড়াও না। মা ফিরুক।" কখনও আবার বলে, "নাঃ, তোমার দেখছি আর সবুর সয় না।"

লজ্জায় সুমিত্রার কান লাল হোয়ে ওঠে।

তবু সে জিদ করে।

অমরেশ বলে, "বেশ। তা হোলে আর আসবো না।"

সেকি! সুমিত্রা কেঁপে ওঠে। তার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলে, "রাগ করলে?"

এবং তারপর অমরেশ যাই করুক সে আর আপত্তি করে না।

সুমিত্রার মনে কিন্তু ইদানীং একটা ভয় বড্ড উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে! তার কেবলই মনে হয় পুরুষের মন, যদি অন্যদিকে চলে যায়? মনে পড়ে অনেকদিন আগে জমিদারবাড়ীতে দেখা সেই রমণীটির কথা "কি জানি কেন, উনি আর আমায় আমল দিচ্ছেন না।" সে শিউরে ওঠে। তাকেও যদি অমরেশ না আর আমল দেয়? তা হোলে তার অবস্থা কি হবে? তার বাপমারই বা অবস্থা কি হবে? আর বান্ধবীরা, পড়শীরা, তারাই বা বলবে কি? যে খাতির, যে যত্ন আজ সে পাচ্ছে সকলের কাছ থেকে তা তখন আর থাকবে? লোকের কাছে যে তার মাথা হেঁট হোয়ে যাবে!

চিন্তাটা উঠতে বসতে শুতে সকল সময়েই তাকে খোঁচা দিচ্ছে।

কখনো কখনো অবশ্য সে নিজেকে এই বোলে সান্ত্বনা দেয় যে এ আশঙ্কা অমূলক। অমরেশ সে প্রকৃতির পুরুষই নয়। বরং যে তাদের জন্যে এতো করেছে তার সম্বন্ধে এমন ভাবাও পাপ।

সেদিন বিকেলে খাটের ওপর শুয়ে এইরকম নানা কথা সে ভাবছে। বলা বাহুল্য এখন আর তার সে ভাঙা তক্তপোষটি নেই। তার জায়গায় এসেছে নক্সা করা চকচকে সৌখীন পালঙ্ক।

সুমিত্রার পাশে পড়ে রয়েছে অমরেশের লেখা একরাশ চিঠি। কোনখানা শাদা, কোনখানা সবুজ, কোনখানা বা নীল। মাঝে মাঝে সে পরম আগ্রহে সেই পড়া চিঠিগুলিই আবার পড়ছে, কখনও বা আবার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছে। দেখছে সেই চিঠিগুলির মতোই ছোট ছোট নীল সবুজ শাদা মেঘ আকাশে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ এমন সময়ে শৈবলিনী এলেন।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি উঠতে যাবে, শৈবলিনী তাকে ধোরে শুইয়ে দিলেন।

সুমিত্রা চিঠিগুলো সরিয়ে পিঠের নীচে চেপে রাখলো।

ঝুঁকে পড়ে হাসতে হাসতে শৈবলিনী বলেন, "মেলাই চিঠি যে রে!"

সুমিত্রা হাসলো।

"আমায় দেখাবি না?"

সুমিত্রার মুখ রাঙা হোয়ে ওঠে : "যাও! তুমি বড় দুষ্টু। এক্ষুনি সকলকে বোলে দেবে।"

"আচ্ছা থাক্, দেখাতে হবে না। কিন্তু কি ব্যাপার বল্ তো? গরীব ঠাক্মার কথা একেবারে ভুলে গেছিস? এরই মধ্যে?"

সুমিত্রার মনে পড়লো সত্যিই অনেক দিনই তাঁর কোন খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। অথচ সকল সময়ে সকল বিপদে-আপদে এই রমণীই কিনা বুক দিয়ে পড়ে তাদের সাহায্য করে এসেছেন। প্রতিবেশিনীরা অপমান করেছে তিনি ছুটে এসেছেন, পাওনাদাররা রেগে গেছে তাদের বুঝিয়েছেন, সন্ধ্যা হোলে পা টিপে টিপে এসে তার চুল বেঁধে দিয়ে গেছেন। ঘরে যখন হাঁড়ি চড়তো না, চুপি চুপি যা পারতেন এনে দিতেন, অঙ্কুশেও কেউ জানতে পারতো না সেকথা। ইস্, এমন অকৃতজ্ঞ সে! এমনই হৃদয়হীন! যেই অভাব ফুরিয়ে গেল অমনি অসময়ের বন্ধুকে গেল ভুলে:

অনুতপ্তচিত্তে সুমিত্রা তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর হাত দুখানি দিয়ে তাঁর কোমরটা সাদরে জড়িয়ে ধোবে বললে, "ঘাট হয়েছে ঠাক্মা, ক্ষমা করো।"

"তবু ভালো লো! কিন্তু আর দুদিন পরে যখন জমিদারের বৌ হোয়ে বসবি তখন এটুকুও আর করবি না।"

"অমন কথা বোল না ঠাক্মা," বলতে বলতে সুমিত্রার চোখ জলে ভরে উঠলো।

শৈবলিনী সস্নেহে তার ঢলঢলে চোখদুটির দিকে চেয়ে রইলেন।

হঠাৎ সুমিত্রা জিগগেস করে, "তোমার কি কোন অসুখ করেছে ঠাক্মা? মুখখানা যে বড় শুকনো দেখাচ্ছে?"

"কেন বলিস দিদি, আজ সাতদিন ধোরে ছেলেটার সঙ্গে কেবলই বকাবকি ঝকাঝকি চলেছে। প্রাণ অতিষ্ঠ হোয়ে উঠেছে। যেতে পারলে এখন বাঁচি।"

"কেন, রাধুকাকা কি তোমায় আজকাল তেমন দেখে না?"

"হ্যাঁ, দেখবে! যত বয়েস হচ্ছে মতিগতি ওর কেমন অন্যরকম হোয়ে যাচ্ছে।"

শৈবলিনীর চোখে জল এলো। সুমিত্রা নিজের আঁচল দিয়ে তাঁর চোখদুটি মুছিয়ে দিতে দিতে বললে "কেঁদো না ঠাক্মা, তুমি এখানে এসে থাকো। বলো তুমি আমার কাছে থাকবে? আমি তোমায় খুব যত্ন করবো।"

বলতে বলতে আরও দৃঢ় বন্ধনে সে শৈবলিনীর কোমরটা জড়িয়ে ধরলো।

"তাই ভালো দিদি। আর ওখানে আমার মন টেঁকছে না। কিন্তু এখন না। নওগাঁর প্রাসাদ আলো করে যেদিন তুই গিয়ে ওখানে বসবি সেইদিন।"

দুজনেই দুজনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বাইরে তখন বিদায়ী দিনের শেষ আলোটুকু গাছের পাতায় ঝিরিঝিরি কাঁপছে।

এ ক'দিন ধোরেই অমরেশের চোখে ঘুম আসছে না। কেন, কোন দুঃসংবাদ পেয়েছে কি? মার অথবা আর কারও?

রাত অনেক হোয়ে গেছে। বাইবে চারদিক নিস্তব্ধ। কেবল যা মাঝে মাঝে একটানা ঝিঁঝির ডাক ভেসে আসছে।

অমরেশের সামনে ইংরিজীতে টাইপ করা একখানা চিঠি।

চিঠিখানা তুলে নিয়ে সে পড়লো। এইবার নিয়ে তিনবার পড়লো। তারপর ঘৃণাভরে ছুড়ে ফেলে দিলো। খানিকক্ষণ কি ভাবলো। আবার তুলে নিয়ে পড়লো। আবার ঠিক তেমনি ঘৃণাভরেই ফেলে দিলো।

এক দারুণ দুশ্চিন্তা অমরেশকে অধিকার কোবে বসেছে। তার চুল উস্কো-খুস্কো, চোখ লাল। মাঝে মাঝে টেবিলেব ওপর বাখা বোতল থেকে মদ ঢেলে সে খাচ্ছে, মাঝে মাঝে চুলগুলো আঙুল দিযে টানছে, আবাব মাঝে মাঝে আপন মনে কি যেন বকছে।

"না, না, এ ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্র ছাড়া আব কিছুই না।" হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলো।

বাইবে আকাশের দিকে একবার চাইলো। অগণিত তারা। তাবাগুলো যেন ফিসফিস কোবে কি বলাবলি করছে।

'ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্র! সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।" বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ালো। আবাব বসলো। আবার মদ খেতে লাগলো।

যে জিনিসটা তাকে এমন বিচলিত কোবে তুলেছে তা হচ্ছে ঐ চিঠি। চিঠি-খানা লিখেছেন কোলকাতার একজন বিশিষ্ট এটর্নি। চিঠির সাবমর্ম এই· "অমরেশ যখন কোলকাতায থেকে পড়াশুনা করতো সেই সময়ে এক অধ্যাপকের মেয়ের সঙ্গে তাব ঘনিষ্ঠতা হয়। ঘনিষ্ঠতার ফলে তাদেব একটি পুত্রসন্তান হয়। তারপর বহুদিন কেটে গেছে। এর মধ্যে সে তাদের না নিয়েছে খোঁজ, না দায়িত্ব। মাঝে একবাব অধ্যাপক-কন্যা নিজে এসেছিল তার প্রাসাদে তাকে তার দায়িত্বেব কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু সে গ্রাহ্য কবেনি। এটর্নি জানিয়েছেন যদি সে অবিলম্বে তাদের স্বীকার না করে ও দাযিত্ব না নেয তাব বিবুদ্ধে দেড় লক্ষ টাকার খোরপোশের দাবী কোরে মামলা দায়ের কবা হবে।"

বটে! মগের মুল্লুক নাকি! দেড লাখ টাকা! ওরা ভেবেছে কি? অবশ্য হ্যাঁ, যা হোযে গেছে অমরেশ অস্বীকাব করছে না। কিন্তু ও তো একটা আকস্মিক ঘটনা। চলতে চলতে অমন কতোই তো হয়। তাই বোলে সারা জীবন ধোরে সেইটেকে গোরুর যোয়ালের মতো ঘাড়ে বযে বেড়াতে হবে?

হ্যাঁ, নিভা দাসগুপ্তকে এক সময়ে সে সত্যিই ভালোবেসেছিল। এও ঠিক যে নিভার ও সন্তান তারই ঔরসজাত। কিন্তু অতীত অতীত। এক সময়ে সে যে ক্রিকেট খেলা ভালোবাসতো। তাই বোলে কি আজও ব্যাট কাঁধে কোরে ক্রিকেট খেলতে যেতে হবে? না, না, এ হোতে পারে না। নিভাকে সে নিজের স্ত্রী বোলে স্বীকার করতে পারে না। তার ও তার ঐ ছেলের দায়িত্ব সে নিতে পারে না। তবে হ্যাঁ, যদি কিছু সাহায্য চায়, দিতে পারে।

হঠাৎ তার মনে পড়লো হয়তো ওরা আদালতে প্রমাণ হাজির করতে পারে। টেবিলের ওপর সজোরে এক মুষ্ট্যাঘাত কোরে সে বোলে উঠলো, "যাহান্নামে যাক প্রমাণ! কি করতে পারে আদালত? ওরা বলছে তো মামলা করবে? করুক। দেখা যাক কত পয়সা ওদের আছে।"

উকিল হবনাথ ঘোষালের ডাক পড়েছে! ডাক পড়েছে ম্যানেজারেরও।

অমরেশ প্রথমটা ভেবেছিল জিনিসটা গোপন রাখবে কিন্তু পরে ভেবে দেখলো তা সম্ভব নয়, কারণ পরামর্শ তো চাই, ব্যবস্থাও করতে হবে, লজ্জা করবার সময় এখন কই?

হরনাথ ঘোষাল ওদের মাইনে-করা উকিল। প্রবীণ ব্যক্তি। জমিদারি সংক্রান্ত সাধারণ মামলা-মোকদ্দমা উনিই দেখেন। কেবল যখন কোন জটিলতা দেখা দেয়, বড় উকিল বা ব্যারিস্টার নিযুক্ত করা হয়।

এটর্নির চিঠি পড়ে ও সমস্ত বিষয় শুনে হরনাথ বললেন, "এক কাজ করা হোক, এইসব কেস লড়েন এমন একজন ব্যারিস্টারেব সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ কবা যাক।

ম্যানেজারও তাঁর মত সমর্থন করলেন। স্থির হোল উকিলকে নিয়ে অমরেশ কোলকাতায় যাবে।

পরদিনই তারা বেরিয়ে পড়লো। হাওড়া স্টেশন থেকে তাদের তুলে নিয়ে ট্যাক্সি ছুটলো এটর্নি-ব্যারিস্টারদের পাড়ায়।

ব্যারিস্টার সত্যজিৎ বোস সব শুনে পরামর্শ দিলেন "আপস করুন।"

সেকি! অমরেশ রাজী হোল না। বললে, "কেন? যদি মামলা করি হার হবে?"

"নাও হতে পারে।"

"তবে পিছোচ্ছেন কেন?"

বোস সাহেব হাসলেন। "পিছনো আমাদের কাজ নয় মিস্টার রায়। আমরা সকল সময়ে এগিয়েই চলি।"

একখানা চেক তাঁর সামনে রেখে অমরেশ বললে, "বেশ। তাহোলে মামলার জন্যেই প্রস্তুত হোন। আমি পরশু আবার আপনার সঙ্গে দেখা করছি।"

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর তারা বিদায় নিল। তারপর রাত্রিটা গ্র্যান্ড হোটেলে কাটিয়ে পরদিন সকালে অমরেশ উকিলকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

পূর্বনির্দেশ মতো রেলওয়ে স্টেশনে গাড়ী মোতায়েনই ছিল। ফটকের কাছাকাছি আসতেই অমরেশ দেখে লোক গিসগিস করছে। সে উদ্বিগ্ন হোয়ে ওঠে। এতো মানুষ কেন? কিছু হোল না কি?

অতীতের স্মৃতি তার মনে ভেসে উঠলো—মনে পড়লো সেইদিনের ছবি যেদিন সে বাগদীদের সেই ছেলেটাকে চাপা দিয়েছিল।

কিন্তু না। সে জনতা আব এ জনতা এক নয়। এদের মুখেচোখে সেরকম উত্তেজনা নেই।

তাকে দেখেই সকলে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলো। "জমিদাব এয়েছেন! জমিদার এয়েছেন!" গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো।

"কি ব্যাপার?" কুতূহলী হোযে সে জিগগেস করে।

ম্যানেজাব এগিযে এলেন, বললেন, "প্রজারা অভিনন্দন জানাতে এসেছে।"

"কেন?"

প্রশ্ন শুনে লোকেরা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

অবশেষে ম্যানেজারবাবুই বললেন, "কাগজে বেরিয়েছে সরকাব বাহাদুর আপনাকে রাজা খেতাব দিতে মনস্থ করেছেন, সেইজন্যে।"

"কই আমি তো কিছু জানি না!"

পাশ থেকে একজন বোলে উঠলো "এজ্ঞে আমরা আগে থেকেই কিছু কিছু শুনেছিলুম, তারপর আজ সকালে কাগজে দেখলুম।"

"তা বেশ। বেশ। আমি খুবই আনন্দিত হলুম। কিন্তু খেতাব তো এখনও পাইনি। পেলে নিশ্চযই একদিন আনন্দ-উৎসব করা যাবে। কি বলেন?"

জনতা চিৎকার কোরে উঠলো: "জয রাজা অমরেশ রায়ের জয়!"

অমবেশের বুক আনন্দে দুলে উঠলো। একদিন তার বাবাকেও প্রজারা এইভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিল। বাপেব ধারা সে যে বজায় রাখতে পেরেছে তা ভেবে সে গর্ব বোধ কবতে লাগলো।

চাকবরা তাব বসবার জন্যে তাড়াতাড়ি একখানা আরামকেদারা এনে দিলো। দুখানা চেযারও এনে দিলো উকিল ও ম্যানেজারবাবুব জন্যে।

উৎফুল্ল অমরেশ যা কখনও করেনি—প্রজাদের ডেকে ডেকে আলাপ করতে লাগলো। প্রজারাও কৃতার্থ হোয়ে গেল যেন।

কিছুক্ষণ পরে জনতা বিদায নিল। সবিনযে ম্যানেজারবাবু জিগগেস করলেন ব্যারিস্টব কি পরামর্শ দিলেন।

"পরামর্শ আর কি? তাঁকে একেবারে মামলার জন্যে তৈরী হোতে বোলে এলুম।"

হরনাথবাবু: "আপনি ঠিকই করেছেন। আমি যতই ভাবছি ততই যেন কতকগুলো পয়েণ্ট আমাদের অনুকূলে দেখতে পাচ্ছি।"

"পাবেন বইকি হরনাথবাবু। তবে ঐ যা বললেন, ভাবতে হবে। শাদাকে কালো আর কালোকে শাদা করতে যদি নাই পারলেন তা হোলে কিসের জন্যে উকিল ব্যারিস্টার হয়েছেন আপনারা?"

হো হো কোরে হেসে উঠে হরনাথবাবু বললেন, "তা ঠিক! তা ঠিক!"

চা এলো। সামনে টেবিল পেতে তার উপর চা কেক সন্দেশ প্রভৃতি সাজিয়ে দেওয়া হোল।

আনন্দের আতিশয্যে অমরেশ কর্মচারীদেরও খাবার জন্যে আহ্বান করলো। তারা তো বর্তে গেল।

কথাপ্রসঙ্গে ম্যানেজার বললেন, "একটা কথা বলতে বড্ড ভুল হোয়ে গেছে বাবাজী। রানীসাহেবা এসেছেন।"

"মা এয়েছেন? কখন?"

"কাল।"

"কই আসবার আগে তো মা কিছু জানাননি? কোন অসুখ বিসুখ—'

"না, ওসব কিছু না। এম্নি মন টেঁকছিল না বোলে চলে এলেন।"

"তাহোলে এখন উঠি। মার কাছে যাই।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবাজী। নিশ্চয়ই রানীসাহেবা অপেক্ষা করছেন।"

অমরেশ প্রাসাদের দিকে চলে গেল।

অন্দরে পা দিতেই মার সঙ্গে দেখা।

দুজনেরই চোখে জল।

মার পায়ের ধুলো নিতে নিতে অমরেশ বলে, "এদ্দিনে রাগ পড়লো মা তাহোলে?"

তার চিবুকে হাত দিয়ে হাতখানা নিজের ঠোঁটে ঠেকাতে ঠেকাতে মা বললেন, "ছেলের ওপর মা কখনও রাগ করে রে অবুঝ ছেলে?"

"তবে চলে গেলে কেন?"

"তুই যে আমার কথা শুনিস না বাবা," বলতে বলতে আবেগভরে নিরুপমা ছেলের মুখখানা নিজের বুকে টেনে নিলেন।

অমরেশ আর কথা না বাড়িয়ে মার বুকে মাথাটি রেখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে মা বলতে লাগলেন, "তুইও বা কোন্ একবার গিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিলি এই ক'মাসের মধ্যে? মার ওপর এই তো টান!"

সাদরে মার কোমরটি জড়িয়ে ধোরে সে বললে, "আমি অনেকবার ভেবেছি মা যাবো। চিঠিতেও মাঝে মাঝে যাবো বোলে জানিয়েছি দেখেছ তো? কিন্তু তোমায়

কি বলবো এত কাজ যে কিছুতেই সময় কোরে উঠতে পারি না। এই দ্যাখো না কাল সকালে বেরিয়েছি, এই ফিরছি।”

“তাতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু ইস্! কি চেহারা করেছিস বল্‌তো?”

“তা হবে না মা? তুমি নেই। কে যত্ন করবে বলো?”

“তা সত্যি বাবা, তা সত্যি।”

বিকেলে বারান্ডায় বোসে মায়-পোয় আলোচনা চলেছে।

চা খেতে খেতে অমরেশ জিগগেস করে, “কাশী থেকে কি নিয়ে এলে মা?”

“ওটা কি খাচ্ছিস?”

“এই তোমার কাশীর? এ আর এমন কি ভালো?”

“না, শুধু শুনতেই। খাবারদাবাব এখন অনেক নিরেস হোয়ে গেছে। আমরা ছেলেবেলায় যা খেয়েছি সে জিনিস আব নেই।”

হঠাৎ বাগানে ক্রীড়ারত হরিণগুলির দিকে চোখ পড়তেই মা প্রশ্ন করেন, “এগুলো কিনেছিস না কি রে?”

“হ্যাঁ মা। একজোড়া ময়ূরও কিনেছি। তুমি দ্যাখোনি বোধ হয়?”

“হ্যাঁ দেখেছি, কাল বাগানে বেড়াতে বেড়াতে।”

“আর আমার জ্যাককে?”

জ্যাকের নাম হোতেই জ্যাক ল্যাজ নাড়তে নাড়তে শব্দ করতে করতে এসে তার কোলে মাথাটি রাখলো।

মা বললেন, “বেশ সংসাব সাজিয়েছিস। এখন এদিককার খবর কি বল্।”

“খবর মা বিশেষ কিছু না। তবে প্রজাবা বড্ড ত্যাঁদড়ামি করছে।”

“কি বকম?”

“বলছে এ বছর ফসল ভালো হয়নি, খাজনা দিতে পারবে না।”

“ওসব ন্যাকামি শুনিসনি। তোকে ওবা নতুন আর ছেলেমানুষ পেযে এই রকম করছে। দেখেছিস তো ওঁব সময়ে কেউ টুঁশব্দটি পর্যন্ত করতে সাহস করতো না।”

হাসতে হাসতে অমরেশ বলে, “সে আর আমায বলতে হবে না মা।”

“হ্যাঁ বাবা, তোমায় কড়া হোতে হবে। ওঁর সময়েও গোড়ায় গোড়ায় প্রজারা এইরকম বেঁকে বসেছিল। তারপর যখন দেখলো শক্ত মাটি, সোজা হোল।”

“আমিও তোমার আশীর্বাদে সোজা করতে জানি মা। সেই বাবারই তো ছেলে আমি।”

নিরুপমার উদ্বেগ প্রশমিত হোল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবলেন, তাবপর প্রশ্ন করলেন, “আদাযের কি ব্যবস্থা করছিস?”

“লাঠি পাঠিয়েছি।”

"ঠিক আছে। তবে কুশলীও হোতে হবে জানিস তো? জমিদারি চালানো সোজা কথা নয়।"

অমরেশ চায়ের কাপটি নিঃশেষ কোরে টেবিলের ওপর রাখলো।

"তারপর আর সব খবর কি বল্। তখন তো দেখলুম লোকে লোকারণ্য কাছারির সামনে। সত্যিই তা হোলে খবরটা কাগজে বেরিয়েছে?"

অমরেশ হাসতে হাসতে যেন কিছুই জানে না এমনি ভাবে বলে, "কি খবর মা?"

"তুই রাজা খেতাব পাচ্ছিস?"

"তুমি শুনে খুশী হোয়েছ তো?"

"কোন্ মা না খুশী হয় রে? ছেলের গৌরবেই তো মার গৌরব।"

"কিন্তু আমি তো মা দেখিনি। তবে যখন এত লোকে বলছে, হোতে পারে।"

খুশিতে মার মন ভরে উঠলো, বললেন, "ম্যানেজারবাবুও আমায় সেদিন চিঠিতে লিখেছিলেন সম্ভাবনা ষোল আনা।"

"হ্যাঁ, কয়েকদিন আগে লাটসাহেবের মেয়েও তাই লিখেছেন বটে।"

হঠাৎ মার উল্লাস উদ্বেগে পরিণত হোল :

"ও বেটীর হারের টাকা শোধ হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"শুনলুম শোধ করতে নাকি একখানা মৌজা বাঁধা দিতে হয়েছে?"

"তা ছাড়া আর উপায় ছিল না যে মা।"

"কিন্তু কি কোরে এখন উদ্ধার করবি?"

"দেখি।"

"কি দেখবি বল্? এই তো জমিদারির অবস্থা। তারপর এসে আবার যা শুনলুম তাতেও তো মনে এতটুকু শান্তি পাচ্ছি না।"

অমরেশ ঠিক বুঝতে পারলো না মা কি বলতে চান। সে চুপ কোরে রইলো।

"ব্যাপারটা কি তাহোলে সত্যি?" মা জিগগেস করেন।

"কি মা?"

"কে এক অধ্যাপকের মেয়ে নাকি—"

কথাটা তাঁর জিভে বেধে গেল। থেমে গিয়ে তিনি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন "আমায় লুকোসনি বাবা, বল্।"

তবু সে নীরব, মাথাটি নীচু কোরে বসে থাকে।

তাকে চুপ থাকতে দেখে নিরুপমা আরও উদ্বিগ্ন হলেন, "চুপ রইছিস কেন বাবা, বল্।"

"হ্যাঁ মা, সত্যি।"

"অ্যাঁ! তা হোলে? এও তো এক বিপদ! এখন উপায়?"

মা ও ছেলে দুজনেই নীরব। অনেকক্ষণ পরে নিরুপমা মুখ খুললেন: "আদালতে না গিয়ে মিটিয়ে নেওয়া যায় না?"

"তার মানে তো লাখ দেড়েক টাকা। ওরা তাই দাবি করছে।"

"সর্বনাশ!"

মা গুম হোয়ে বসে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার বললেন, "তা হোলে এখন কি করবি? ব্যারিস্টার কি পরামর্শ দিলেন?"

"আপস করতেই প্রথমে বলেছিলেন। কিন্তু শেষে স্থির হোল মামলাই করা হবে।"

"কিন্তু যদি হার হয়?"

"হার যে হবেই এমন তো কথা নয়।"

"হোতেও পারে তো?"

"তা পারে।"

"তখন? তখন কি করবি? আবও দুখানা মৌজা নষ্ট করবি? ওবে আহাম্মক ছেলে! এ কি করছিস? কোথায় গিযে দাঁড়াবি?"

"আঃ মা, অধীর হোযো না।"

"অধীব না হোযে করি কি বল্? আমি যে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যতে আমাদেব ভাগ্যে কি তোলা আছে।"

"ভাগ্যে যদি তা থাকেই মা তবে কেঁদে আব কি হবে বলো?"

"ওরে অবুঝ! ওবে—"

এমন সময়ে সিঁড়িতে পাযেব শব্দ পেযে অমরেশ তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "ঐ দেখ মা আমাব বন্ধুবা সব আসছে। তোমার পায়ে পড়ি মা, তুমি শান্ত হও, আর না হয়তো এখন যাও, পরে রাত্তিবে আবার আলোচনা হবে।"

বিষণ্ণ হৃদযে মা চলে গেলেন।

সন্ধ্যার পব নিবুপমা লক্ষ্য করলেন অমরেশ বন্ধুবান্ধবদের বিদায় দিয়ে মোটরে কোবে একা বেবিযে গেল। সঙ্গে ড্রাইভাবও নিলো না। কাশী থেকে ফিরে এসে অবধি তিনি লোকজনের কাছ থেকে যেসব কথা শুনেছেন তা থেকে সহজেই অনুমান করতে পারলেন সে কোথায় গেল। এক দারুণ অশান্তিতে তিনি ছটফট করতে লাগলেন।

অন্যমনস্ক হবার জন্যে তিনি চেষ্টা করলেন সংসারের কাজে মন দিতে। কিন্তু মন বসলো না। কখনো নিজেব ঘরে, কখনো বা বারাণ্ডায়, এমনি কোরে সময় কাটাতে লাগলেন।

অমরেশ ফিরলো অনেক রাত্রে। খাবার ঘরে সে আর গেল না। তার বদলে

তারই ঘরের সামনে বারাণ্ডায় বোসে টেবিলের ওপর খেয়ে নিলো। আজকাল অধিকাংশ সময়ে সে এইখানেই খায়।

নিরুপমা উপস্থিত হলেন।

"তুমি এখনও শোওনি মা?" অমরেশ জিগগেস করে।

"না। তুই যে বললি রাত্তিরে আলোচনা করবি।"

অমরেশ চুপ কোরে রইলো। প্রকৃতপক্ষে আর আলোচনা করতে সে চাইছিল না, বরং ভয়ই পাচ্ছিল পাছে আবার কথাকাটাকাটি কিংবা তার চেয়ে বড় কিছু একটা হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মাই শুরু করলেন, সম্পূর্ণ অন্য কথা দিয়ে·

"শুনলুম আজকাল এইখানেই খাস?"

"হ্যাঁ মা। অতবড় খাবার ঘরে একলাটি বোসে খেতে আর ভালো লাগে না।"

"তা বে থা করবি না, একলাটি লাগবে না তো কি?" হাসতে হাসতে মা বলেন।

অমরেশও হাসতে লাগলো।

একটু চুপ থেকে মা জিগগেস করেন, "কোথা গেছলি?"

"তেমন কোথাও না মা, এই একটু এদিক-ওদিক বেড়িয়ে এলুম।"

মা বুঝতে পারলেন অমরেশ গোপন করলো। গায়ে না মেখে তিনি অন্য কথা পাড়লেন, "ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তা হোলে কি ভাবছিস?"

"ভবিষ্যৎ? সে তো এখন অনেক দূরে মা।"

"তুই কি তা হোলে তোর নিজের অবস্থা কিছুতেই বুঝবি না বোলে পণ করেছিস?" রাগত স্বরে মা এবার বললেন।

"তা কেন মা? কিন্তু কি ব্যাপার বল তো? তোমায় এসে অবধি কেবলই উতলা দেখছি। কেন বলো তো?"

"উতলা না হোয়ে যে আমি পারছি না বাবা। তুইই দ্যাখ্, এই এতটুকুন সম্পত্তি, এর ওপর যদি অত চাপ ফেলিস্ তা হোলে তা কতক্ষণ? যে কোন মুহূর্তেই তো তা হাত থেকে বেরিয়ে যাবে।"

অমরেশ উত্তর দিলো না।

মা বলতে লাগলেন, "ধর্ যদি এই মামলায় হার হয়, কি দিয়ে তখন ঠেকাবি? জমিদারির আয় কমছে বই বাড়ছে না। একখানা মৌজা বাঁধা গেছে, আবার দু'-খানা যাবে তো?"

"কিন্তু মামলায় যে মা হার হবেই এ তুমি ধোরে নিচ্ছো কেন?"

"দ্যাখ্ অমু, তুই এখনো ছেলেমানুষটিই আছিস, সংসার সম্বন্ধে এখনও কিচ্ছু শিখিসনি, তাই এমন কোরে কথা বলছিস। মামলায় নামতে হোলে হারের জন্যে প্রস্তুত হোয়েই নামতে হয়।"

"কিন্তু যা হোয়ে গেছে মা—"

"আমি তা বুঝি। সেজন্যে আমি তো দোষ দিচ্ছি না। এমন কি এই ব্যাপারটায় যদি লাখখানেক টাকা খরচও হোয়ে যায় তাতেও আমি আপত্তি করবো না। কিন্তু কথা হচ্ছে সেই সঙ্গে টাল সামলাবার জন্যেও তো কিছু করা দরকার। না করলে যে পথে বসবি! সে দিকটায় খেয়াল দিচ্ছিস না কেন? চোখকান বুজে এভাবে বোসে থাকা কি উচিত হচ্ছে? এই দেখেই তো আমার মাথা খারাপ হোয়ে যাচ্ছে।"

"কিন্তু মা আমি যে সে সম্পর্কে উদাসীন তা ভাবছো কেন? দ্যাখো না জমিদারি হাতে নিয়ে অবধি খাজনা এক পয়সাও বাকী ফেলতে দিচ্ছি না। সম্প্রতি বাড়তি লোক ছাঁটাই করেছি। কর্মচারীদের খুব কড়া নোটিস দিয়েছি প্রজাদের আবেদন নিবেদন ওজর আপত্তি কিছুই শোনা হবে না। যদি দরকার হয় লাঠি পর্যন্ত চালাতে হবে। বলো আমি আর কি করবো?"

মৃদু হাসতে হাসতে মা বলেন, "করবার আরও আছে। কিন্তু আমার কথা তো শুনবি না।"

"কেন শুনবো না? বলো।"

"শুনবি?"

"শুনবো।"

"তা হোলে শোন্। সেই যে কাশী যাবার আগে বলেছিলুম... ওকি! কি হোল? অমন কোরে চেয়ে আছিস কেন?"

ঘুরেফিরে মা যে সেই অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গেই আসবেন অমরেশ তা কল্পনাও করতে পারেনি। বললে, "তোমার পায়ে পড়ি মা, আর যা বলবে আমি শুনতে প্রস্তুত, কেবল ঐ পেত্নীটাকে বিয়ে করতে আমায় বোল না। ও আমি পারবো না।"

মা গম্ভীর হোয়ে গেলেন "তবে যা ভালো বুঝিস কর্। ভালো পরামর্শ তুই যে নিবি না তা তো আমি জানিই।"

মার কণ্ঠে ধ্বনিত হোল আক্ষেপের সুর।

"কিন্তু মা তুমিই বুঝে দেখ।"

"আমি বুঝে দেখেছি। তোমার তো বাছা একমাত্র যুক্তি সে দেখতে কুৎসিত। কিন্তু বলি দেখতে কি পাচ্ছো না জীবনকে উপভোগ করতে হোলে রূপ নয়, টাকারই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।"

অমরেশ চুপ কোরে থাকে। তাকে এবার যেন একটু চিন্তান্বিত দেখায়।

মা বোলে চলেন, "শোন্। বারবার অমন হঠকারিতা দ্যাখাসনি। আমি অনেক বোলে কয়ে মেয়ের বাপকে আজও ঠেকিয়ে রেখেছি। নেহাত একটা দূরসম্পর্ক আছে বোলে আর তোকেও কেমন নজরে লেগে গেছে তাই ভদ্রলোক এদ্দিন সবুর কোরে আছেন। আর কিন্তু করতে রাজী নন। হালে আমায় চিঠি লিখে জানিয়েছেন আর দু'এক সপ্তার মধ্যে যদি চূড়ান্ত উত্তর না পান তা হোলে অন্যত্র চেষ্টা করবেন।

আমি সেই জন্যেই তোকে আর একবার বোঝাবার জন্যে ছুটতে ছুটতে আসছি। আমার কথা শোন্। লক্ষ্মী ছেলে, অবুঝ হোসনি, একটু ধীরভাবে ভেবে দ্যাখ্, বার্ষিক আড়াই লাখ টাকা আয়ের এই সম্পত্তি নিবি না ফেলে দিবি? সবই নির্ভর করছে তোর একটা 'হাঁ-না'র ওপর।"

বার্ষিক আড়াই লাখ টাকা! ছবিটা অমরেশের চোখের সামনে ভাসতে থাকে। এর আগেও অবশ্য আরও কয়েকবার নিরুপমা তার চোখের সামনে ছবিটা তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু তখন যেন সে অত ভালো কোরে দেখবার অবকাশই পায়নি। অথবা হয়তো তখন সে দেখতেই চায়নি। তা ছাড়া আরও একটা কথা। তখনকার অমরেশ আর এখনকার অমরেশের মধ্যে অনেক তফাত। এই ক'মাসে তার অভিজ্ঞতা অনেক বেড়ে গেছে, পুরোন ধারণা অনেক বদলেছে, নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সে আরও সচেতন হোয়ে উঠেছে। সে বুঝেছে আরও টাকা, আরও ঐশ্বর্য না হোলে তার চলবে না।

কিন্তু মনের মধ্যে তবুও একটা 'কিন্তু' থেকে যাচ্ছে যে। অনেকক্ষণ চুপ থেকে সে বলে, "কিন্তু মা সারা জীবন যাকে নিয়ে ঘর করবো—"

মা নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেন না। অধীরভাবে বোলে ওঠেন, "কেন বকছো বাছা? একজনকে নিয়ে তো তোমাদের বাড়ীর কেউ সারা জীবন কাটায়নি। তুমি যে কাটাবে সে নিশ্চয়তা কোথায়? তা হোলে বলো কেন ঐ অধ্যাপকের মেয়েটাকে ভাসালে?"

লজ্জায় অমরেশের কান রাঙা হোয়ে ওঠে। মাথাটি হেঁট কোরে সে বলে, "তখন যে মা আমার বয়সও কম ছিল, জ্ঞানও কম ছিল।"

"বেশ এখন? এখন কি করছো ঐ রমানাথ ভটচায্যির মেয়েকে নিয়ে?"

অমরেশ উত্তর দিতে পারে না।

দাঁড়িয়ে উঠে মা বলতে থাকেন, "যা খুশি তোমার করো গে। আর তোমার কোন কিছুতেই আমি থাকছি না।"

বলতে বলতে আবেগের মাথায় তিনি চলে গেলেন।

মার কথাগুলি অমরেশের মনে গভীর রেখাপাত করেছে। তিনি যা বললেন তার এক বর্ণও সে কাটতে পারছে না। অধিকন্তু তিনি যা বলেছেন তা যে তারই স্বার্থে, তারই ভালোর জন্যে তাও তো অস্বীকার করবার নয়।

তবু, তবু তাঁর প্রস্তাবে কেমন করে রাজী হওয়া যায়? সে বারান্দায় পায়চারী করে আর ভাবে। কখনও বা চেয়ারটার ওপর এসে বসে।

মুশকিল এই যে মাকে সব কথা বলাই যাচ্ছে না! কিন্তু মাই বা কেন তার মনের কথা বুঝতে চাইছেন না? মা কি বোঝেন না ঐ কুৎসিত কালো মেয়েটাকে বিয়ে করলে তার ছেলেমেয়েও কুৎসিত হোতে পারে? তাদের বংশে কুৎসিত বোলে

কেউ নেই। সবাই, প্রত্যেকেই সুন্দর। এবং এইটাই তাদের বৈশিষ্ট্য। সে বৈশিষ্ট্য কি তা হোলে জলাঞ্জলি দেবে? না, না, এ হোতেই পারে না—তার বংশধররা, নওগাঁর প্রাসাদের উত্তরাধিকারীরা কুৎসিত-দর্শন হবে এ হোতেই পারে না।

আরও একটা কথা মাকে বোঝানো যাচ্ছে না। যদি কোন মেয়েকে তার ভালো না লাগে সে তাকে ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রে তো তা হবে না, তাকে যে সকল সময়ে জড়িয়ে নিয়ে চলতে হবে। যেমন ধরো অধ্যাপকের কন্যা ঐ নিভার কথা। মা ওকে নিয়ে বেশ দু'কথা শোনালেন বটে, কিন্তু তাকে যদি তার আর ভালো না লাগে সেটা কি তার অপরাধ?

তবে হ্যাঁ, ঐশ্বর্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মা যা বলেছেন তা খুব ঠিক। সেও তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছে। যখন তাদের সম্পত্তি ভাগ হয়নি, যখন সবটাই ছিল তার বাবার কর্তৃত্বে তখন কতো সচ্ছলতাই না ছিল! তার বাবাকে কখনো সে হিসেব কোরে খরচ করতে দেখেনি। কিন্তু তাকে কি করতে হচ্ছে? এইতো সেদিন লাটসাহেবের মেয়েকে একটা হার কিনে দিতে তার জিভ বেরিয়ে গেল। নিরুপায় হোয়ে শেষ পর্যন্ত একটা মৌজাই বাঁধা দিতে হোল। শীঘ্রই আবার হয়তো ঐ নিভা দাসগুপ্তের ব্যাপারটায়ও বেশ একটা মোটা রকমের ধাক্কা খেতে হবে। মার কথামতো যদি সত্যিই হার হয় তো কথাই নেই। অবশ্য একটা রাস্তা আছে—মিটিয়ে নেওয়া। তা সেদিকেও যে বড় অল্প হবে তা মনে হচ্ছে না। শুধু মাথাটাই হেঁট হবে।

নাঃ আর সে ভাবতে পারে না! এতো অল্প আয়ে কখনো চলা যায়? তার মাথা গরম হোয়ে ওঠে। চেয়ার ছেড়ে সে উঠে পড়ে।

ওদিকে নিজের ঘরের জানলা থেকে মা দেখেন যদিও অনেক রাত হয়েছে এবং পশ্চিম আকাশে চাঁদও ঢলে পড়েছে, কিন্তু অমরেশ তখনও পায়চারি করছে। মার হৃদয় অস্থির হোয়ে ওঠে। এখনও সে ঘুমোয়নি? পরক্ষণেই ভাবেন : নাঃ, ভাবুক, ভাবুক একটু, না ভাবলে মানুষ কখনো নিজের অবস্থা ঠিক বুঝতে পারে না।

সে রাত্রি আর অমরেশ ঘুমুতে পারলো না। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা এলো বটে কিন্তু আর শয্যা গ্রহণ করা যায় না। কারণ আজ সকালের ট্রেনেই তাকে কলকাতায় যেতে হবে, ব্যারিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে।

আরও একটা খুব জরুরী কাজ আছে। সেটাও সারতে হবে। কিছুদিন আগে বন্ধু সলিল তাকে লিখেছে তার বাবার ভারী অসুখ। তারপর পর পর আরও কয়েকখানা চিঠিতে জানিয়েছে এখনও তিনি সুস্থ হোয়ে উঠতে পারেননি। খবর-কাগজেও সে পড়েছে লাট সাহেব কর্তৃক মন্ত্রীত্ব গঠনের আহবান পাওয়ার পরই সুব্রত চৌধুরী করোনারি থ্রমবোসিসে আক্রান্ত হোয়ে পড়েছেন। এবং তার পরেকার সংবাদে প্রকাশ অন্তত তিন মাস পূর্ণ বিশ্রাম না পেলে কোন গুরুভার কাজের দায়িত্ব গ্রহণ

শ্রীযুক্ত চৌধুরীর পক্ষে উচিত হবে না। কাজেই আর একটুও কালবিলম্ব না কোরে এখনই একবার তাঁকে দেখতে যাওয়া দরকার। অবশ্য ইতিমধ্যেই যাওয়া তার উচিত ছিল। না সে বড্ড ঘরকুণো। ভদ্রলোক তাকে কতনা স্নেহ করেন। তা ছাড়া তাব খেতাবের জন্যেও কতনা চেষ্টা করেছেন। আরও আফসোসের কথা সেদিন কলকাতায় গিয়েও সে যেয়ে উঠতে পারেনি সময়াভাবে। আজ ব্যারিস্টারের কাছে কাজ সেরে আগে সে সলিলদের ওখানে যাবে, তারপর অন্য কাজ। কিন্তু না, আরও একটা কাজ আছে। সাত তারিখে জমিদার সঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ সভা। নিমন্ত্রণপত্রখানা সামনেই পড়ে। ভালোই হয়েছে। ওটাও সেরে আসা যাবে। তাতে যদি বাড়ী ফিরতে দু'দশদিন দেরী হয় হোক. তাতে বরং অন্তত কিছুদিনের জন্য একটু অন্যমনস্ক হওয়ার সুযোগ মিলবে।

মার সঙ্গে সে আর দেখা করলো না। তার কেমন বাধো বাধো ঠেকছিল। হয়তো আবাব ঐসব কথাই উঠবে এবং ফলে শুধু তিক্ততারই সৃষ্টি হবে। বেরোতেও বিলম্ব হোয়ে যেতে পাবে। অথচ আর আধ ঘণ্টা পবেই ট্রেন।

ম্যানেজারকে ডাকিযে সে বললে. "আমাব ফিবতে দিন কযেক দেরী হবে ম্যানেজারকাকা, মাকেও একটু জানিযে দেবেন।"

তারপর চা-পান সেরে নেকটাইটা ঠিক করতে করতে মোটরে গিয়ে বসলো। একজন চাকর পেছন পেছন এসে তার বিবাট চামড়ার সুটকেসটা গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল।

উকিল হরনাথ ঘোষাল কলকাতাতেই অপেক্ষা করছিলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে অমরেশ যথা সময়ে ব্যারিস্টার বোসের চেম্বারে হাজির হোল।

বোস সাহেব কিন্তু খুব দুঃখেব সহিতই জানালেন কাগজপত্র তিনি এখনও দেখে উঠতে পারেননি, অমরেশ যদি দয়া কোরে পবের দিন একবার আসে বড ভালো হয়।

"কিন্তু কথা ছিল যে আজ আমি আসবো এবং কাগজপত্তব আপনি দেখে রাখবেন? আর সেই জন্যেই তো আগাম আড়াই হাজার টাকা আপনাকে দিয়ে গিয়েছিলুম।" খুব বিরক্ত হোয়েই অমরেশ বললে।

মুখখানি কাঁচুমাচু কোরে বোস সাহেব বললেন, "অনুগ্রহ কোরে কিছু মনে করবেন না মিস্টাব রায়, আমি এ জন্যে খুবই দুঃখিত। কিন্তু আজ আমি নিশ্চয়ই দেখে রাখবো। আপনি দয়া কোরে কাল একবারটি আসুন। আর হ্যাঁ. পারেন তো আরও কিছু, এই ধরুন আরও শদেডেক মোহর যদি—"

"মানে আরও হাজার আড়াই টাকা?"

হরনাথবাবু সংশোধন কোবে বললেন, "দু হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা।"

"বেশ আমি দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কাল যেন আমায় ফিরতে না হয়।" বলতে বলতে অমরেশ পকেট থেকে চেকবইখানা বার কোরে লিখতে লাগলো।

"না, না, আমি শপথ কোরে বলছি কাল আর আপনাকে ফিরতে হবে না।"

২,৫৫০ টাকা লিখে সই কোরে চেকখানা অমরেশ তাঁকে দিলো। তারপর ধন্যবাদ নিয়ে বেরিয়ে এলো।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে আবার তারা গেল। অবশ্য তাদের এবার হতাশ হোতে হোল না। সত্যিই বোস সাহেব খুব পরিশ্রম স্বীকার কোবে সমস্ত কাগজপত্র তন্ন তন্ন কোরে দেখে রেখেছিলেন।

"বসুন, অনেক আলোচনা আছে।" ভদ্রলোক আলোচনা শুরু করলেন।

অমরেশ দেখলো নিভা দাসগুপ্ত ও তার মধ্যে লেখা কিছু কিছু চিঠি তিনি ইংরিজীতে অনুবাদ কোরে রেখেছেন। আলোচনা করতে করতে তাঁর টাইপিস্টকে ডেকে সেগুলি তিনি টাইপ করতে দিলেন।

তারপর কিন্তু পনের মিনিটও গেল না হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বোস সাহেব কোট গায়ে দিতে দিতে বললেন, "আচ্ছা আজ এই পর্যন্ত থাক্ মিস্টার রায়, আবার কাল হবে, কেমন?"

"সেকি! আবার কালকের জন্যে ঝুলিয়ে রাখছেন?"

"আমায় যে এখনি কোর্টে যেতে হবে মিস্টার রায। কেস আছে।"

"কিন্তু—"

"ব্যাপার কি আমার তো আবও মক্কেল আছেন। তাদের প্রতিও তো আমার কর্তব্য পালন কবতে হবে।"

হরনাথবাবু বোলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

অগত্যা অমরেশকে উঠতে হোল।

"গুড ডে" বোলে বেবিয়ে গিয়েও বোস সাহেব আবাব ফিবে এলেন, বললেন, "কাল কিন্তু কোর্টেব ছুটিব পব, গানে চাবটেব পব আসবেন।"

হরনাথ তাঁর কোলকাতাব বাসায চলে গেলেন। অমবেশ এসে উঠলো গ্র্যাণ্ড হোটেলে। আগের দিনও সে এইখানেই ছিল।

পরদিন আবার দুজনে যথাসময়ে বোস সাহেবের চেম্বারে এসে উপস্থিত হোল।

আলোচনা চলতে লাগলো। চাও এলো। চা খেতে খেতে হঠাৎ এক সময়ে বোস সাহেব জিগগেস করলেন, "আচ্ছা নিভা দাসগুপ্ত কি কখনও আপনাকে তাঁর কাছে গিয়ে রাত কাটাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে চিঠিপত্তর লিখেছিলেন?..কি হোল? লজ্জা করছেন?"

"না, না। তবে ঠিক ও রকম কিছু লিখেছেন বোলে আমার মনে হচ্ছে না। তবে এমনি যাবার জন্যে হয়তো—"

তার কথা শেষ না হোতেই বোস সাহেব আবার প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, কোন-কিছু চেয়ে কখনও কি চিঠি লিখেছেন? কাপড় হোক, গয়না হোক, টাকা হোক?"

"না। তবে হ্যাঁ, তার বাবার জন্যে টাকা চেয়েছে অনেকবার।"

"বাস! বাস! তা হোলেই হোল। কই সে সব চিঠি?"

"ও সবেরও প্রয়োজন হবে?"

"নিশ্চয়ই।"

"আমি অতটা ভাবতে পারিনি। না হোলে সব চিঠিই আপনাকে এনে দিতুম।"

"ও সবই আমার চাই। আইনের দিক দিয়ে খুবই প্রয়োজন। আমি তা হোলে দেখাতে পারবো উনি আপনার কাছে কেবলই টাকা চাইতেন আর আপনি দেওয়া বন্ধ করেছেন বোলেই আপনাকে আরও দিতে বাধ্য করবার জন্যে আপনার বিরুদ্ধে এই রকম একটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছে—অর্থাৎ এ অভিযোগ মিথ্যে, ভিত্তিহীন, দুষ্ট-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।"

"বাঃ, বাঃ, সুন্দর!" অমরেশ বোলে উঠলো।

"তা হোলে ঐ চিঠিগুলি এখন আমায় দিন।"

"কিন্তু দু'চার দিন দেরী হবে যে।"

"তা হোক। আর না হয় এক কাজ করুন। আপনি আর কেন কষ্ট কোরে আসবেন? কাউকে দিয়ে বরং পাঠিয়ে দিন। তবে মনে থাকে যেন ওগুলো না পাওয়া পর্যন্ত আমি ওদের চিঠির জবাব লিখতেই পারবো না।"

"বেশ, তাই হবে। কিন্তু তার পর?"

"তারপর আর কি? এতে যদি ওরা নিবৃত্ত হয় ভালো, না হয়, অর্থাৎ কিনা যদি অবুঝ হয় কোর্টে আসবে। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোর্টে এলেও আমার এ আর্গুমেন্টের কাছে ওরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।"

"তা হোলে আমায় আর ইতিমধ্যে দরকার হবে না?"

"বাঃ, জবাবটা কেমন হয় দেখবেন না?"

"আবার তো হাঁটাবেন?"

"না, না, অনুগ্রহ কোরে অপরাধ নেবেন না। এবার আর হাঁটাব না। যাকে দিয়ে আপনি চিঠিগুলো পাঠাবেন তারই মারফৎ আমি জানিয়ে দোব আমার জবাব কবে নাগাদ রেডি হচ্ছে অর্থাৎ কবে আপনাকে আসতে হবে।"

"বেশ, তা হোলে উঠি?"

"আসুন। হ্যাঁ, আর একটা কথা। অনুগ্রহ কোরে যদি আরও শ দুই মোহর —আজ অবিশ্যি থাক্—যেদিন আসবেন সেদিন যদি নিয়ে আসেন বাধিত হবো।"

"দুশো মোহর মানে আমাদের হিসেবে?"

হরনাথবাবু বললেন, "তিন হাজার চারশো টাকা।"

"ঠিক আছে, তাই হবে। আচ্ছা নমস্কার।"

"নমস্কার।"

সিঁড়ি পর্যন্ত বোস সাহেব তাঁর মাননীয় মক্কেলকে এগিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যা হোয়ে গেছে। কাজেই বন্ধুর বাড়ী আর যাওয়া যায় না। অগত্যা আজও রাত্রিটা গ্র্যান্ড হোটেলে কাটিয়ে পরদিন খুব সকালে অমরেশ শিয়ালদা স্টেশনে এসে বন্ধুর বাড়ী যাবার জন্যে ট্রেন ধরলো।

বেলা দশটার মধ্যেই সে পৌঁছে গেল। দেখলো সলিলের বাবাকে ঘিরে তাঁর বাড়ীর লোকেরা বেশ আরামে বোসে গল্প করছে। সলিলের বাবা এখন ভালোই আছেন। তবে চিকিৎসকদের নির্দেশাধীন। তাঁরা তাঁকে পূর্ণ বিশ্রামেব পবামর্শ দিয়েছেন।

তাকে পেয়ে সলিলের তো খুশি আর ধবে না। শুধু তার নয়, বাড়ীসুদ্ধ সকলেরই। খুব খাতির যত্ন কোরে তাকে তারা বসালো।

অমবেশ দেখলো খাতির তার যেন আগেব চেয়ে বেড়ে গেছে। সকলেই ধোরে নিয়েছে ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিনে ভারতের যে ক'জন ভাগ্যবান সরকারী সম্মান লাভ করছেন সে তাঁদেব অন্যতম। তাবা নিঃসন্দেহ হোয়ে সেই কথাই বারবাব বলতে লাগলো।

বিনয় দেখাবার জন্যে অমরেশ শুধু একবার বললে, "নাও তো হোতে পারে?"

"আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেবেছি হবেই," বললেন সুব্রত চৌধুরী।

সলিল, সলিলের মা ও সলিলের স্ত্রী, সবাই তাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো দু'চারদিন থেকে যাবার জন্যে।

অমরেশ অবশ্য থাকবে বোলেই ঠিক কোবে এসেছিল। কাজেই তার রাজী না হবার কোন কাবণ নেই। তা ছাড়া তার খুব ভালোই লাগছিল এমন স্নেহপূর্ণ পরিবেশ। রাজী হোয়ে সে বললে, "বেশ। এ ক'দিন থেকে একেবারে সাত তারিখে জমিদাব সঙ্ঘের মীটিং সেরেই যাওয়া যাবে।"

সলিল বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভালো।"

"কিন্তু মেশোমশাই তো যেতে পারবেন না। তুই তা হোলে যাচ্ছিস নাকি?"

"না ভাই। ঐদিন আমাব একটু বিশেষ কাজ আছে।"

"তবে?"

"তাতে কি হয়েছে? তুই বরং যা। তুই তো বড় একটা ওসব সভায় যাস না।"

সলিলের বাবা বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, অমরেশ যাও। যাওয়ার প্রয়োজন আছে। পাঁচ জায়গায় না গেলে, না মেলামেশা করলে উন্নতির রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না।"

"তা ছাড়া সেখানে তো আরও বন্ধুবান্ধব আছে। আমি নাই বা গেলুম।" যোগ দিল সলিল।

"আমি অবিশ্যি যাবো বোলেই মন কোরে বেবিয়েছি।"

সলিলের বাবা বললেন, "বেশ! বেশ!"

সলিল: "কিন্তু একটা কথা তোকে বলতে ভুলে গেছি। জমিদার সঙ্ঘ বোধ হয় বাবাকে সম্বর্ধনা দেবার জন্যে আয়োজন করছে। বোধ হয় শপথ নেবার পরই দেবে। এই সভাতেই সে প্রস্তাব ওঠবার কথা।"

"বাঃ বাঃ! আমার মনে হয় সকলেই এ বিষয়ে একমত হবে। একজন জমিদার মুখ্যমন্ত্রী হোলে গৌরব তো শুধু তাঁর নয়, গৌরব সমগ্র জমিদারকুলের।"

তারপর একটু থেমে অমরেশ আবার বললে, "এই জন্যেই তুই বুঝি এ সভায় আসছিস না?"

সলিল মৃদু হাসলো।

তারপর অন্য কথা উঠলো।

"জানিস? পুজোর পর আমরা বাবাকে নিয়ে বাইরে যাচ্ছি। তুইও আমাদের সঙ্গে চল্ না।"

সুব্রত রায়: "হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো অমরেশ, সবাই মিলে একটু আনন্দ কোরে আসি।"

"এবার বাবা আমরা এমন জায়গায় যাব যেখানে হাওয়া খাওয়াও হবে, শিকারও মিলবে।"

"শিকার!" অমরেশ লাফিযে উঠলো। "বাঃ! বাঃ! আমাব যে অনেক দিনের ইচ্ছে।"

"তবে চ।"

"কিন্তু একজন পাকা লোককে তো সঙ্গে নিতে হবে?"

"সে সব ঠিক হোয়ে যাবে। তুই আগে রাজী কি না বল্।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার বন্দুকটা যে অচল হোয়ে পড়ে আছে। আচ্ছা, এক কাজ করি। ফেরার পথে নতুন একটা অর্ডার দিয়ে যাই।"

সুব্রতবাবু বললেন, "তোমারও তা হোলে শিকারের ঝোঁক আছে দেখছি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কখনো বড় শিকার করেছ?"

"না মেসোমশাই, কখনো সে রকম সুযোগ পাইনি।"

"তোমার বাবা ছিলেন একজন মস্ত বড় শিকারী। তা বেশ, বেশ। তোমরা জোয়ানরা শিকার করবে আর আমরা বুড়োবুড়ী বৌমাকে নিয়ে হাওয়া খাবো। আমাকে অবিশ্যি একবার ফিরতে হবে। মন্ত্রীদের নাম পেশ করা, শপথ নেওয়া প্রভৃতি জরুরী কাজগুলো আর ফেলে রাখা যাচ্ছে না।"

সলিলের মা এতক্ষণ নীরব ছিলেন, জিগগেস করলেন, "তাতে ক'দিন লাগবে?"

"তা দিন পনের তো বটেই। তারপরই আবার গিয়ে তোমাদের সঙ্গে যোগ দোব।"

"দেখো বাপু আবার না অসুখটা বেড়ে যায়।"

"না, না। সেই জন্যই তো ভালোভাবে বিশ্রাম নিচ্ছি।"

আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চললো।

চা খেতে খেতে একসময়ে অমরেশ সলিলকে জিগগেস করলো, "অস্টিনদের খবর কি রে?"

হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো সলিল যেন শুনতে পায়নি এমনি ভাবে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠলো, তারপর বললে "চল্ না একটু বিলিয়ার্ডস্ খেলিগে। অনেক কাল তো একসঙ্গে খেলিনি।"

অমরেশ আরও লক্ষ্য করলো তার প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। কিছু বুঝতে না পেরে সে বললে, "তাই চল্।"

দুই বন্ধুতে বেরিয়ে গেল।

সলিল বললে, "থাক্ খেলা, চল্ বাগানে যাই।"

"আমাব তাতেও আপত্তি নেই।"

যেতে যেতে সলিল বলে, "ওদের কথা যা তুলেছিস তুলেছিস আর কোনদিন ভাই এখানে অন্তত তুলিসনি।"

"কেন?"

সলিল চুপ কোরে রইলো।

অমরেশ ভাবলো বোধ হয় সেবার এসে সে মিস্ অস্টিনের সঙ্গে একটু বেশিই মাখামাখি কোরে ফেলেছিল বোলে সলিলের বাড়ীর সকলে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সে আর উচ্চবাচ্য না কোরে চলতে লাগলো।

সলিল যেন কতকটা আপন মনেই বলতে লাগলো, "কিছুদিন যাবত ওদের নিয়ে বড্ড অশান্তি চলেছে। খবরটা এদ্দিন চাপাই ছিল আর সত্যি কথা বলতে কি সেটা বরং ভালোই ছিল। কিন্তু সম্প্রতি মীরাট থেকে বাবার এক পুরোন বন্ধু এসে সব ফাঁস কোরে দিয়ে মুস্কিলে ফেলেছেন।"

অমবেশ এখনও মাথামুণ্ডু কিছুই ধরতে পারছে না, সবটাই তার কাছে কেমন যেন হেঁয়ালি বোধ হচ্ছে।

ওদিকে সলিল বোলে চলেছে, "ভদ্রলোক মিসেস অস্টিনের কাকা। প্রায় তিরিশ বছর ইণ্ডিয়ায় কাটিয়েছেন। সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন, হালে রিটায়ার কোরে দেশে চলে যাচ্ছেন। যাবার আগে এসেছিলেন ভাইঝিকে দেখতে। তাঁরই কাছে আমরা শুনলুম মীরাটে থাকা কালে বিধবা মিসেস অস্টিনের সঙ্গে বাবার গোপন প্রণয় ছিল, মিস্ অস্টিনের জন্মদাতা হচ্ছেন আমারই বাবা।"

অবাক বিস্ময়ে অমরেশ শুধু তার দিকে চেয়ে রইলো।

এদিকে নওগাঁর জমিদারিতে, বিশেষ কোরে কয়েকখানা গ্রামে, অবস্থা খুবই গুরুতর। জগদ্বল্লভপুরে তো ত্রাসের রাজত্ব চলেছে। বাবুদের লেঠেলরা গোঁফে মোচড় দিচ্ছে আর বেপরোয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা যার তার ওপর যা ইচ্ছে তাই করছে। পথে যদি কোন নিরীহ চাষীকে একা দেখতে পায় তো তার আর রক্ষে নেই। তার কাছ থেকে পয়সাকড়ি জিনিসপত্র যা পাবে কেড়ে নেবে। মেয়েরা তো পথেঘাটে বেরোতে সাহসই করে না ওদের ভয়ে।

সময়ে সময়ে অত্যাচার বরদাস্ত করতে না পেরে চাষীরাও ক্ষেপে উঠছে রীতিমতো। তারা শচীনন্দন সামন্তের নেতৃত্বে কৃষক সমিতি গঠন করেছে, মাঝে মাঝে তার নেতৃত্বে এখানে ওখানে গরম গরম মীটিং কোবে বাবুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। উভয় পক্ষই সমান উত্তপ্ত।

শচীনন্দন তো এখন এইখানেই ঘরবাড়ী করে ফেলেছে। এই তাকে সংগঠন দেখতে হচ্ছে, এই আন্দোলন পরিচালনা করতে হচ্ছে আবার এই দূরে বাইরে গিয়ে নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হচ্ছে।

সময়ে সময়ে দেখা যায় লেঠেল ও চাষীদের মধ্যে বেশ একটা সংঘর্ষ হোযে গেল, দু'পক্ষেরই লোক আহত হোল, তারপর কিছুদিন ধোরে চলল দু'পক্ষেরই তড়পানি।

নওগাঁর প্রাসাদে জমিদার অনুপস্থিত। কাজেই ম্যানেজারের হাতে কর্তৃত্ব। ম্যানেজার তাড়াতাড়ি জমিদারের কাছে খবর পাঠালেন। জমিদারও সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন কৃষক সমিতি যেন আব কিছুতেই বাড়তে না পায়, ওদের সভাসমিতিও যেন আর না করতে দেওয়া হয়।

চাষীরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। তারা মীটিং করবে, তাদের সংগঠনকেও বাড়াবে।

অগত্যা ম্যানেজার আরও লেঠেল পাঠালেন। ফলে অনেকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। কেউ কেউ আবার এমনও বলতে লাগলো, "কি হবে বাবা এসব কোরে? ওরা রাজা, আমরা পেরজা, ওদের সঙ্গে বিরোধ কোরে কি আমরা পেবে উঠবো?"

অপর পক্ষে আবার দেখা গেল আশপাশের গ্রামগুলিতে উৎসাহ ও আগ্রহ বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। আন্দোলনকাবীবা সাগ্রহে তাদের দলে টানতে লাগলো। ফলে দ্রুত গ্রামে গ্রামে কৃষকসমিতির শাখা গড়ে উঠতে লাগলো।

চাষীরা ঠিক করলো সুলতানগঞ্জে শীঘ্রই তাবা খুব বড একটা মীটিং কববে। প্রস্তুতি চলতে লাগলো পুরোদমে।

নির্দিষ্ট দিনে দেখা গেল চারদিককার গ্রাম থেকে দলে দলে লোক আসছে। তাদের চিৎকারে আকাশ বাতাস যেন ফেটে যেতে থাকে। চিৎকার কোরে কোরে তারা স্লোগান দেয় "জুলুম কোরে খাজনা আদায় চলবে না।"

সভাস্থল গরম হোয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সভার কাজ শুরু হয়। শচীনন্দন সামন্ত বক্তৃতা করতে ওঠে। জমিদারের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ কোরে

সে বলে, "চাষীবন্ধুগণ, জমিদারি প্রথাটাই একটা পাপ। কেন আমাদের মাথার ওপর থাকবে জমিদার? কেন আমরা না খেয়েও তাকে খাজনা যোগাবো? কেন সে লেঠেল পাঠিয়ে আমাদের ওপব জুলুম করবে? আমরা আব এ কিছুতেই বরদাস্ত করবো না।"

হঠাৎ সভার একপ্রান্ত থেকে শোনা গেল, "লেঠেল! লেঠেল আসছে!"

মুহূর্তের মধ্যেই "ধর্ শালাদের! মার্ শালাদের!" করতে করতে লেঠেলরা ছুটে এসে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

চাষীরাও অনেকে লাঠি সড়কি প্রভৃতি নিযে এসেছিল। তাবাও রুখে দাঁড়ালো। সভাক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হোল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু সুশিক্ষিত লেঠেলদের সামনে চাষীরা দাঁড়াতে পারলো না। কারও হাত, কারও মাথা জখম হোল। যে যেদিকে পাবলো ছুটো পালালো।

লেঠেলদের মধ্যেও অনেকে আহত হয়েছিল। কিন্তু তা হোলেও তারা বিজয়ী। উল্লাসধ্বনি করতে করতে তারা কাছারীবাড়ীব দিকে অগ্রসর হোল।

এই ঘটনার পর জমিদাবপক্ষেব অত্যাচাব আরও বেড়ে গেল। তারা কৃষক-সমিতিব অফিস পুড়িয়ে দিলো এবং আগেব চেয়ে আরও কঠোব হস্তে খাজনা আদায কবতে লাগলো।

ভালমানুব চাবীরা খুবই নিবাশ হোযে পড়লো। অনেকে এমন ভয় পেয়ে গেল যে প্রকাশ্য স্থানে কৃষকসমিতিব নাম পর্যন্ত মুখে আনতে সাহস করে না।

শচীনন্দন তাদেব উদ্বুদ্ধ কবে, বলে, "অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। কাপুরুষের মতো হাব মেনে বসে পড়লে চলবে কেন?"

সে বুঝলো শুধু দু'একটা অঞ্চল নিয়ে লড়লে চলবে না। দূব দূরান্তরের গ্রামগুলিকেও সঙ্গে নিতে হবে। তবেই ঠিক জোব পাওযা যাবে এবং তবেই সফলতার সম্ভাবনা। সে কৃষকসমিতিকে আবও জোবদাব কববার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো।

ওদিকে বন্ধুর বাড়ীতে কযেকদিন আদরে-যত্নে কাটিযে অমরেশ আজ ফিরছে। ফেববাব সমযে সলিলেব বাবা ও মা অনেক কোবে বলে দিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে বাইরে যেতে যেন সে শেষ পর্যন্ত না অমত কোবে বসে। সলিলও গাড়ীতে তুলে দিতে এসে বার বার মনে করিযে দিল বন্দুকের কথাটা।

প্রথম শ্রেণীতে সাধারণ ঘরের মানুষ যাতায়াত কবে না। কাজেই কামরায় অমরেশ ছাড়া আর যাত্রী নেই।

গাড়ী চলেছে। দু'একটা স্টেশন পবেই খবরকাগজ মিললো।

অমরেশ কখনও কাগজ পড়ছে, আবার কখনও বা বাইবে গাছপালার দিকে চেয়ে বোসে আছে।

হঠাৎ সলিলের বাবার কথা মনে পড়ে। ব্যাপারটা কত বিস্ময়কর! কিন্তু দেখতে গেলে বিস্ময়ের কি আছে? তারা ছেলেরা যা করছে তাদের বাপেরাও তাই করেছে। এবং এইটেই তো স্বাভাবিক। চলতি বিধিবিধান তো আর তাদের জন্যে নয়—তারা তার উপরে। তারা অভিজাত শ্রেণী, জীবনকে ষোল আনা ভোগ করবার জন্যে তারা যা খুশি করতে পারে। তবে হ্যাঁ, কেবল দেখতে হবে কি ভাবে করা হচ্ছে। এটা ঠিকই বলেছে সলিল আভিজাত্য বজায় রেখে সবকিছুই করা যেতে পারে। আসল জিনিস ঐটা...

ভাবতে ভাবতে ভাবনার রাজ্যে সে আরও এগিয়ে চলে।

কিন্তু আভিজাত্য বজায় রাখতে হোলে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যা তা তার কই? মার থিওরি সত্যিই অখণ্ডনীয়।

জমিদারি হাতে নেওয়ার পর এই ক'মাসের অভিজ্ঞতায় সে তো তা পরিষ্কারই বুঝেছে। এতো কম আয়ে তার আশাআকাঙ্ক্ষা কখনোই পূর্ণ হোতে পারে না।

আজ তার পৌরুষ যেন এক নূতন জগতের আস্বাদ পেয়েছে। সে চায় সম্মান, চায় প্রতিপত্তি, চায় নিজেকে আরও বিস্তৃত ও প্রসারিত করতে। এজন্যে বন্ধু সলিলের কাছে সে কৃতজ্ঞ। সেই তার মধ্যে এ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছে। কিন্তু বাড়তে হোলে যে ঢালতে হয় অনেক। তার এই ক্ষুদ্র জমিদারি থেকে তা কেমন কোরে সম্ভব?

অবশ্য মা শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সমাধানের পথও দেখিয়েছেন। একদিক থেকে বিচার করলে মার প্রস্তাব খুবই লোভজনক। কম কথা! তার আয়ের চারগুণেরও ওপর। কিন্তু অপর দিকে? হ্যাঁ স্বীকার করতেই হবে পুরুষের কাছে খুবই প্রিয় অর্থ ও সম্মান কিন্তু তার চেয়ে যে প্রিয় সুন্দরী রমণীর ভালো-বাসা, তার সঙ্গ, মার সমাধানে তার স্বীকৃতি কোথায়? সেদিক থেকে কি তা হোলে সে বঞ্চিত হবে না? যে মেয়েকে সে কিছুতেই ভালোবাসতে পাবে না, যে একটা কুৎসিত মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই না, টাকার জন্যে তাকে করতে হবে জীবন-সঙ্গিনী? এতে ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্য রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু তার ভিতরের মানুষটা?

শিয়ালদায় পৌঁছে অমরেশ সোজা গেল ডালহৌসি স্কোয়ারে, নামকরা এক বন্দুকের দোকানে। সেখানে বন্দুকের অর্ডার দিল। তারপর গেল গ্র্যাণ্ড হোটেলে। সেখানে আহার ও বিশ্রাম সেরে যথাসময়ে এলো জমিদার সঙ্ঘের সভায়—টাউনহলে।

দেখলো সভাস্থল খুব সুন্দর কোরে সাজানো, এবং ইতিমধ্যেই হলঘর লোকজনে পরিপূর্ণ হোয়ে গেছে। কোন কোন মহলে সুব্রত রায়ের সম্বর্ধনা সম্বন্ধে আলোচনাও হচ্ছে শুনতে পেল।

পরিচিত অনেকের সঙ্গেই তার দেখা হোল। তারা অনেকেই তার রাজা খেতাব প্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। কেউ কেউ তাকে অভিনন্দনও

জানালো। অপর পক্ষে আবার কেউ কেউ ঈর্ষাও প্রকাশ করলো। কেউ কেউ আবার এমন মতও প্রকাশ করলো যে সে নাকি এমন সম্মান পাবার যোগ্যই নয়। অনেকে আবার এমনও বললে: "আরে দূর! ও বাজে গুজব।"

এ নিয়ে অবশ্য বিবাদ করা যায় না। কাজেই সে কোন উচ্চবাচ্য না কোরে হাসিমুখে সকলের সঙ্গেই মেলামেশা করতে লাগলো।

নিমন্ত্রণপত্রে লাটসাহেবের নাম ছিল। তিনিই সভা উদ্বোধন করবেন। লাট-সাহেবের সঙ্গে অবশ্য তার পরিচয় নেই। কিন্তু তাঁর বৌ-মেয়েও তো আসতে পারে। সুতরাং তাদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে পেলে মন্দ হয় না। সে এগিয়ে গিয়ে ডেইসের উপর বসলো।

হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো যারা সেই উচ্চমঞ্চে বসেছিলেন তাঁরা সবাই যেন বিরক্ত হোয়ে তার দিকে তাকাচ্ছেন। একজন বললেন, "সেক্রেটারিকে ডাকো।"

জমিদার সঙ্ঘের সেক্রেটারি নলিনাক্ষ বটব্যাল কাছেই ছিলেন। এগিয়ে এলেন। তাঁকে তাঁরা আস্তে আস্তে কি বললেন।

পরক্ষণেই সেক্রেটারি তার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "দেখুন যদি কিছু মনে না করেন, আপনার জায়গা এখানে নয়।"

"কেন?"

"এখানটায় শুধু বড়রাই বসবেন।"

"কিন্তু আমার বয়সীও তো দু'একজন বসেছেন?"

"বয়সে বড়র কথা আমি বলছি না। আমি বলছি, প্রথম শ্রেণীর জমিদাররাই শুধু এখানে বসবেন।"

অমরেশের কান লাল হোয়ে উঠলো। কিন্তু এর ওপর আর কথা চলে না। সে শুধু বললে, "বেশ, বলুন আমি কোথায় বসবো?"

"ঐ ওখানে।"

বলতে বলতে আঙুল দিয়ে তিনি নীচে পেছনের সারিটি দেখিয়ে দিলেন।

অমরেশ দেখলো বহু চোখ তার দিকে নিবদ্ধ। লজ্জায় তার মাথা হেঁট হোয়ে গেল। তার কানে এলো তার পাশ থেকে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি বলছেন, "ষাট হাজার টাকার আয় নিয়ে যে এখানে বসা যায় না বাছাধনকে তা ভালো কোরে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।"

অসম্মানিত, অপদস্থ অমরেশ আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলো। রাগে তার রক্ত গরম হোয়ে উঠেছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে এখনই ডেইসখানা ভেঙে চুরমার কোরে দেয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। সে নিজেকে সংযত করলো।

এর পর আর সভায় থাকা যায় না। সভাস্থ সকলের প্রতি ঘৃণায় তার সমস্ত অন্তর রি-রি কোরে উঠছে। কারও দিকে না চেয়ে সে সটান বেরিয়ে যায়।

তাকে বেরিয়ে যেতে দেখে দু'একজন বন্ধু ছুটে এসে তার গতিরোধ কোরে

তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করলো। কিউ কেউ তাকে থাকবার জন্যে অনুরোধও জানালো।

"এমন ব্যবহার করা সত্যিই সেক্রেটারির খুব অন্যায় হয়েছে," একজন মন্তব্য করলো।

অপর একজন তার হাত ধোরে টানতে লাগলো।

অমরেশ বললে, "তোমরা তো ভাই আমার কাছে এইসব বলছো, কিন্তু ওখানে গিয়ে প্রতিবাদ করতে পারবে?"

সবাই চুপ কোরে রইলো।

"তবে আমায় ছেড়ে দাও।"

"কিন্তু তোমারও তো ভাই দোষ হয়েছে। রুই কাতলা না হোয়ে রুই-কাতলাদের সঙ্গে বসতে গেলে কেন?" একজন বোলে উঠলো।

"ও আচ্ছা, তা হোলে যখন রুইকাতলা হোতে পারবো তখন আবার তোমাদের সভায় যোগ দোব। আজ বিদায়।"

হাতখানা টেনে নিয়ে সে চলে গেল।

মনে দারুণ যন্ত্রণা নিয়ে সে বাড়ী ফিরছে। সারা পথ সে কেবল ভেবেছে, ভেবেছে, ভেবেছে।

এমন অপমানিত সে প্রকৃতপক্ষে আর কখনও হয়নি। কিন্তু অপমানের মধ্য দিয়ে তার শিক্ষাও হয়েছে। সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যার যতো বেশী টাকা সেই ততো বড়দরের অভিজাত। অভিজাতদের দরবারে তার স্থান তৃতীয় সারিতে।

বাড়ীতে পা দিতেই কর্মচারী দাসদাসী সকলে এসে আশে পাশে জড় হোল। অন্য সময়ে তার ভালোই লাগে কিন্তু আজ সে কেমন যেন বিরক্ত হোয়ে উঠলো। সে তাদের জানিয়ে দিল তারা যে যার কাজে চলে যেতে পারে, তার কাউকেই দরকার নেই।

তারপর সে গেল অন্দর মহলে, মার খোঁজে। এঘর ওঘর কোরে অনেক খুঁজলোও কিন্তু মাকে পেল না। একজন দাসীকে ডেকে জিগগেস করতে সে বললে রানীমা মাত্র আগের দিনই আবার কাশী চলে গেছেন।

"এমন হঠাৎ? কই সে কথা তো কেউ বললে না আমায়! কিছু বোলে গেছেন কি?"

"এঁজ্ঞে আমরা তো কিছু জানি নে। তবে মেনেজারবাবুরে জিগগেস করলে তিনি হাইতো কইতে পারেন।"

অমরেশ বারাণ্ডায় তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে বসতে যাবে এমন সময়ে দেখে ম্যানেজারবাবু তার আগে থেকেই এসে বসে রয়েছেন।

"কি খবর ম্যানেজারকাকা?"

"মোটামুটি ভালোই বাবাজী। তোমার শরীর ভালো তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি ভালোই আছি। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো? মা যে হঠাৎ চলে গেলেন? আমায় বলবার জন্যে কিছু বলে গেছেন কি?"

"হ্যাঁ। একখানা চিঠি দিয়ে গেছেন। আর, আর বলে গেছেন বলতে ঐ অধ্যাপকের মেয়ের ব্যাপারটার মীমাংসা হোয়ে গেছে।"

"সে কি! কি কোরে হোল?"

"সে ভারী মজার ব্যাপার বাবাজী। তুমি তো ব্যারিস্টারের কাছে গেলে, এদিকে রানীসাহেবা করলেন কি আমার কাছ থেকে মেয়ের বাপের ঠিকানা নিয়ে তাঁকে ডাকিয়ে আনলেন। তারপর একেবারে এক কথায় দশ হাজার টাকায় তাঁকে রাজী করালেন। আমায় আড়ালে ডেকে বললেন, 'বুঝলেন তো, মামলার মধ্যে যাওয়াটা আমাদের ঠিক হবে না। তাতে যদি জিতও হয় তবুও না। কেননা কাঠগড়ায় অমরেশকে দাঁড়াতে হবে তো। সেটা কি কম লজ্জার হবে!"

"ওঃ ম্যানেজারকাকা, মা আমার কত স্নেহময়ী, আর কত বুদ্ধিমতী দেখুন।"

"সে আর বলতে!"

"কিন্তু আমি ভাবছি দশ হাজার টাকায় বুড়ো শেষ পর্যন্ত রাজী হোল কি কোরে?"

"রানীসাহেবার ক্ষমতা অদ্ভুত। সে কি বক্তৃতা! উকিল ব্যারিস্টারও হার মেনে যায়। বললেন, "দেখুন, মামলায় আপনি আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবেন না। প্রথমত ধরুন টাকার প্রশ্ন। জানেন তো টাকা যার মামলা তার। দ্বিতীয়ত আপনি এমন প্রমাণ কিছুতেই হাজির করতে পারবেন না যে আপনার মেয়ের ও সন্তানের জন্যে আমার ছেলেই দায়ী। কাজেই আসুন, দশ হাজার টাকায় ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া যাক। যদি রাজী থাকেন এই নিন আপনার সামনে টাকা। এই নিন কাগজকলম, সই করুন। আর যদি রাজী না হন তা হোলে নমস্কার আদালতেই দুপক্ষের আবার দেখা হবে।" দেখলুম অধ্যাপকমশাই একেবারে থ হোয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তার খানিক পরেই দেখলুম ভদ্রলোক সই কোরে টাকাটা তুলে নিতে নিতে বলছেন, "আপনাদের সঙ্গে ঝগড়া করবার আমার কোনই ইচ্ছে নেই। আমি জানি আমি পারবো না। কিন্তু ভেবে দেখুন আমার মেয়ের অবস্থাটা। যা ঘটেছে এর পর আর পাঁচটা মেয়ের মতো সে জীবনযাপন করতে পারবে না। অথচ তাকে তো বাঁচতে হবে!" তারপর মাথাটি নীচু কোরে তিনি আস্তে আস্তে চলে গেলেন।"

"আপনি ঠিক বলেছেন ম্যানেজারকাকা। মার আমার ক্ষমতা অদ্ভুত। তা হোলে তো ব্যারিস্টারকে এখনই জানিয়ে দিতে হয় মামলার আর কোন দরকার নেই।"

"তা দিতে হবে বৈকি বাবাজী। তবে কোর্ট থেকে নিষ্পত্তিটা হোলেই ভালো ছিল মনে হচ্ছে। আবার যদি কোন ফ্যাকড়া ওঠে?"

"সে তখন পরে দেখা যাবে'খন। কই মার চিঠিখানা দিন, দেখি মা কি লিখেছেন।"

"কাছারীতে আছে বাবাজী। এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"আর, আর সব খবর?"

"এই একরকম চলেছে। কেবল ঐ বাসুদেবপুর আর জগদ্বল্লভপুর এ দুটো নিয়েই যত গোলমাল। ওরা কৃষকসমিতি না কি সব গড়ছে আর ঐ শচীনন্দন বোলে লোকটা কেবলই ওদের ক্ষেপিয়ে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে তো একটা ছোটখাটো মারপিটও হোয়ে গেল।"

"হুঁ? কিন্তু আমি তো বরাবরই বলছি ওরা যেন ঐসব সমিতি টমিতি করতে না পারে। ওগুলো যে খুবই ভয়ঙ্কর জিনিস।"

"সেদিকে তো যথেষ্টই নজর রেখেছি বাবাজী।"

"ঠিক আছে। কিন্তু দেখুন তো পুলিসের কীর্তি। আরে বাপু শয়তানটাকে যদি বা ধরলি, আবার ছেড়ে দিলি কেন? খালি টাকা খাবার মতলব। হ্যাঁ, আপনি তা হোলে মার চিঠিখানা—"

"হ্যাঁ বাবাজী, আমি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

মার চিঠি পড়ে অমরেশ বুঝলো তার অনুমান ঠিকই, অভিমান কোরেই মা চলে গেছেন। অনেক কথার পর মা লিখেছেন : "যখন তোব ভালোর জন্যে বললেও দেখছি তুই কিছুতেই কানে নিবি না তখন আব আমার প্রয়োজন কি? শুধু অশান্তি বাড়ানো বই তো নয়। তার চেয়ে বরং দূরে থাকাই ভালো।"

তার চোখে জল এলো। সত্যিই সে খুবই গোঁয়ারতুমি করেছে—কেবলই মার মনে ব্যথা দিয়েছে।

ছেলেবেলাকাব কথা তার মনে পড়লো। ওঃ, বাগ্‌দীরা যেরকম মারমুখো হোয়ে উঠেছিল তাতে যদি বুদ্ধিমতী মা তাকে সে সময়ে তাড়াতাড়ি কোলকাতায় সরিয়ে না দিতেন, সে কি বিপদেই না পড়তো!

এই মামলার ব্যাপারটাই ধরা যাক না কেন। শুধু কাগজপত্র দেখতেই ব্যারিস্টার হাজার পাঁচেকেব ওপর নিয়ে নিলো। অথচ মা কত সহজেই না মাত্র দশ হাজার টাকায় কত বড় কলঙ্ক থেকে তাকে রক্ষা করলেন!

এই সঙ্গে অপর দিকটায়ও কি দেখা যায়? কিসে তার উন্নতি হয়, কিসে তার হাতে আরও ঐশ্বর্য আসে, সেজন্যে কি আকুলি-বিকুলি তাঁর! কত না পীড়াপীড়ি সময়ে অসময়ে করেছেন ঐ ভূকৈলাসের জমিদারকন্যাকে বিয়ে করতে! সে কার

স্বার্থে? কার প্রয়োজনে? যদি বছরে বছরে আরও লাখ দুই-আড়াই আসে, কে সুখী হবে?

কি মূর্খ সে! অথচ হালফিলই তো সে দেখলো তার ঐ ষাট হাজারী আয়ের জমিদারি নিয়ে অভিজাতদের দরবারে সে অপাংক্তেয়।

না, না. আর নয়। সে মাকে যথেষ্টই ব্যথা দিয়েছে. আর নয়। এমন মার উপদেশ মেনে না চললে তাকে চোখের জলে নাকের জলে হোতে হবে।

সত্যিই সে আজ অনুতপ্ত। আর বোকামি সে করবে না। এখনই গিয়ে মার কাছে আত্মসমর্পণ করবে, জানাবে তাঁর আদেশ মানবার জন্যে সে প্রস্তুত।

পরদিনই সে সব কাজ ফেলে ছুটলো কাশী।

দেবনন্দন পাঁড়ে এসেছে নওগাঁয় তলব নিতে। সে এখন জবদ্বল্লভপুরেই থাকে—সেখানকার কাছাবী পাহারা দেয়।

রাত্রেও পাহারা দিতে হয়। সেইজন্যে আরও একজনকে নিযুক্ত কবা হয়েছে। তারা দুজনে মিলে পালা কোরে ডিউটি দেয়।

দেবনন্দন এসেছে দুদিনের ছুটি নিয়ে। সে যে শুধু তলবের জন্যেই এসেছে তা নয়। কয়েকদিন আগে ম্যানেজারের কাছ থেকে এক বিশেষ বার্তা নিয়ে যে লোকটি জগদ্বল্লভপুব গিয়েছিল তার কাছ থেকে দেবনন্দন শুনেছিল হেমা তাকে একদিন নওগাঁয় এসে দেখা কববার জন্যে খুবই অনুরোধ করেছে। শুনে অবধি তার মন নওগাঁয় আসবাব জন্যে ব্যাকুল হোয়ে উঠেছিল। এও তার আসার অন্যতম কারণ।

ছুটি অবশ্য মাত্র দুদিনের। এরই মধ্যে অনেকখানি কেটে গেছে পথে আসতে ও কাছারীতে ধন্না দিতে। অথচ ঠিক সময়ে কার্যক্ষেত্রে পেঁাছতেই হবে। কাজেই হেমাব জন্যে ঘণ্টাখানেকেরও বেশী তাব হাতে নেই।

ছুটতে ছুটতে দেবনন্দন যায় হেমাব বাড়ী। ইতিমধ্যে নওগাঁর প্রাসাদে খবর নিয়ে সে শুনেছিল হেমা অসুস্থ।

বেলা তখন তিনটে হবে। হেমার মা খুব যত্ন কোরেই দেবনন্দনকে বসালো।

হেমা ছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন। তাদেব কথার আওয়াজে সে জেগে উঠলো। চোখ খুলে দেখে সামনে দেবনন্দন পাঁড়ে।

“আরে পাঁড়েজী! কখন এলে?” বলতে বলতে সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো।

তার আগ্রহ দেখে দেবনন্দনের মন খুশিতে ভরে উঠলো। সে আসবার পথে তাড়াতাড়ি বাজার থেকে কিছু কমলালেবু ও বেদানা কিনে নিয়ে এসেছিল। হেমার মার হাতে দিতে দিতে বললে “হামি তো এইমাত্র আসছি। তুমি কেমোন আছো হেমা?”

হেমার মাই জবাব দিল, “না বাবা, ক’দিন ধোরে কেবলই জ্বর ভোগ হচ্ছে।”

"চৌকিখানা পাঁড়েজীকে এগিয়ে দাও না মা," হেমা বলে।

মা চৌকি দিতে পাঁড়েজী আরাম কোরে বসলো।

"ও সব কি এনেছো? ফল দেখছি না?"

"হাঁ, ফল আছে। মা, একঠো হেমাকে ছাড়িয়ে দাও।"

হেমার মা সঙ্গে সঙ্গে একটা লেবু তুলে নিয়ে খোলা ছাড়াতে লাগলো।

হেমা বললে, "দ্যাকো দিকিনি, আবার এসব খরচ করতে গেলে কেন?"

হেমার মা এইবার খোলাগুলি ফেলবার জন্যে বাইরে গেল।

দেবনন্দন জবাব দেয়, "তুমহার জন্যে করবো না তো কাহার জন্যে করবো হেমা?"

হেমা চোখ পাকিয়ে তার দিকে চাইল। অর্থটা এই যে কথাটা যদি তার মার কানে যায়!

তা ঠিক। দেবনন্দন বুঝলো।

খানিক পরে মা একটা কলাপাতায় লেবুর কোয়াগুলি সাজিয়ে এনে হেমার সামনে রাখলো।

"পাঁড়েজীকেও একটা ছাড়িয়ে দাও না মা।"

"না, না, হামি খাবে না," মাথা নেড়ে পাঁড়েজী বললে।

"একটা খাও না বাবা," হেমার মা অনুরোধ করলো।

"না মা, ও হেমার জন্যে থাক্।"

"তবে বাবা দুটি মুড়ি আনবো, খাবে?"

"হাঁ হাঁ ও বহুৎ আচ্ছী চিজ আছে।"

মা মুড়ি এনে দিলো।

হেমা বেশীক্ষণ বোসে থাকতে পারে না। হঠাৎ লেবু খেতে খেতে তার কাঁপুনি এলো। সে শুয়ে পড়লো।

মা তার গায়ে কাঁথাখানা চাপা দিতে দিতে বললে, "জ্বরটা আবার তা হোলে এলো।"

দেবনন্দনের আর মুড়ি খাওয়া হয় না। মুড়ির বাটিটা এক পাশে রেখে রোগিনীর কাছে এগিয়ে এসে সে বললে, "এ তো ম্যালেরিয়া আছে।"

"হ্যাঁ বাবা, ডাক্তারেও তাই বলছে।"

কাঁপতে কাঁপতে হেমা বলে, "আর একখানা কাঁথা দাও মা। বড্ড শীত।"

মা উঠে গিয়ে আর একখানা কাঁথা নিয়ে এসে তার গায়ে চাপা দিলো।

"কোন্ ডাগদার দেখছে মা?" দেবনন্দন জিগগেস করে।

"নরেশবাবু দেখছে বাবা।"

"নরেশবাবুকো হামি খবর দেবে?"

"দেবে বাবা? বড্ড ভালো হয়। দ্যাখোনা ছেলেটা পর্যন্ত আজ ঘরে নেই।"

"আচ্ছা হামি যাচ্ছি। তবে হামি তো আর লওটতে পারবে না। হামায় আভি জগদ্‌ভালপুর যেতে হোবে।"

"বেশ বাবা, খবরটা তুমি দিয়ে গেলেও যথেষ্ট হবে।"

"আচ্ছা মা, হামি তুরন্ত্‌ যাচ্ছে। তুমি এই বিশঠো রুপেয়া কাছে রেখে দাও।"

"না না বাবা, টাকার দরকার হবে না, আমার কাছে আছে।"

"আপত্তি আছে মা? হামি তো তুমহাব ছেলের মতো।"

জোর করে দুখানা দশ টাকার নোট সে মার হাতে গুঁজে দিল, তারপর হেমার দিকে চাইতে দেখলো হেমা আচ্ছন্ন হোয়ে পড়ে আছে। সে তার কপালে হাত রাখলো। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে মার কাছে বিদায় নিয়ে দেবনন্দন বেরিয়ে এলো। অনেক আশা নিয়ে সে এসেছিল। তার মনে খুবই কৌতূহল ছিল কেন হেমা তাকে ডেকেছে জানবার জন্যে। তার কি তা হোলে কিছু বলবাব আছে? হয়তো। কিন্তু কি তা আর জানা হোল না।

দ্রুত পায়ে সে চলতে লাগলো। নরেশ ডাক্তারকে বাববাব অনুবোধ কবলো যাতে তিনি এখনই রোগীকে দেখতে আসেন।তাবপব ভারাক্রান্ত অন্তরে জগদ্বল্লভ-পুরের দিকে রওনা হোল।

কাশীব বাড়ীতে পেঁাছে অমবেশ শুনলো মা গঙ্গাস্নানে গেছেন।

দাসদাসীবা অনেকেই নতুন। কাজেই তাকে চিনতো না। তবে তার সাহেবী পোশাক দেখে খুব খাতির কোবেই তাকে বসালো। তারপর যখন তার পরিচয় পেল তখন সবাই তটস্থ হোয়ে উঠলো। সাধাবণত তাদেব কাজকর্ম কমই থাকে—নওগাঁর জমিদারের ঐশ্বর্য দেখানো ছাড়া আব কিছু না। এইবার তাবা ছুটে গিয়ে কেউ চেযাব টেবিল ঝাড়তে মন দিল কেউ বা ফুলগাছেব গোড়ায জল দিতে শুরু করলো. কেউ বা আবার এগিয়ে এসে তাকে হাওযা করতে লাগলো।

রাত্রে ট্রেনে অমরেশেব ভালো ঘুম হযনি। ইজিচেয়ারে শুয়ে হাওযা খেতে খেতে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

হঠাৎ তার কানে এলো মার গলা। মা তাকে ডাকছেন।

"তোমাব স্নান সারা হোল মা?" হাই তুলে চোখ মুছতে মুছতে উঠে সে বললে।

নিরুপমার পিছনে দাঁড়িযেছিল দবোয়ান। সাধারণত নিরুপমা বাইবে গেলে দরোযান পিছন পিছন যায। বড় ঘবে এই বকমই রীতি।

"তুই কখন এলি বাবা? কই আমায় তো কিছু জানাসনি আসছিস বোলে?"

দরোয়ান দেখলো তার থাকার আর প্রয়োজন নেই। সেলাম কোরে সে চলে গেল।

"তুমিই বা কোন্ আমায় জানিয়ে এসেছ মা? আমায় ক্ষমা করো মা। ফিরে চলো।" বলতে বলতে সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে মাকে জড়িয়ে ধরলো।

"আচ্ছা, আচ্ছা। সে হবে'খন। এখন ওপরে চল্ দেখি। হাতমুখ ধো, চা-টা খা, চ।"

"না মা আমি আর ওপরে যাবো না। তোমাকে এখনই আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে নিরুপমা বললেন, "বেশ তো, হবে'খন। এখন একটু বিশ্রাম করবি চল্ দেখি। কাল রাত্তিরে তো দেখছি গাড়ীতে ঘুম হয়নি।"

"তুমি তা হোলে কথা দিচ্ছ যাবে?"

"তা বললুম কই?"

"তা হোলে যাবে না?"

"তাই বা বললুম কই?"

"তবে?"

"চ তো এখন। পরে আলোচনা করা যাবে।"

"বেশ চলো, তোমার কথা আর আমি অমান্য করবো না।"

"তবে শোন্ যা বলি। এখন আগে জলযোগ, তারপর ঘুম, তারপর কথা।"

হাসতে হাসতে ছেলে বললে, "তাই হবে।"

তারা ওপরে গেল।

ঘণ্টা দুয়েক ঘুম দেবার পর সে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগলো। যে চাকরটি হাওয়া করছিল তার কাছে খোঁজ নিয়ে জানলো মা রান্নাঘরে। চাকরকে ছুটি দিয়ে সে রান্নাঘরে নেমে এলো।

দেখে মা রাঁধছে।

"মা তুমি রাঁধছো?"

"আমার যে ঠাকুর সে যে আমিষ রাঁধতে জানে না বাবা।"

"দ্যাখো তো, তোমার কত কষ্ট হোল!"

"তোর জন্যে রাঁধবো কষ্ট আবার কি রে? এখন বল্ শরীরটা ঠিক হয়েছে?"

"হ্যাঁ মা।"

"দেখলি তো, মার কথা শুনলে ভালোই হয়।"

"হ্যাঁ মা, আজ আর তা অস্বীকার করবো না।"

খুশী মনে মা বলেন, "দাঁড়া, একটা চেয়ার আনিয়ে দি। কোথা গেল চাকর-গুলো? গণেশ! এই গণেশ!"

গণেশ ছুটে এলো।

"কোথা ছিলি? শীগ্‌গির একটা চেয়ার নিয়ে আয়।"

চেয়ারে বোসে অমরেশ বললে, "তা হোলে রাত্তিরের ট্রেনেই চলো মা।"

মাংসটা কষতে কষতে হাসিমাখা মুখে মা বলেন, "কিন্তু গিয়ে কি কববো বল্? আমার চিঠি তো পড়েছিস।"

"হ্যাঁ পড়েছি। আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি মা, আর তোমায় ব্যথা দোব না, তোমার কথা আমি শুনবো।" বলতে বলতে তরকারীর ঝাঁঝালো গন্ধে অমরেশ কাশতে লাগলো।

মা অবাক হোয়ে গেলেন। তাঁর মন খুশিতে ভরে উঠলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে সংযত কোরে বললেন, "এখন তো বলছিস, তারপর যখন—" বলতে বলতে তাঁরও কাশি এল। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তিনিও কাশতে লাগলেন।

"না মা আর কক্ষনো কোন কিছুতেই আমি তোমার অবাধ্য হবো না। তুমি দেখে নিও।"

সে আবার কাশতে লাগলো।

"কি জানিস বাবা, তোর ভালোর জন্যেই তো বলা। নইলে আমার আর স্বার্থ কি? ধর্ এই যে ভূকৈলেসের সিদ্ধার্থ হালদারের মেয়েকে বিয়ে করতে বলছি, কেন? আমি কি বুঝি না মেয়ে তাঁর দেখতে ভালো না? কোন্ মা চায় কুৎসিত মেয়েকে ছেলের বৌ করতে?"

একটু থেমে মাংসটায় জল দিয়ে কাশতে কাশতে মা আবার বলতে লাগলেন, "কিন্তু বল্ এ ছাড়া আর উপায় কি? এতো কম আযে কি কোবে চালাবি? যদ্দিন জমিদারি ভাগ হয়নি সে একরকম ছিল। এখন আয় অদ্দেক। ধাক্কাটা এখনো ঠিকমতো লাগেনি তাই বুঝতে পারছিস না। কিন্তু দেখিস শীগ্‌গিরই বুঝতে হবে। এ বোলবোলা আর বেশীদিন থাকবে না, সমাজে প্রতিপত্তিও কমে যাবে।"

"কমে যাবে কি মা? ইতিমধ্যেই গেছে। সেদিন জমিদার সঙ্ঘের সভায় রীতমতো তা টের পেয়েছি। ওঃ, যা অপমানিত সেদিন হয়েছি তোমায় কি বলবো!" তার কণ্ঠস্বর ভারী হোযে উঠলো।

"কি ব্যাপারটা?" উদ্বিগ্নভাবে মা জিগগেস করলেন।

"তোমার শুনে কাজ নেই মা, তুমি কষ্ট পাবে। তবে এইটুকু জেনে রাখো এই ষাট হাজারী আয়ের জন্যে আমায় সেদিন বড্ডই অপদস্থ হোতে হয়েছে।"

"তবেই দ্যাখ্। অথচ আয় বাড়াবার আর কোন তো রাস্তা নেই।"

আবার মা কাশতে লাগলেন।

"হ্যাঁ মা, এখন আমি তা বুঝতে পারছি। আমায় তুমি ক্ষমা করো। আমি মনকে তৈরী কোরে নিয়েই এসেছি। এবার থেকে তুমি যা বলবে তা আমি শুনবো।"

"ঠিক বলছিস?"

"হ্যাঁ।"

একই সঙ্গে আনন্দ ও বিস্ময়ে মার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হোয়ে উঠলো।

"তা হোলে মেয়েব বাপকে খবব দি?"

"দাও।"

"তবে চ। তোর কথাই রইলো। চ, আজই বাত্রেব ট্রেনে বেরিয়ে পড়ি। তুই নওগাঁয় যা, আর আমি ভূকৈলেস হোযে পরে ফিবছি। ভালো কথা, তোব সেই অধ্যাপকের মেয়ের ব্যাপারটার মিটমাট হোয়ে গেছে, শুনেছিস তো?"

"হ্যাঁ মা শুনেছি, আর সেই সঙ্গে এও বুঝেছি তুমি শুধু কল্যাণময়ী নও, খুব বুদ্ধিমতীও বটে।"

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সে মার দিকে চেয়ে রইলো।

"কিন্তু ম্যানেজারবাবুর ব্যাভারটা আমার ভালো লাগলো না বাবা।"

"কেন মা?"

"উনি কেবলই পীড়াপীড়ি করছিলেন ফযসালাটা কোর্টেই হোক।"

"আমাকেও অবশ্য তাই বলছিলেন।"

"মতলবটা বুঝতে পেরেছিস?"

"না।"

"অর্থাৎ তা হোলে আবও একটা মৌজা ওঁর হাতে গিযে পড়ুক। জানিস তো হ্যামিলটনের ঐ দেনাটা শোধ করতে যে মৌজাটা বাঁধা দিযেছিস সেটা বেনামে উনিই রেখেছেন?"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। ওঁর উদ্দেশ্যটা বাবা ভালো না। আমি শুনেছি উনি গোপনে গোপনে প্রজাদেরও ওস্কাচ্ছেন। আমার মনে হয় তোর ছেলেমানুষি আর উড়নচণ্ডেমির সুযোগ নিয়ে উনি চান জমিদারিটা আস্তে আস্তে গ্রাস কবতে।"

"সর্বনাশ! সেকি! ও লোককে তো তা হোলে এক্ষুনি সবাতে হয।"

"হ্যাঁ। তবে এক্ষুনি নয়, আরও কিছুদিন দেখে। কিন্তু আর না। বেলা অনেক হয়েছে। ওঠ্, নাওয়া-খাওয়া কব্।"

রমানাথ ভটচার্য্যিব বাড়ীর দিকে গেলে দেখা যাবে তাঁব বাড়ীর সামনে সম্প্রতি বেশ একটুখানি বাগান মতো হয়েছে, আব তাবই এক ধারে উঠেছে ঝক্‌ঝক তক্‌তকে বাংলো ধরনের একখানি ঘর। এ অবশ্য হয়েছে জমিদারেরই ইচ্ছেয়—তাঁরই খরচে।

ঘরখানি সুমিত্রা যতবারই সাজিয়েছে সাবিত্রীর পছন্দ হয়নি। কেমন যেন এলোমেলো। অথচ অমরেশ আজকাল এসে এই ঘরেই বসে। কাজেই ঘরটির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে থাকা যায় না। সাবিত্রী তাই নিজের মনোমত কোরে ঘরটি সাজাচ্ছিলেন।

দুপুর থেকেই দিনটা মেঘলা। মাঝে মাঝে যদিও রোদ্দুর দেখা দিচ্ছে, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যে।

সাবিত্রী কাজ করে চলেছেন আপন মনে। ওদিকে বাইরে বাগানে একটা বেতের চেয়ারে বোসে স্বামী তামাক খাচ্ছেন আর রামায়ণ পড়ছেন।

ঠানদি এলেন। ঠানদি আগের দিন রাত্রে সাবিত্রীর কাছ থেকে এক বাটী ক্ষীর নিয়ে গিয়েছিলেন। নিয়ে গিয়েছিলেন অবশ্য নাতনীর নাম কোরে, কিন্তু নাতনী খায়নি, খেয়েছেন তিনি নিজেই। ঠানদি এখন এসেছেন বাটীটা ফেরত দিতে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঠানদি খানিকক্ষণ ধোরে দেখলেন, তারপর মন্তব্য করলেন, "বৌয়ের আমার পছন্দ বটে! রাজরাজড়ার বৌকেও হার মানতে হবে।"

তোষামোদ সাবিত্রীর ভালো লাগে না। তিনি অন্য কথা পাড়লেন, "ক্ষীর কাল কেমন খেলে মাসীমা?"

"আমি আর কোত্থেকে খাবো বৌ? নাতনীটা—"

"হ্যাঁ তা বটে। বড্ড কম হয়েছিল, তাই বেশী দিতে পারিনি। আচ্ছা, আবার কাল মিত্রার জন্যে করবো, নিয়ে যেও।"

"সে তো জানাই আছে। মাসীমার ওপর তোমার টানটা একটু বেশীই। এ নিয়ে কত লোকে কত কথা বলে।"

সাবিত্রী আবার অন্য কথা পাড়লেন "দ্যাখো তো মাসীমা ছবিখানা বসানো ঠিক হয়েছে কিনা?"

"কই দেখি? হ্যাঁ। না, আরেকটু এধার কোরে দিলে হোত।"

সাবিত্রী চৌকীর ওপর দাঁড়িয়ে ছবিখানা ঠিক করতে লাগলেন।

হঠাৎ কি যেন ভেবে ঠানদি প্রশ্ন করলেন, "সুমিত্রা কোথা বৌ?"

সাবিত্রীর ছবি লাগানো শেষ হোল। চৌকি থেকে নামতে নামতে বললেন, "কেন মাসীমা, ঘরেই তো আছে।"

"আচ্ছা কই আর তো জমিদারকে আসতে দেখছি না?"

"কি জানি? অসুখবিসুখ করলো কিনা বুঝতে পারছি না।"

"ভাবনার কথা তো! কাউকে পাঠিয়েছিলে?"

"না, পাঠাইনি। অত মনেও আসেনি।"

"ওমা! আক্কেল দ্যাখো! ওসব রাজরাজড়ার কাণ্ড। কখন কি মতিগতি হয় বলা যায়? তাই নয়, আমাদের সঙ্গে একবার পরামর্শো করো।"

সাবিত্রীর মন চঞ্চল হোয়ে উঠলো। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বললেন, "হ্যাঁ মাসীমা, ঠিক বলেছ। কিন্তু ও কি হোল? তুমি চলে যাচ্ছ? বসবে না?"

এক চপেটাঘাতে বাঁ কনুইয়ের ওপর সদ্য বসা মশাটার প্রাণনাশ কোরে ঠানদি বললেন, "না বৌ, এখন আর বসবো না, কাজ আছে। এসেছিলুম বাটীটা ফেরত দিতে। আজ আবার নাতজামায়ের আসবার কথা আছে কিনা, দেখিগে গিয়ে।"

ঠানদি চলে যাবার পর সাবিত্রী স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবতে লাগলেন।

তাঁদের কথাবার্তা বাইরে রমানাথের কানেও পেঁাছেছিল। তিনি কান খাড়া কোরেই সব শুনছিলেন। ঠানদি যাবা মাত্র উঠে এসে সাবিত্রীর মুখের দিকে চাইলেন।

"শুনলে তো?"

পাকা মাথাটি চুলকোতে চুলকোতে রমানাথ বললেন, "শুনলুম তো। আমারও অবিশ্যি ক'দিন ধোরে কথাটা মনে হচ্ছিল।"

"দাঁড়াও তবে, আগে একবার মিত্রাকে জিগগেস কোরে আসি।"

ফুলদানিটা হাত থেকে মেঝেয় নামিয়ে রেখে উদ্বিগ্নচিত্তে সাবিত্রী ভেতরে চলে গেলেন।

সুমিত্রা জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল, বাইরের দিকে চেয়ে।

"মিত্রা!" সাবিত্রী পিছন থেকে ডাকলেন।

"কি মা?"

"কিছু জানিস মা? কেন জমিদার অনেকদিন আসেননি বল্‌তো?"

সুমিত্রাই বা কেমন কোরে জানবে? এ ক'দিন ধোরে সেও তো ঐ একই কথা ভাবছে। সেও তো নিজেকে প্রতি মুহূর্তে এই প্রশ্নই করছে। অমরেশ কি রাগ করলো? কেন এমন হোল? কই সেরকম তো কিছু তার ব্যবহারে কোনদিন প্রকাশ পায়নি!

অনেকক্ষণ পরে সে বললে, "না মা, আমি তো কিছু জানি না।"

মেয়ের চোখের দিকে চেয়ে সাবিত্রী বুঝলেন সুমিত্রাও এ নিয়ে খুব চিন্তিত হোয়ে পড়েছে, তবে তাঁর কাছে কিছু বলতে সঙ্কোচ করছে। তাঁর মন আরও উদ্বিগ্ন হোয়ে উঠলো। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি বললেন, "কাউকে দিয়ে তোর নাম কোরে খবর নোব?"

মাথাটা নীচু কোরে ঘাড় নেড়ে সুমিত্রা জানালো তারও তাই ইচ্ছে।

আরও দুদিন কেটে গেল। অন্যান্য দিনের মত আজও জানলার ধারটিতে সুমিত্রা দাঁড়িয়ে আছে উন্মুখ হোয়ে। তার দৃষ্টি চঞ্চল, মুখে উদ্বিগ্নতা। পথটির দিকে চেয়ে চেয়ে সে আকাশ পাতাল কত কি ভাবে।

হঠাৎ দেখা গেল মোটর হাঁকিয়ে জমিদার আসছেন।

আনন্দে ও উত্তেজনায় সুমিত্রা কাঁপতে থাকে।

ওদিকে মোটরের আওয়াজ পেয়ে সাবিত্রী ও রমানাথ ছুটে গেলেন।

অমরেশ নামলো।

"এসো বাবা, এসো। শরীর ভালো তো?"

"হ্যাঁ মা। আপনাদের খবর?"

"ভালোই আছি বাবা তোমার দয়ায়।"

রমানাথ এগিয়ে এলেন, "অনেক দিন কোন খবর না পেয়ে আমরা যে কি ভাবনায় পড়েছিলুম!"

যে ছোট ভিড়টি গাড়ী আসার সঙ্গে সঙ্গে জমে উঠেছিল তা পিছনে ফেলে অমরেশ তাঁদের সঙ্গে বাড়ীর ভেতর ঢুকলো।

"একটু চা খাবে বাবা?" সাবিত্রী জিগগেস করেন।

"চা? আজকাল কি আপনারা চা খাচ্ছেন?"

"না বাবা, তোমার জন্যে কিছু চা আনিয়ে রেখেছি।"

"তবে দিন।"

সুমিত্রা বললে, "আমি তৈরী কোরে দিচ্ছি মা।"

"না, না, তোরা গল্প কর্, আমি করছি।" বলতে বলতে সাবিত্রী রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

রমানাথও একটু ইতস্তত কোরে বেরিয়ে গেলেন।

সুমিত্রাকে একা পেয়ে অমরেশ জিগগেস করে, "তুমি আমায় ডেকেছিলে মিত্রা?"

"হ্যাঁ।"

"হঠাৎ? কিছু দরকার আছে?"

"বারে! কদ্দিন আসোনি বলতো?"

"এ ক'দিন একটুও স্থির হবার সময় ছিল না যে। কেবলই বাইরে বাইরে কাটিয়েছি।"

"বাইরে বাইরে কাটিয়েছ ঠিকই, কিন্তু ফিরেছো তো আজ তিন দিন হোল।"

"ফিরেই তো চলে এসেছি।"

"ডাকতে তবে। আগে কিন্তু এমনটি করতে না। আগে যেদিন ফিরেছ সেইদিনই, বড় জোর তার পরদিনই ছুটে এসেছ।"

"শরীর আর মন সবসময়ে তো একরকম থাকে না।"

জবাবটা সুমিত্রার বেশ মনঃপূত হোল না। সে চুপ কোরে রইলো। কিছুক্ষণ পরে বললে, "তারপর? এদিকে কদ্দূর কি হোল?"

"সেই নিয়েই তো মুশকিলে পড়েছি। মার মত পাচ্ছি না।"

"সেকি!"

এক অজানা ভয়ে সুমিত্রার বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। কম্পিত কণ্ঠে সে বলে, "তা হোলে?"

একটু ইতস্তত কোরে অমরেশ বলে, "হ্যাঁ, তা হোলে একটা সমস্যা বইকি।"

"মা কি বলছেন?"

"মা রাজী নন। শুধু তাই নয়, মা এমন কি অন্য মেয়েও ঠিক কোরে ফেলেছেন।"

"অ্যাঁ?"

সুমিত্রার মাথায় যেন বাজ পড়লো। দেওয়ালটা ধোরে না ফেললে সে নিশ্চয়ই পড়ে যেতো।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে অনেকক্ষণ পরে সে বললে, "সে নিশ্চয়ই আমার চেয়ে সুন্দর, তাই মা আমায়—"

"না, মোটেই না, বরং খুবই কুৎসিত। তবে তাকে বিয়ে করলে তার বাবার বিরাট সম্পত্তি আমার হবে।"

সুমিত্রা নৈরাশ্যে একেবারে ভেঙে পড়লো। তার মুখ ফ্যাকাশে হোয়ে গেল। ওঃ! কি বোকা সে! বামন হোয়ে চাঁদে হাত দিতে গেছে! জমিদারের ছেলে জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করবে না তো কি তার মতো ট্যানাপরা একটা অভাগিনীকে বিয়ে করবে? তার চোখে জল আসে ।

তবু যেন তার বিশ্বাস হয় না, এতো অন্ধকারেও যেন একটু আলো দেখতে পায়, বলে কিন্তু "মার ওপরই তো আর সবটা নির্ভর করছে না?"

"তা করছে বইকি।"

ব্যাকুল হোয়ে সে বলে, "সে কি! কই কোনদিন তো তা বলোনি।"

"কিন্তু মাকেও তো আর ফেলে দিতে পারি না!"

সুমিত্রা আর থাকতে পারলো না। কেঁদে ফেললে · "ওগো, এ কি করলে তুমি আমার?"

তারপর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, "একবার ভেবে দ্যাখো আমার অবস্থাটা কি হবে। চেয়ে দ্যাখো তোমার সন্তান আমার গর্ভে। লোকে এখনো জানে না তাই। কিন্তু যখন জানতে পারবে—"

বাইরে থেকে সাবিত্রীর গলা পাওয়া গেল, "মিত্রা একটু এগিয়ে আয় তো মা চাটা ধর্ তো।"

চোখ মুছতে মুছতে সুমিত্রা বেরিয়ে গেল।

চা ও কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে মা ও মেয়ে প্রবেশ করলো।

"এসব আবার কেন মা?" উপেক্ষাভরে বলতে বলতে অমরেশ শুধু চায়ের কাপটাই মুখে ধরলো।

ওদিকে সুমিত্রা জানলার ধারে সরে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ব্যাপারটা সাবিত্রীর ভালো লাগলো না। তাঁর মনে হোল নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে এবং তাঁর এখানে থাকাটা হয়তো ঠিক হবে না।

"খাও বাবা, আমি আসছি", বলতে বলতে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

চা-টা শেষ কোরে অমরেশ সুমিত্রার পাশে এসে দাঁড়ালো, তার কাঁধে হাত রেখে বললে, "একটুতে উতলা হওয়া কি ভালো? আমিও তো এ নিয়ে কত ভাবছি।"

আকুল ভাবে চোখ মুছতে মুছতে তার বুকের কাছে এগিয়ে এসে সুমিত্রা বলে, "আমার যে বড্ড ভয় করছে গো।"

তার কাঁধটা চাপড়ে অমরেশ বললে, "না, না, ভয়ের কি আছে? আমি দেখছি কি করতে পারি। তুমি এ নিয়ে মিছে মাথা খারাপ কোর না।"

"তোমার পায়ে পড়ি—"

"ঐ দেখ মা আসছেন," বলতে বলতে সে সরে এলো, তারপরে বললে, "কিন্তু আমি এখন যাই। একটা বিশেষ জরুরী কাজ ফেলে এসেছি।"

"আবার আসছো তো?"

"হ্যাঁ।"

সাবিত্রী প্রবেশ করলেন: "মসলাটা দিয়ে যেতে ভুলে গেছলুম বাবা।"

"ও আচ্ছা, দিন। কিন্তু আমি এখন যাচ্ছি মা, একটু বিশেষ কাজ আছে।" বলতে বলতে ডিবে থেকে দুটি মসলা তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

তাকে এগিয়ে দেবার জন্যে সাবিত্রী তার পেছন পেছন গেলেন। সুমিত্রাও বাগানের ধার অবধি এসে দাঁড়িয়ে রইলো।

ঘরে ফিরে এসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সাবিত্রী সুমিত্রাকে জিগগেস করেন, "কি ব্যাপার মা? কিছু হয়েছে কি?"

সুমিত্রা চাপবার চেষ্টা করলো "না তো।"

"আমায় লুকোচ্ছিস্?"

সুমিত্রা চুপ কোরে থাকে।

"বল্ মা কি হয়েছে? এ রকম তো কোনদিন দেখিনি। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।"

সুমিত্রার চোখ দিয়ে টস টস কোরে জল গড়িয়ে পড়ে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

"ও কি! কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে মা বল্?" ব্যাকুল হোয়ে মা অনুরোধ করেন।

"ওঁর মা মত দিচ্ছেন না।"

"অ্যাঁ?"

সাবিত্রীর মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। কে যেন তাঁর মাথায় মুগুর মারলো, তিনি বসে পড়লেন।

গালে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ গুম হোয়ে বসে থাকার পর জিগগেস করলেন, "ওঁর মা কি বলছেন?"

"অন্য মেয়ে দেখেছেন—জমিদারের মেয়ে।"

"তাই নাকি?"

আবার গুম হোয়ে বসে রইলেন সাবিত্রী। অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বললেন, "কিন্তু ছেলে যদি অমত করে তা হোলে তো আর হোতে পারে না, ছেলে কি বলছে?"

সুমিত্রা চুপ কোরে থাকে।

"জিগগেস করলি না কেন?"

মাথা নিচু কোরে সুমিত্রা বলে, "করেছিলুম।"

উদ্‌গ্রীব হোয়ে সাবিত্রী প্রশ্ন করেন, "কি বললে?"

"বললে, 'মাকে তো ফেলে দিতে পারি না? তবে দেখছি কি করতে পারি'।"

একটু যেন ভরসা পেলেন সাবিত্রী: "দ্যাখ্ মা তবে কি হয়।"

আবার তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, "ভাগ্য ছাড়া তো আর পথ নেই। তবে হ্যাঁ, ওই যখন জমিদার তখন ওই তো সব। আর ও তো এক রকম কথাও দিয়েছে। কথার কি আর নড়চড় করবে? তবে অবিশ্যি এও মানতে হবে মাকে তো আর চটাতে পারে না। জ্ঞানবান ছেলে। সেইজন্যে হয়তো মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করবার চেষ্টা করছে। দেখা যাক, নারায়ণ কি আমাদের ওপর এতোই বিমুখ হবেন?"

সুমিত্রা তবু বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

"আবার আসছে তো? কি বোলে গেল?"

"বোলে তো গেল আসবে।"

"তবে কেন মিছে অত ভাবছিস মা?"

রমানাথ এলেন। তিনি এতক্ষণ আহ্নিকে বসেছিলেন, কাজেই কিছুই জানেন না। মা ও মেয়েকে ওভাবে দেখে জিগগেস করলেন, "কি হচ্ছে তোমাদের?"

কেউই জবাব দেয় না।

"অমরেশ চলে গেছে?"

এবার সাবিত্রী উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।"

"এতো শীগ্‌গির?"

সুমিত্রা দেখলো আবার হয়তো ঐ প্রসঙ্গই উঠতে চলেছে। আস্তে আস্তে সে সরে গেল।

সাবিত্রীর কাছে রমানাথ সমস্ত শুনলেন। বললেন, "না, না, এ নিয়ে

মিছে মাথা খারাপ কোর না। মিত্রা ছাড়া ও আর কোন মেয়েকে বিয়ে করবে না দেখে নিও। ও সে ছেলেই নয়! কি সুন্দর ব্যবহার! কি সুন্দর চরিত্র! এদ্দিন মেলামেশা করলে এটুকু আর বুঝতে পারলে না?"

"তোমার মুখে ফুলচন্নন পড়ুক। নারায়ণ করুন তাই যেন হয়।"

"নারায়ণ! নারায়ণ! মিত্রা কোথা গেলি মা? হুঁকোটা দিয়ে যা তো।" পিতার কথা শুনে সুমিত্রার অন্তরে আবার যেন কিছুটা আশা ফিরে আসে।

নিরুপমা দেবী নওগাঁয় ফিরে আসায় সকলেরই আনন্দ। তাঁরও অন্তরে আনন্দ আর ধরে না।

ছেলেকে ডেকে তিনি জিগগেস করলেন, "মত বদলাসনি তো?"

ছেলে হেসে জানালো, "না।"

"তা হোলে প্রস্তুত?"

অমরেশ উত্তর দেয় না।

মা উদ্বিগ্ন হোয়ে ওঠেন· "কি ভাবছিস! কি হোল?"

"ঠিক আছে মা, তোমাব আদেশ আমি আর অমান্য করবো না।"

খুব খুশী হোয়ে মা বলেন, "তা হোলে এই এগাবো তারিখে আশীর্বাদ। কেমন?"

"কেন মা? বিয়ে কবে স্থিব করেছ।"

"দেরী আছে বাবা—অঘ্রাণে। এ দু'মাস তো আর বিয়ের দিন নেই।"

"তা হোলে এতো তাডা কিসের?"

"না বাবা, শুভ কাজ ফেলে রাখতে নেই।"

"বেশ, তা হোলে বিয়েব আগে আমায় একটু বাইরে বেড়িয়ে আসতে ছুটি দিও। সলিলরা যাচ্ছে, আমায়ও অনেক কোরে যেতে বলেছে।"

"কবে যাবি?"

"পুজোর পর।"

"অঘ্রাণ পড়তেই ফিরবি তো?"

"নিশ্চয়ই।"

"তা যা না। আচ্ছা, হ্যাঁরে, সলিলের বাবা নাকি মন্ত্রী হচ্ছেন?"

"মন্ত্রী নয়, মুখ্যমন্ত্রী। সব ঠিক।"

"আর তোর কদ্দুর?"

"সেও একরকম ঠিক। লাটসাহেব তো খুব ভাল ভাবেই সুপারিশ করেছেন শুনছি।"

"খবরটা কিন্তু তোব ভাবী শ্বশুরমশাইও শুনেছেন।"

"তুমিই শুনিয়েছ বোধ হয়।"

"না রে, উনি কাগজে দেখেছেন।"

আনন্দে ও গৌরবে মার বুক ফুলে ওঠে।

কিছুক্ষণ পরে নিরুপমা আবার বললেন, "তা যা। বাইরে মাঝে মাঝে ঘুরে আসা দরকার। কিন্তু অঘ্রাণ পড়তেই ফিরে আসিস যেন। না হোলে আমায় ভয়ঙ্কর ছোট হোয়ে যেতে হবে।"

"না মা, তা কখনো পারি? আমার কথার নড়চড় হবে না তুমি দেখো।"

রমানাথ ভটচায্যির বাড়ীর সে প্রফুল্লতা আর নেই। কিন্তু এমন সাবধানে তাঁরা রইলেন যে অংকুশেও বাইরের কেউ কিছু টের পেল না।

অমরেশের প্রতীক্ষায় খুব অধীরভাবেই তাঁরা দিন কাটাচ্ছেন। তাঁদের বিশ্বাস শীঘ্রই যে-কোন একদিন অমরেশ এসে জানাবে তার মা রাজী হয়েছেন। কি আনন্দই না সেদিন তাঁদের হবে!

রমানাথ স্থির করেছেন এবার দেখা হোলে সব সংকোচ কাটিয়ে আগে তিনি বিয়ের দিন ক্ষণ সব পাকা কোরে নেবেন।

কত না জল্পনা, কত না ভয়, সন্দেহ অহরহ তাঁদের ওঠাচ্ছে, বসাচ্ছে, নাচাচ্ছে।

সুমিত্রা তো সকল সময়েই ম্রিয়মাণ হোয়ে নিজের ঘরটিতে বোসে থাকে। প্রতিবেশীদের ঘন ঘন আসা-যাওয়া আর তার তেমন ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে বরং সে বিরক্তই হোয়ে ওঠে, মাকে বলে, "ওদের কি মা একটু বারণ কোরে দিতে পার না? সব সময়েই কি লোকের ভিড় ভালো লাগে?"

সন্ধ্যা হয়। ঘরমুখো পাখীদের কিচিরমিচির শোনা যায় চারদিকে। দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশের কোলে লাল সূর্যটা যায় ডুবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক অন্ধকারে ভরে ওঠে।

আবার পরের দিনটির প্রত্যাশায় তারা বোসে থাকে।

আজও সুমিত্রা অন্যান্য দিনের মত চিন্তামগ্ন।

হঠাৎ তার চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ে। অদূরে পাল্‌কীবাহকদের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়। সে তাড়াতাড়ি উঠে জানলা দিয়ে দেখতে থাকে।

পাল্কীটা এঁকে বেঁকে রাধু চক্রবর্তীর বাড়ীর কাছে এসে থামে। সুমিত্রার মনে পড়ে তাঁর ছেলের আজ আটকড়াই। ভাবলো দূর জায়গা থেকে হয়তো কোন আত্মীয়া এসেছেন। তার মনে পড়লো তারও যে নিমন্ত্রণ।

ক্রমে প্রতিবেশী ও ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি শোনা যায়। রাধু চক্রবর্তীর বাড়ী গমগমে হোয়ে ওঠে। তিনু ঘোষালের গলা পাওয়া যায়: "মুড়কীর ধামাটা কোথায় ফেললে হে?"

নাঃ, আর এরকম একা একা থাকা যায় না। সুমিত্রা মার কাছে গিয়ে জানালো রাধু কাকার ছেলের আটকড়াইয়ে সে যাচ্ছে।

সাবিত্রী পান সাজছিলেন. "সে কি রে? তোর কি এখন অমন হুট কোরে যেখানে সেখানে যাওয়া সাজে? অমরেশ শুনলে যদি রাগ করে?"

রমানাথ পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, "তা গেলই বা। সেইতো এখানে বোসে থাকলে কেবল ভাববে। তার চেয়ে যাক, বরং একটু অনামনস্ক হোক গিয়ে। আমায়ও যাবার জন্যে রাধু অনেক কোরে বলেছিল। তা আমার শরীরটা বাপু ভালো না।"

সাবিত্রী বললেন, "তবে যা। কিন্তু অমন বেশে কি কোরে যাবি? চুলটা ঠিক কোরে নে, একটা ভালো দেখে কিছু পর্। সেখানে পাঁচজন আসবে। এখন কি আর তুই সে মিত্রা আছিস? হ্যাঁ, বাতাসীকেও সঙ্গে নিস, আর ছেলের মুখ-দেখানি টাকাটা।"

রাধু চক্রবর্তীর বাড়ী ঢুকতেই চারদিক থেকে সকলে কাজ ফেলে ছুটে এলো। এ বলে, "কেমন আছো?" ও বলে, "শরীরটা যেন খারাপ খারাপ লাগছে?" হরি পোদ্দার তো সকলকে ছাপিয়ে গেলেন "রাধুর উচিত ছিল একটা পাল্কী পাঠানো।"

খুব খাতির যত্ন কোরেই তাকে নিয়ে গিয়ে বসানো হোল।

রাধু চক্রবর্তী ছুটে গিয়ে একটা রেকাবি কোরে কিছু সন্দেশ ও এক গ্লাস জল নিয়ে এসে তার সামনে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "গরীব কাকার বাড়ী এসেছিস মা, এটুকু মুখে দে।"

সুমিত্রা একটু হেসে সন্দেশগুলি তুলে ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে ভাগ কোরে দিল। রাধু চক্রবর্তী হাঁ হাঁ কোরে উঠলেন।

"তাতে আর কি হয়েছে কাকা?" বলতে বলতে সুমিত্রা ঠানদির সামনে দিয়ে গিয়ে শৈবলিনীর পাশে বসলো।

ঠানদি মুখ ভার কোরে সরে গেলেন।

ছেলেমেয়েরা আবার চারদিক থেকে 'মিত্রাদি মিত্রাদি' করতে করতে এসে তাকে ঘিরে ধরলো। সুমিত্রা কারও গায়ে, কারও মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলো।

পা ঘষতে ঘষতে তিনু ঘোষাল এসে বললেন "মা তুমি তো আর দুদিন বাদে রাজরানী হবে। আর চিরকালটা তো দেখে আসছো আমি তোমায় কত স্নেহ করি। এখন যদি গরীবের একটা নিবেদন রাখো?"

সুমিত্রা মুখ তুলে চাইলো। আশ্বাস পেয়ে ঘোষাল বোলে যেতে লাগলেন, "তুমি তো জানো মা আমার একটা পাঠশালা আছে আর যত গরীবদরিদ্রের ছেলেই

সেখানে পড়ে। তারা মা যা দেয় তাতে আমার চলে না, তায় এই মাগ্‌গীগণ্ডার দিনে। তাই বলছি মা তুমি যদি একটু দয়া করো—মানে যদি তুমি তোমার জমিদারি থেকে একটা সাহায্যের ব্যবস্থা—"

বাধা দিয়ে সুমিত্রা বললে, "জমিদারি তো আমার নয় জ্যাঠামশাই, তবে আমি বোলে দেখব'খন।"

"তা হোলেই হবে মা, তা হোলেই হবে। তোমার একটু কৃপাদৃষ্টি পড়লেই যথেষ্ট।"

ঘুরে ফিরে ঠানদি আবার পাশে এসে বসলেন। তারপর · "কোথা গেল গো রাধু? এই বেলা পাল্কীর একটা ব্যবস্থা কোরে রাখুক। এবারও যে নাতনী আমার হেঁটে যাবে তা চলবে না।"

"সে কি কথা হোল? না, না, ঠাকুমা আমি হেঁটেই যাবো।"

রাধু চক্রবর্তী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলেন, "না মা, না, আমি পাল্কী বোলে দিয়েছি।"

"কেন কাকা আপনি অতো ব্যস্ত হচ্ছেন। আমি কি এতোকাল পাল্কী কোরেই এসেছি?"

"তখন মা সে ছিল অন্য কথা। এখন তাই বোলে কি—"

"না, না, আমি হেঁটেই যাবো।"

সুমিত্রার এক বাল্যসঙ্গিনী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুমিত্রাকে নিরীক্ষণ করছিল। দূব গাঁয়ে তার বিয়ে হয়েছিল। সে বেশীব ভাগ সময়ে সেইখানেই থাকে।

চোখাচোখি হোতেই সুমিত্রা বোলে উঠলো, "আরে পদ্ম! তুই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছিস! দেখিনি তো! শ্বশুববাড়ী থেকে কবে এলি?"

"এসেছি ভাই পবশু। কিন্তু আমাদেব কি আব এখন তুমি দেখতে পাবে? তুমি যে এখন রাজরাণী।"

"না, না আমি তোদেব সেই মিত্রাই আছি বে। আয, কাছে আয়।"

হাসিমুখে মেয়েটি কাছে আসে, ফিসফিস কোবে বলে, "বিয়ে অব্দি বুঝি আর তর সইলো না?"

"তাব মানে?"

মেয়েটি তার কানের কাছে মুখ নিযে গিয়ে বললে, "পেটটা যে একটু বড় বড় দেখাচ্ছে।"

সুমিত্রার কান লাল হোযে উঠলো। চোখ তুলে সে আব তাব দিকে চাইতে পারে না। তার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকে।

এক প্রৌঢ়া এই সময়ে চেঁচিযে উঠলেন আঁতুড়ঘর থেকে : "ও ছেলেরা তোরা কুলোটা বাজা না বাবা।"

সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রার বাল্যসখীটি উঠে গিয়ে ঘর থেকে কুলো আর কয়েক জোড়া কাঠি বার কোরে এনে ছেলেদের হাতে দিলো।

ছেলেরা প্রস্তুতই ছিল : হুটোপাটি করতে করতে তারা লাফিয়ে পড়লো। আটজন ছেলে আটটা কাঠি নিয়ে গোল হোয়ে দাঁড়িয়ে কুলোটার ওপর পটাপট শব্দে বাড়ি দিতে লাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সুর কোরে কোরে বলতে লাগলো "আটকড়াই বাটকড়াই ছেলে আছে ভালো?"

আঁতুড়ঘরের দরজায় বোসে সেই স্ত্রীলোকটি তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ, আছে ভালো।"

আটবার এইরকম হোল। তারপর চারদিক থেকে সকলে চেঁচিয়ে উঠলো, "আর না, আর না।"

ছেলের দল কোঁচড়ে কোরে আটভাজা মোয়া ও পয়সা নিয়ে যে যার বাড়ী চলে গেল। যেতে যেতে তারা হেঁকে হেঁকে সুমিত্রাকে উদ্দেশ কোরে বলতে লাগলো, "মিত্রাদি, সংক্রান্তির মেলায় আমাদের পয়সা দিতে হবে। মনে থাকে যেন।"

"মিত্রাদি, আমাকেও।"

আরেকজন চেঁচিয়ে উঠলো, "মিত্রাদি, আমার একটা বল চাই।"

শুষ্ক হাসি হেসে ঘাড় নেড়ে সুমিত্রা সকলকেই সম্মতি জানালো।

এইবার শৈবলিনীর পুত্রবধূ এল সুমিত্রাকে তার খোকা দেখাতে। সুমিত্রা প্রস্তুত হোয়েই এসেছিল। চার টাকা হাতে দিয়ে সে তার মুখ দেখলো।

শৈবলিনী বললেন, "তোর খোকা হোলে আটকড়াই নিশ্চয়ই হবে। আমায় নিয়ে যাবি তো?"

সুমিত্রার কান লাল হোয়ে ওঠে। অনেক কষ্টে একটু শুষ্ক হাসি টেনে সে বলে, "এইবার তা হোলে যাই ঠাকুমা।"

পালাতে পারলে সত্যিই সে বাঁচে। আর তার কিছুই ভালো লাগছে না। মাঝে মাঝে সে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছিল তার সেই বাল্যসখীটি কোথায়। না, এখানে সে নেই। কিন্তু এখনই যদি এসে আবার কিছু বোলে বসে? কিংবা যদি কথাটা পাঁচজনের কানে তুলে দেয়! যদি ইতিমধ্যেই তুলে দিয়ে থাকে!

বাধু চক্রবর্তী তাকে পাল্কীতে না বসিয়ে ছাড়লেন না।

সুমিত্রা বেঁচে গেল। পাঁচজনের সামনে দিয়ে যেতে তার কেমন ভয়-ভয় করছিল। পায়েতেও যেন তার আর তেমন জোর ছিল না যে হেঁটে যায়। পরিচারিকাকে নিয়ে সে পাল্কীতে গিয়ে উঠলো।

কয়েক পা যেতেই দেখলো তার সেই সঙ্গিনীটি আরও কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কি আলোচনা করছে। ঠানদি ও আরও দু'একজন বয়স্কাও তাদের মধ্যে রয়েছেন।

তার কানে এলো ঠানদি বলছেন, "ওমা! তাই নাকি? সে কি কথা!"

সে বেশ বুঝতে পারলো তাকে নিয়েই ললনা-রসনা চলেছে এবং খুব শীঘ্রই সঙ্গিনীর সেই কথাটা চারদিকে চাউর হোয়ে যাবে। হায়! কেন মরতে সে এখানে এসেছিল!

সারারাত্রি শুয়ে শুয়ে সুমিত্রা ছটফট করতে লাগলো। মাঝে মাঝে সে উঠে বসে, বালিশটা বুকে চেপে ধরে।

হঠাৎ এক সময়ে সে আলোটা জেবলে বাক্সের ভেতর থেকে অমরেশের চিঠিগুলি বার করলো। তারপর একখানা একখানা কোরে পড়তে লাগলো। তারপর আবার সেগুলো বাক্সের মধ্যে তুলে রেখে জানলার ধারে এসে দাঁড়ালো।

বাইরে সূচীভেদ্য অন্ধকার—পৃথিবী ঘুমুচ্ছে।

হয়তো অমরেশও ঘুমুচ্ছে। ওঃ, কি নিষ্ঠুর সে! সে কি বুঝতে পারছে না কি যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে সুমিত্রার দিনগুলি কাটছে? কেন সে এতো দেরী করছে আসতে? মা ছাড়া তো আর কেউ নেই তার মাথার ওপর। মাত্র এই একজনকে রাজী করাতে এতো দেরী?

তার পায়ের ওপর দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সে ফিরে এসে আবার শোয়। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পর শেষে শ্রান্ত হোয়ে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুমিযে ঘুমিযে স্বপ্ন দেখে, তার কোলে একটি অতুলনীয় সুন্দর শিশু। সে নির্জন ঘরে বোসে তাকে চুমু খাচ্ছে। হঠাৎ তার কানে এলো বহু লোক বাইরে জড়ো হোয়ে তাকে ধিক্কার দিচ্ছে। একি! কেন এমন হোল? সে এখন কি করবে? কোথায় গিয়ে লুকোবে?

হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে সে নিজের কোলের দিকে চায়। কোথায় শিশু? বাইরে সে বেরিয়ে এলো। বাইরেও তো কেউ নেই! সে বুঝতে পারে সে স্বপ্ন দেখেছে।

সকাল হোল।

অন্যদিন সে মার সঙ্গে ঘাটে যায়। আজ কিন্তু যেতে পারলো না, মাকে জানালো শরীরটা আজ তার ভালো না।

কাজেই সাবিত্রী একাই গেলেন। খানিক পরেই কিন্তু তিনি কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এলেন। দাওয়ার খুঁটিটা ধোরে ডাকলেন "মিত্রা! মিত্রা!"

সুমিত্রা বেরিয়ে এলো।

"এ কি কোরে বোসে আছিস মা? ওরা যে বলছে—" সাবিত্রী আর বলতে পারলেন না।

সুমিত্রা জবাব দিতে পারে না। পালাতেও পারে না। মার তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে অপরাধীর মতো মাথাটি হেঁট কোরে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

দাওয়ার ওপর বোসে পড়ে সাবিত্রী কাঁদতে থাকেন : "একি করলি মা? একি করলি? হা নারায়ণ! শেষ পর্যন্ত যে ভাগ্যে কি আছে!"

রমানাথ বেরিয়েছিলেন ভোরে উঠে। পাশের গ্রামের এক মামলার মীমাংসা করতে। অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে তিনি ফিরে এলেন। উঠোনে পা দিয়েই হাঁকলেন, "কোথা গেলে গো গিন্নী? শনছো?"

সাবিত্রী উঠে দাঁড়ালেন।

"হরি পোদ্দার আমায় কি বললে জানো? বললে কোত্থেকে না কি সে শুনেছে আমাদের মিত্রা—"

হঠাৎ সুমিত্রাকে দেখতে পেয়ে রমানাথ থেমে গেলেন।

সুমিত্রা বুঝতে পারলো পিতা কি বলতে চান। লজ্জা পেয়ে সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে গেল।

রমানাথ সাবিত্রীর কাছে এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে বললেন হরি পোদ্দার তাঁকে কি বলেছেন।

সাবিত্রী নীরবে শুনলেন, মন্তব্য করলেন না।

রমানাথ বলতে লাগলেন, "অ্যাঁ! আমার মেয়ের নামে যা-তা রটানো! আমি দেখাচ্ছি।"

এইবার সাবিত্রী কথা কইলেন "কি তুমি দেখাবে? যা তুমি শুনেছো সত্যি।"

"অ্যাঁ? কি বলছো তুমি?"

"বলছি যা তুমি শুনেছো সত্যি তোমার মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা।"

"অ্যাঁ! অ্যাঁ!"

জগদ্বল্লভপুরে বড্ড গোলমাল। শুধু জগদ্বল্লভপুরে কেন, বাসুদেবপুর, নূতনগ্রাম, সুলতানগঞ্জ ও আরও কয়েকখানা গ্রামেও আবহাওয়া খুবই গরম।

সেদিন সুলতানগঞ্জের সভায় জমিদারের লেঠেলদের কাছে যখন চাষীদের পরাজয় হোল, দেখা গেল প্রথমটা তারা খুবই মুষড়ে পড়েছিল, কিন্তু তারপর দেখা গেল শচীনন্দনের অক্লান্ত চেষ্টায় আবার তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখরাঙানি, অত্যাচার ভয় দেখানো, কিছুই তারা আর এখন পরোয়া করছে না। জমিদারপক্ষ সেদিন কৃষক সমিতির একটা অফিস পুড়িয়ে দিয়েছিল, এই ক'দিনে তারা তাদের আশপাশে বিশটা গ্রামে বিশটা অফিস প্রতিষ্ঠা করেছে।

এবার তারা সভা ডাকলো বাসুদেবপুরে। পনের দিন ধোরে চলল প্রস্তুতি। কোলকাতা থেকে বিশিষ্ট নেতাদের আনা হোল। কোলকাতার নেতারা আসছেন শুনে দশ পনের মাইল দূর থেকে পর্যন্ত লোক আসতে লাগলো। এত বড় সভা গ্রামের লোক আর কখনো দেখেনি।

ম্যানেজার সমস্ত শুনলেন। কিন্তু তিনি বিচলিত হলেন না। বরং সভায় প্রচুর লোক সমাগম হবে শুনে, বিশেষ কোরে কলকাতা থেকে নেতারা আসছেন খবর পেয়ে তিনি আদেশ পাঠালেন যেন মীটিংয়ে বাধা দেওয়া না হয়।

বেশ নিরুপদ্রবেই মীটিং চলতে লাগলো। নেতারা একের পরে একে দাঁড়িয়ে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সমিতির সভাপতিও এসেছেন। তিনিও বক্তৃতা করলেন। তাঁর ভাষণে শেষের দিকে তিনি খুব আবেগের সহিতই বললেন, "বন্ধুগণ, ভেবে দেখুন কেন আপনাদের আজ এমন হীন অবস্থা? জমিদারিপ্রথারূপী এই পরগাছাটা আপনাদের সমস্ত রস শুষে নিচ্ছে। আপনাদের মতো, আমাদের দেশের চাষীদের মতো, এমন হতভাগ্য অভিশপ্ত মানুষ পৃথিবীর আর কোথায় আছে? এই দেশ কৃষিপ্রধান। কিন্তু এই দেশের কৃষকরাই সবচেয়ে বেশী শোষিত ও অবহেলিত। বন্ধুগণ, জমিদারদের আপনারা খাজনা দেন কেন? আপনাদের সুখসুবিধের ব্যবস্থা হবে বোলে। কিন্তু সেই খাজনায় জমিদাররা করে কি? কিছুটা সরকারকে দিয়ে বাকীটা নিজেরা নিয়ে ফূর্তি করে। বন্ধুগণ, সরকারও তাই চায়। তারা বিদেশী, তারা তাদের প্রভুত্ব আমাদের ওপর কায়েম রাখবার জন্য এদের খাড়া করেছে। এরা হচ্ছে তাদেরই খুঁটি। সরকার অর্থাৎ বৃটিশ রাজ জানে যদি দেশের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর মাথায় ওদের বসিয়ে রাখা যায় তা হোলে তাদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে কেউ আর কোনদিন আঙুলটিও তুলতে সাহস করবে না। বন্ধুগণ, আপনারা সঙ্ঘবদ্ধ হোন, বৃটিশ শাসকদের এজেণ্ট এই জমিদারদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন, বলুন 'তোমাদের খাজনা আর আমরা দোব না, তোমরা পরগাছা, তোমরা দূর হও।'"

বিপুল হাততালি দিয়ে সভাসুদ্ধ লোক সমর্থন জানালো।

রাত্রে জগদ্বল্লভপুরের সেরেস্তায় বোসে নায়েব শ্রীকৃষ্ণবাবু মীটিংয়ের রিপোর্ট শুনে শিউরে উঠলেন· সর্বনাশ! সভা করতে না দিলেই তো ভালো ছিল! এখন ওদের সামলানো যে ভার হবে!

ভূকৈলাসের জমিদার সিদ্ধার্থ হালদারের মেয়ের সঙ্গে নওগাঁর জমিদার অমরেশ রায়ের বিয়ের খবরটা বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। যারা শুনেছিল রমানাথ ভটচায্যির মেয়েকেই অমরেশ বিয়ে করবে তারা তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লো। কেউ কেউ বেচারির জন্যে খুব হা-হুতাশও করলো। কেউ কেউ আবার ভারিক্কে চালে বলতে লাগলো, "আমরা তো তখনই বলেছিলুম এ কখনো হয়?" কেউ কেউ এমনও বললে, "বামন হোয়ে আকাশের চাঁদে হাত!" আর যারা ঈর্ষান্বিত হয়েছিল তারা তো খুবই খুশী। রমানাথের গ্রামেও এ নিয়ে রীতিমত আন্দোলন।

ওদিকে বারাণ্ডায় পায়চারি করতে করতে অমরেশ ভাবছে...ভাবছে সে অনেক

কিছু—ভাবী বধূর কথা, ভূকৈলাসের জমিদারির কথা, রাজা খেতাবের কথা, আরও কত কি। হঠাৎ তার মনের মধ্যে ভেসে উঠলো সুমিত্রা।

সত্যিই সেদিন তার সে ব্যাকুলতা দেখে অতি বড় পাষাণেরও চোখে জল না এসে পারে না। অমরেশেরও এসেছিল। কিন্তু কি করতে পারে সে? উপায়ই বা কি? তার জন্যে তো আর সে নিজের জীবনটাকে ব্যর্থ কোরে দিতে পারে না! তার ভবিষ্যৎ, তার সাধ, তার স্বপ্ন, সব কি একটা মেয়ের জন্যে জলাঞ্জলি যাবে?

মনে পড়ে সেই প্রথম দিনের কথা—যেদিন সুমিত্রা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম দর্শনেই সে মুগ্ধ হোয়ে গিয়েছিল, তাকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু তারপর? আর না, ঐ পর্যন্ত। একটা ফুল যদি তোমার সামনে তুমি ফুটে থাকতে দ্যাখো, কি করো? তুলে নিয়ে বুকে পরো। তারপর ফেলে দাও। এখানেও বা তা হবে না কেন?

তা ছাড়া সুমিত্রার বাবা তার কি ক্ষতিটাই না কবেছে! তা সত্ত্বেও তো সে তাদের ক্ষমা করেছে, অসম্মান থেকে, অনাহার থেকে বাঁচিয়েছে। এখন যদি তার বিনিময়ে সে তাকে উপভোগই কোরে থাকে এমন কি অন্যায় হয়েছে?

হ্যাঁ সুমিত্রা তাকে জানিয়েছে বটে তার গর্ভে তারই সন্তান। বেশ, তাতেই বা কি? যদি তার জন্যে তাকে কোন অসুবিধেয় পড়তে হয় সে না হয় কোলকাতায় গিযে থাকুক। সে জন্যে যা টাকাকড়ি লাগে সে দেবে, যেমনটি সে দিয়েছে নিভা দাসগুপ্তকে। সে ইচ্ছে করলে এমন কি তার আশ্রিতা হোয়েও থাকতে পারে। তাকে সে সুযোগ দিতেও সে প্রস্তুত। সে এখনও তো বেশ সুন্দরীই আছে এবং তাকে তাব ভালোই লাগে।

এর পরও আব তার কি বলবার থাকতে পারে? তারই একজন সামান্য প্রজার মেয়ে হোয়ে সে তার ভালোবাসা পেয়েছে, তার সঙ্গ পেয়েছে—একি বড় কম সৌভাগ্য। এ জন্যে তো তার বরং কৃতজ্ঞই থাকা উচিত।

হ্যাঁ, সেই ভালো। সে তাকে বরং সেই প্রস্তাবই কোরে পাঠাবে।

তবে কথা হচ্ছে যদি তার ভাবী স্ত্রী জানতে পারে? পারলেই বা। যদি কিছু মনে করে? কেনই বা করবে? এ আর এমন কি! কোন্ জমিদারেরই বা এ বিলাসিতা নেই? তার নিশ্চয়ই জানা উচিত দুনিয়াটাকে যদি না ষোলআনা ভোগ করতে পারা গেল তবে জমিদার হোয়ে জন্মানো কি করতে?

অমরেশ উত্তরাধিকারসূত্রে তার বাবার শুধু সম্পত্তিই পায়নি, মতবাদও যে পেয়েছে।

অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর একদিনের ছুটি পেয়ে আজ দেবনন্দন এসেছে হেমাকে দেখতে। হেমা এখন বেশ সুস্থ হোয়ে উঠেছে। তবে খুব দুর্বল। এখনও কাজে যোগ দিতে পারেনি।

দেবনন্দন তাকে বোঝাচ্ছে এখন তার বেশী খাটাখাটুনি করা উচিত নয়, তা হোলে সে আবার অসুখে পড়তে পারে।

"কিন্তু রাত দিন শুয়ে থাকতে কি আর ভালো লাগে? তা ছাড়া বেশী দিন কামাই কবলে চাকরী থাকবে কেন?" হেমা বলে।

"কিন্তু তুমহার তো নওকরী না করলেও চলে হেমা।"

"বাবে! তা কেমন কোরে হয়? খাব কি?"

দেখা যাচ্ছে 'আমরণ' 'মিনসে' প্রভৃতি কথাগুলি হেমা আর আগের মত কথায় কথায় দেবনন্দনের উপর বর্ষণ করছে না। বোধ হয় অসুখের প্রভাব। অথবা হয়তো দেবনন্দনের ব্যবহারে তার সে আক্রমণাত্মক রূপেব কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে।

দেবনন্দন বলে, "কেন? তুমহার ভাই তুমহাকে খিল্যবে। সে তো তুমহারে খুব পেয়ার করে।"

"কিন্তু তার কষ্ট হবে তো! তার যে নিজেব সংসার রয়েছে।"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে দেবনন্দন বলে, "না, না, তুমহাকে আউর নওকরি কোরতে হামি দিবো না। হামি তুমহাকে খিলাবো।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

বেশ ঘনিষ্টভাবেই তাদের কথাবর্তা চলেছে এমন সময়ে হঠাৎ জমিদারবাড়ী থেকে লোক এসে জানালো হেমাকে জমিদাববাবু ডাকছেন, এখনই যেতে হবে।

হেমার মুখের হাসি কোথায় মিলিয়ে গেল। সভয়ে সে বললে, "কিন্তু আমি তো অ্যাকোনো সম্পূর্ণ—"

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই লোকটি বললে, "ভয় নেই। তোমায এক পাও হাঁটতে হবে না। তোমার যেতে কষ্ট হবে বোলে জমিদারবাবু পাল্কি পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

এর ওপব আর 'না' করা যায না। জমিদার তা হোলে অসন্তুষ্ট হবেন। কাজেই মাথাটি হেঁট কোরে হেমাকে বলতেই হয় "আচ্ছা যাচ্ছি।"

"কিন্তু দেরী কবলে চলবেনি," লোকটি বলে। "জমিদারবাবুর হুকুম আধ ঘণ্টার মধ্যে হাজির হতে হবে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেমা বললে, "আচ্ছা গো, তাই হবে।"

"তবে এখনি ওঠ। কিন্তু আরে! এ কে? দারোয়ানজী তুমি এখানে? তুমি তো এখন বাইরে কোন্ জায়গাটায় আছো না?"

"হ্যাঁ।"

"তবে কি কোরে এলে? হাওয়ায উড়ে নাকি?"

"তা কেনো হোবে? ছুটি লিয়ে এসেছি।"

"তা ভালো। কিন্তু এখানে?"

"হেমার ওসুখ আছে তাই দেখতে এসেছি।"

"ভালো, ভালো। আচ্ছা হেমা আমি চললুম। একটু শীগগির কোরে নাও তা হোলে। পাল্কি রইলো। যেন দেরী কোরে ফেলোনি বাপু। ফ্যাসাদ হবে।"

লোকটি চলে গেল।

দেবনন্দন হেমার দিকে চাইলো। তার উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তবু উঠতেই হবে।

হেমাও তার দিকে চেয়ে রইলো, অসহায় ভাবে।

অবশেষে হেমা বলে. "উঠি পাঁড়েজী। যেতেই তো হবে।"

"হাঁ, দুসরা উপায় কি আছে? লেকিন তুমহাকে হামি আউর নওকরি করতে দিবো না।"

ভিন্‌রাজ্যবাসী এই মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় হেমার চোখে জল আসে।

অনেক দিন পরেই আজ আবার হেমা চলেছে উত্তরপাড়ায়, রমানাথ ভটচায্যির ওখানে। বরাবর সে হেঁটেই গেছে। আজ অবশ্য অসুস্থতার দরুন তাকে পাল্কির ব্যবস্থা কোরে দেওয়া হয়েছে।

হেমা চলেছে জমিদারের চিঠি দিতে সুমিত্রাকে।

যেতে যেতে সে ভাবে, "মিছি মিছি আবার চিঠি কেন বাপু?"

চিঠিতে মাথামুণ্ডু কি আছে তা সে জানে না। তবে ঘরে বোসে সে এমন কিছু শুনেছে যার জন্যে তার মনে এই প্রশ্ন। সে শুনেছে কে এক মস্ত বড় জমিদারের মেয়েকেই শেষ পর্যন্ত অমরেশ বিয়ে করছে, সুমিত্রাকে নয়। পাকা পর্যন্ত নাকি দেখা হোয়ে গেছে। শুনে অবধি তার মনে শান্তি নেই। অমন নিরীহ মেয়েটাকে নিয়ে লোকটা শেষ পর্যন্ত এই খেলা খেললে! কিছুদিন আগেও তো আর একটা মেয়েরও এমনি সর্বনাশ করেছে!

সুমিত্রার জন্যে তার খুবই কষ্ট হয়। ইস্! বেচারীর মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে, তাকে আকাশকুসুম আশা দিয়ে. শেষে কিনা তাকে এইভাবে পথে বসালো!

সে অবশ্য যা শুনেছে তা সত্যি কি না সে এখনও ঠিক জানে না। তবে জমিদাররা, বড়লোকরা তো সব পারে। অমরেশের বাপঠাকুরদারও তো চরিত্র ভালো ছিল না। মদ নিয়ে, মেয়ে নিয়ে তারাও রীতিমত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন কোরে গেছে। কোথাও কোন সুন্দরী মেয়ে যদি নজরে পড়েছে তো ব্যস, আর রক্ষে নেই। অমরেশ তো সেই ঘরেরই ছেলে!

ওদিকে গত ক'দিন ধোরেই সুমিত্রাকে নিয়ে উত্তরপাড়ায় জোর ঘোঁট চলেছে। কথাটা নিয়ে প্রথম প্রথম লোকে প্রকাশ্যে নাড়াচাড়া করতে সাহস করতো না, পাছে

জমিদারের কোপে পড়তে হয়। কিন্তু যেদিন তারা শুনলো ভূকৈলাসের জমিদারের মেয়ের সঙ্গে জমিদারের বিয়ে পাকাপাকি ঠিক হোয়ে গেছে এবং এতদিন ধোরে তারা যা শুনেছে তা মিথ্যে, সেদিন থেকেই তাদের মুখের আগল গেল খুলে।

এখন পথে হাটে মাঠে ঘাটে যেখানেই যাও সর্বত্রই শুনতে পাবে মুখর আলোচনা।

ঠানদির তো আর বিরাম বিশ্রাম নেই। তিনি ঘোরেন ফেরেন আর বলেন, "মাগো মা! সমাজের কলঙ্ক! অমন মেয়ের বিষ খেয়ে মরা ভালো।"

কথাটা সুমিত্রার কানে পৌঁছতে দেরী হোল না। ভয়ে সে গুম হোয়ে গেল।

শেষে একদিন দেখা গেল গ্রামবাসীরা রমানাথের বাড়ী চড়াও হয়েছে। রাধু চক্রবর্তী তো ফেটে পড়লেন, "অতটা বাড়াবাড়ি করাটা তোমার আদৌ উচিত হয়নি রমানাথ। রায়েদের স্বভাবচরিত্র তোমার অজানা থাকার কথা নয়। ঘরে তোমার সুন্দরী মেয়ে থাকতে কেন তুমি ওকে অতটা প্রশ্রয় দিলে?"

একজন পাশ থেকে বোলে উঠলো, "লোভ, লোভ, বুঝলে না?"

নিতাই মোড়ল এতক্ষণ দু'কথা শোনাবার জন্যে ছটফট করছিল : "কিন্তু লোভ এমন হবে যে মানুষ নিজের মেয়ের পর্যন্ত সব্বনাশ করবে?"

তিনু ঘোষাল · "যে করে করুক। এখন কথা হচ্ছে কি, সমাজে যে এমন জিনিস ঘটবে আর আমরা চোখ বুজে বোসে থাকবো এ হোতে পারে না। আমাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করতে হয়।"

"বটেই তো। বটেই তো!" হরি পোদ্দার চেঁচিয়ে উঠলেন।

আরেকজন : "আহা বেচারি বড় আশা করেছিল জমিদারের শ্বশুর হবে!"

ঠানদির গলা পাওয়া গেল : "মেয়েটাই কি কম! ওই তো গিয়ে জমিদারকে ডেকে এনেছিল।"

"না, না, এতে সমাজ নষ্ট হোয়ে যাবে। পঞ্চায়েত ডাকা হোক, বিচার হোক।" অনেকে একসঙ্গে বোলে উঠলো।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, পঞ্চায়েত ডাকা হোক," প্রতিধ্বনিত হোল।

আরও কিছুক্ষণ ধোরে চললো এই রকম। তারপর তারা শাসাতে শাসাতে চলে গেল।

রমানাথ তো এতক্ষণ মাথাই তুলতে পারছিলেন না। সাবিত্রীও বসেছিলেন দাওয়ায় ঘোমটা ঢাকা দিয়ে। তাঁর চোখে জল। আর সুমিত্রা? সে তো ঘরের বার হোতেই সাহস করেনি, ভয়ে দরজায় খিল দিয়ে বসেছিল।

তারা চলে যাবার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে রমানাথ কেঁদে উঠলেন, "নারায়ণ!"

হঠাৎ আবার জমিদারবাড়ীর ঝি হেমাকে রমানাথের বাড়ীর সামনে পাল্কি থেকে নামতে দেখে গ্রামসুদ্ধ লোক অবাক হোয়ে গেল।

তা হোলে কি তারা যা শুনেছে তা ঠিক নয়? সুমিত্রাকে কি তা হোলে জমিদার ছেঁটে ফেলে দেয়নি? অথচ কাছে এগিয়ে এসে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতেও কেমন বাধো বাধো ঠেকছে। এই সেদিনই যে তারা রমানাথকে বাড়ী বয়ে যাতা শুনিয়ে দিয়ে এসেছে!

হেমাকে প্রথমে দেখতে পান সাবিত্রী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন আনন্দে দুলে উঠলো। নিশ্চয়ই কোন সুসংবাদ আছে। ছুটে এসে তিনি সুমিত্রার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন: "সুমিত্রা, মা, শীগগির দরজা খোল্, হেমা এসেছে।"

রমানাথও তাঁর ঘরে থেকে উৎকর্ণ হোয়ে উঠলেন।

"হেমা এসেছে?" আনন্দে সুমিত্রার স্বর কেঁপে উঠলো। তা হোলে কি অমরেশের মা রাজী হয়েছেন? সে যেন অকূলে কূল পেল। হয়তো সেই খবরই জানাতে হেমা এসেছে।

সে তাড়াতাড়ি বেরোতে যাবে হঠাৎ একটা কথা তার মনে পড়লো। সে থমকে দাঁড়াল। হেমা টের পাবে না তো যে সে অন্তঃসত্ত্বা? অবশ্য জিনিসটা এখন খুবই প্রচার হোয়ে গেছে। কিন্তু তবু তার কেমন যেন ভয় করে। কোথাও সে এখন আর সেইজন্যে যায় না। পুকুরে পর্যন্ত না। যেতে গিয়ে মনে হয় ঐ বুঝি কে তার দিকে তাকিয়ে আছে। যদি সে কোন সময়ে দেখে দুজনে দাঁড়িয়ে কথা কইছে তার মনে হয় বুঝি তারা তার সম্বন্ধেই বলাবলি করছে। ঝি বাতাসী সেদিন তার দিকে চেয়ে কি বলছিল। হঠাৎ তার চোখেব দিকে চাইতে গিয়ে সে কি যে দেখতে পেলো জানি না, তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে পালিয়ে এল। বাপমার সামনেও মাথা তুলে আর সে দাঁড়াতে পারে না। তার জন্যেই তো তাঁদের এ লাঞ্ছনা! বাপমা, প্রতিবেশী, সকলেরই সে এখন ঘৃণার পাত্র। আপনার ঘরটিতে সে তাই সকল সময়েই বন্দী হোয়ে বোসে থাকে। জানলায় পর্যন্ত দাঁড়াতে সাহস করে না।

তাড়াতাড়ি সে কাপড়খানা ভালো কোরে জড়িয়ে নিলো। তারপর একবার নিজের দিকে চাইলো। নাঃ, ঠিক হোল না। মনে হচ্ছে যেন তার শরীরের সামনের অংশটা এই ক'দিনে আরও উঁচু হোয়ে উঠেছে। র‍্যাপারটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে সে জড়িয়ে নিল, তারপর খিল খুলে বেরিয়ে এলো।

হ্যাঁ, হেমাই তো।

হেমা সাবিত্রীকে প্রণাম করতে ভুললো না।

সাবিত্রীও বেশ খাতিরযত্ন কোরেই তাকে বসালেন।

"চেহারাটা মেয়ের রোগা রোগা লাগছে কেন গা?" সাবিত্রী জিগগেস করলেন।

"হ্যাঁ মা, বড্ড অসুখ হয়েছিল।"

"ইস! একেবারে আধখানা কোরে দিয়েছে শরীরখানা। বোস মা, বোস। মিত্রার সঙ্গে গল্প করো, আমি পান নিয়ে আসি।"

সাবিত্রী চলে গেলেন। যে নৈরাশ্য ও গ্লানি ক'দিন ধোরে তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত কোরে রেখেছিল তা যেন অনেকখানি সরে গেল।

"তারপর মিত্রাদি? খবর কি বলো।" হেমাই শুরু করলো।

"খবর তো ভাই তোমাদের কাছে।" ম্লান হাসি হেসে সুমিত্রা বললে।

হেমা লক্ষ্য করলো মা ও মেয়ে দুজনেরই মুখে বিষাদের ছায়া। কিন্তু সে কোন মন্তব্য করতে সাহস করলো না। তা ছাড়া হঠাৎ তার শরীরটাও কেমন যেন ভালো লাগছিল না। তাই উত্তরে শুধু বললে,"হ্যা দিদি, ঠিক বলেছ। এই নাও।" বলতে বলতে খামে মোড়া চিঠিখানা সুমিত্রার সামনে তুলে ধরলো।

সুমিত্রাও আশা করেছিল হেমা যখন এসেছে তখন নিশ্চয়ই তার জন্যে কিছু একটা নিয়ে এসেছে।

চিঠিখানা নিতে নিতে সে বলে. "তোমার শরীরটা সত্যিই ভাই বড্ড ভেঙে গেছে। তুমি দিন কতক ছুটি নাও না কেন?"

সাবিত্রী পান নিয়ে এলেন।

পান নিতে নিতে হেমা বললে, "ছুটিতেই তো ছিলুম দিদি। হঠাৎ আজ জমিদারবাবু ডাকিয়ে তোমায় দেবার জন্যে এই চিঠিখানা দিয়ে পাঠালেন।" বলতে বলতে সে এবার যেন একটু হাঁপাতে লাগলো।

বটে! অমরেশের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মা ও মেয়ের হৃদয় ভরে উঠলো।

আশায় দুলতে দুলতে সুমিত্রা চিঠিখানা খামের ভেতর থেকে বার করতে যাবে এমন সময়ে হেমা দাঁড়িয়ে উঠে বলে উঠলো. "দিদিমণি শরীরটা তেমন ভালো লাগছে না। আমি এখন যাই। আবার আসব'খন।'

মা ও মেয়ে দুজনেই উৎকণ্ঠিত হোয়ে উঠলো।

সাবিত্রী বললেন, "এখানে না হয় একটু শোবে মা?"

"না মা। পাল্‌কি রয়েছে, কষ্ট হবে না। বরং এইবেলা বেরিয়ে পড়ি। সন্ধের মধ্যেই পেঁাছুতে পারবো।"

সাবিত্রী ও সুমিত্রা তার পেছন পেছন গিয়ে তাকে এগিয়ে দিলেন।

হেমা চলে গেল। দু'একজন কৌতূহলপূর্ণ চোখে আশেপাশে দাঁড়িয়েছিল। তারা দাঁড়িয়েই রইল।

সাবিত্রী মেয়েকে চুপি চুপি বললেন, "চিঠিখানা কোথা ফেললি?"

"এই যে আমার হাতে।"

"চ মা, চ। কি লিখেছে দেখবি চ।"

আশায় ও আগ্রহে দুজনেরই অন্তর অধীর হোয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি তারা ভেতরে গেল।

উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সুমিত্রা চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলো।

কিন্তু একি! একি লিখেছে অমরেশ! সুমিত্রা পড়তে লাগলো: "মা কিছুতেই রাজী নন। কাজেই যা ভাবা গিয়েছিল তা আর হোল না। হয়তো তুমি এতে একটু আঘাত পাবে। কিন্তু মনে রেখো তোমাদের কাছ থেকে আমরাও তো বড় কম আঘাত পাইনি। তবে, তবে হ্যাঁ, যদি তুমি মনে কর তোমার এখানে থাকা আর চলবে না, তুমি কোলকাতায় গিয়ে থাকতে পারো, খরচ যা লাগে আমি দোব।"

সুমিত্রার মাথাব মধ্যে কেমন যেন কোরে উঠলো। সে পড়ে গেল।

সাবিত্রী একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিলেন উদ্‌গ্রীব হোয়ে, চিঠিতে জমিদার কি লিখেছেন শুনবেন বোলে।

"কি হোল? কি হোল?" বলতে বলতে তিনি ছুটে এলেন।

সাবিত্রীর গলা পেয়ে রমানাথও এলেন ছুটে।

মাথায় জল ও হাওয়া দিতে দিতে মেয়ের জ্ঞান ফিবে এলো। সে উঠে বসলো।

"কোথাও লাগেনি তো মা?" অশ্রুসিক্ত নযনে পিতা প্রশ্ন করলেন।

সাবিত্রী চিঠিখানা কুড়িয়ে নিলেন। তারপর মেয়েকে ধোরে আস্তে আস্তে ঘরে নিয়ে গিয়ে কাপড়খানা ছাড়িয়ে শুইয়ে দিলেন।

বেরিয়ে এসে স্বামীকে বললেন, "আশা করবার তো আর কিছু নেই। তবু একবার দেখো তো চিঠিতে কি লিখেছে।"

রমানাথ পড়লেন। তারপর স্ত্রীকে পড়ে শোনালেন।

"উঃ!" সাবিত্রী দাওযায় বোসে পড়লেন। রমানাথও কেঁদে উঠলেন: "নারায়ণ! একি করলে!"

পবদিন হঠাৎ কি ভেবে রমানাথ মেযেকে বললেন, "দে তো মা একখানা খুব কাকুতি-মিনতি কোরে লিখে, দেখি একবার জমিদারের কাছে নিয়ে গিয়ে। এবার যদি হাতে পায়েও ধরতে হয় ধরবো।"

বাসুদেবপুরের সভা চাষীদের মনোবল খুবই বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের বিশ্বাস জন্মেছে তারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয় কারও সাধ্য নেই তাদের দমাতে পারে। দেখা গেল যেখানে তাদের প্রথম সভা লেঠেল পাঠিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল সেখানে তাদের এবারকার সভা শুধু মাত্র বিরাট জনসমাগম দেখেই জমিদারপক্ষ ভাঙতে আর সাহস করলো না।

সভায় সেদিন বক্তারা যেসব গরম গরম কথা বলেছিলেন তাতেও খুব কাজ হয়েছে। সবচেয়ে কাজ করেছে শচীনন্দনের শিক্ষা। তাদের চোখ খুলে দিয়েছে। তারা এখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, "সত্যিই তো! জমিদার কি জন্যে? কেন আমরা খাটবো আর ঐ পরগাছাদের খাজনা দোব?"

চতুর্দিকে দ্রুত ওদের সংগঠন ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের আওয়াজ শুনে অন্যান্য

অঞ্চলের চাষীরাও অনুপ্রাণিত হচ্ছে। তারাও মাঝে মাঝে শচীনন্দনকে নিয়ে গিয়ে সভাসমিতি করছে।

রায়েদের সারা জমিদারিই যেন আজ তপ্ত খোলা। সর্বত্রই বিক্ষোভ, সর্বত্রই উত্তেজনা। চাষীরা তো জমিদারের লোকজনকে গ্রাহ্যই করে না, বলে "যান, খাজনা দোব না, কি করতে পারেন করুন।"

গোমস্তাদের মাথা খারাপ হোয়ে যাবার মতো। তারা অনুতাপ করতে লাগলো : "কেন ম্যানেজার সেদিন মীটিং করতে দিলেন?"

অবিলম্বে অমরেশকে সমস্ত বিষয় জানানো হোল।

"নাঃ, এ এক বিশ্রী ব্যাপার!" অমরেশ মার কাছে গিয়ে বলে।

তারপর মা ও ছেলেতে মিলে দুদিন ধোরে খুব পরামর্শ চললো। তারপর এক নির্দিষ্ট দিনে অমরেশ কর্মচারীদের সকলকে প্রাসাদে ডেকে পাঠালো।

বারাণ্ডায় বসলো সভা।

জমিদারির বিভিন্ন জায়গার অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করা হোল। স্থির হোল আরও শ আড়াই লেঠেল শীঘ্রই চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। অবস্থা যেমন কোরেই হোক আয়ত্তে আনতে হবে।

আর থাকতে পারলেন না ম্যানেজারবাবু, বললেন, "তাতে ফল আরও খারাপ হবে বাবাজী। এতগুলো গ্রাম যখন বেঁকে দাঁড়িয়েছে—"

অমরেশ ভাবতে লাগলো, কি আশ্চর্য! কেন উনি অমন আপত্তি করছেন? তাহোলে তো মা যা বলেছেন তা ঠিক; উনি নিশ্চয়ই একটা কিছু বাধাতে চাইছেন।

বাধা দিয়ে সে বলে, "সে জন্যে তো আপনিই দায়ী ম্যানেজারকাকা।"

"আমি দায়ী?"

"হ্যাঁ। কেন আপনি মীটিং ভাঙতে মানা করলেন?"

"না করলে যে অবস্থা আরও খারাপ হোত বাবাজী।"

"তা হয়তো নাও হোতে পারতো ম্যানেজারবাবু," শ্রীকৃষ্ণবাবু বললেন। "মনে আছে ওদের প্রথম মীটিং ভেঙে দেওয়ার ফলে ওরা কিরকম মুষড়ে পড়েছিল?"

অমরেশ : "মীটিং ভেঙে দেওয়াই আপনার উচিত ছিল। তা না করায় বলবো ওদের আপনি সাহায্যই করেছেন।"

ম্যানেজারের মুখ দিয়ে আর কথা বেরোলো না। তিনি আকাশের দিকে চেয়ে নিশ্চল হোয়ে বোসে রইলেন।

গোমস্তাদেরও আর কেউ কোন মন্তব্য করলো না। তবে তাদের মধ্যে যারা ম্যানেজারের ওপর চটা, মনে হোল তারা যেন কিছুটা খুশীই হয়েছে তাঁকে ভর্ৎসিত হোতে দেখে।

অমরেশ বুঝতে পারলো ম্যানেজারকে অধস্তন কর্মচারীদের সামনে এভাবে তিরস্কার করাটা ঠিক হোল না। তিনি বেশ ক্ষুণ্ণই হয়েছেন। অথচ এই সঙ্কটপূর্ণ

সময়ে বিরোধ করা ঠিক নয়। সুর নরম কোরে সে বললে, "কি জানেন ম্যানেজারকাকা? আপনি এখন বুড়ো হোয়ে পড়েছেন কিনা। আর ঠিক আগেকার মতো তেমন শক্ত হাতে জমিদারি চালাতে পারছেন না। তা ছাড়া তখন হয়তো প্রজারা ছিল অন্য রকম। এই দেখুন না কয়েক মাস আগে পর্যন্ত সব ছিল বেশ ঠাণ্ডা। এ সব উৎপাতই ছিল না। আর আজ? এখানে গোলমাল, ওখানে গোলমাল। এই তো আপনাদের মুখেই শুনছি বিশ পঁচিশখানা গ্রাম জুড়ে গোলমাল ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই কড়া না হোলে চলে কি কোরে বলুন? প্রজাদের একটু শিক্ষা দেওয়াও তো দরকার।"

শ্রীকৃষ্ণবাবু বললেন, "কথাটা হুজুর আপনি ঠিকই বলেছেন।"

হঠাৎ এই সময়ে ম্যানেজারবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "আমার শরীরটা খারাপ লাগছে বাবাজী। আমায় উঠতে অনুমতি দাও। সভার শেষে যেমনটি নির্দেশ দেবে সেই মতোই কাজ হবে।"

উৎকণ্ঠা প্রকাশ কোরে অমরেশ বললে, "সে কি! শরীরটা আপনার খারাপ লাগছে! তা হোলে তো. হ্যাঁ তা হোলে তো উঠতেই হয়। দাঁড়ান, একজন চাকরকে সঙ্গে দি। এই সুরেন! এই নবীন! চাকরগুলো সব গেল কোথায়?"

দু'তিনজন চাকর দৌড়ে এলো।

"থাক্, দরকার হবে না বাবাজী, আমি একলাই যেতে পারবো।" বলতে বলতে ম্যানেজারবাবু চলে গেলেন।

দু'তিনজন চাকর তা সত্ত্বেও তাঁর পেছন পেছন গেল।

গোমস্তাদের মধ্যে একজন মন্তব্য করলো, "সত্যিই ম্যানেজারবাবু আর আগেকার মতো তেমন শক্ত মানুষটি নেই।"

অমরেশ "কিন্তু শ্রীকেষ্টবাবু, জিগগেস করি ম্যানেজারবাবু না হয় মানা করেছিলেন, কিন্তু আপনার নাকের ডগায় যে ওরা অমন কোরে মীটিং কোরে আমায় যাহান্নামে পাঠিয়ে গেল. কই আপনি তো একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করলেন না?"

"হুজুর, করি কেমন কোরে? ম্যানেজাববাবু যখন বোলে পাঠালেন লেঠেলদের সামলাবেন, মীটিংয়ে যেন কোন রকম হাঙ্গামা না হয় তখন আমি ধোরে নিলুম তা নিশ্চয় আপনারই হুকুম। কাজেই অমান্য করতে পারলুম না। কিন্তু আপনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন আমি তখনই বলেছিলুম এবার চাষীদের ঠেকানো দায় হবে।"

গোমস্তা বলরামবাবু: "কিন্তু ম্যানেজারবাবু বারণ করলেন কেন?"

আরেকজন · "সে তো উনি বোলেই গেলেন, অবস্থা নাকি আরও খারাপ হোত।"

"কিন্তু তা যে হোত না, বরং ভালো হোত তার দৃষ্টান্ত তো প্রথম সভা।"

অমরেশ · "মজার কথা এই যে আমায় এ সম্পর্কে ম্যানেজারবাবু বিন্দু-বিসর্গও জানাননি।"

"সেকি! সেকি!" অনেকে একসঙ্গে বলে উঠলো।

শ্রীকৃষ্ণবাবু: "আপনার মত না নিয়ে কাজ করাটা ম্যানেজারবাবুর খুবই অনুচিত হয়েছে স্যার। জমিদারি তো তাঁর নয়, আপনার।"

"যাক যা হয়েছে এবার থেকে আর যাতে না হোতে পারে তার ব্যবস্থা আমি করছি।" তারপর একটু থেমে কি ভেবে, "আচ্ছা হ্যাঁ, বলুন তো আপনারা কি ভাবছেন? গোলমাল কি আর বাড়তে দেওয়া উচিত?"

"আজ্ঞে নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না," সকলে সমস্বরে বোলে উঠলো।

"তা হোলে আমি যা বলছিলুম, আরও শ আড়াই লেঠেল—"

"শ আড়াইয়ে হবে না হুজুর। অন্তত শ পাঁচেক চাই।" একজন মন্তব করলো।

"বেশ, তাই হবে। আপনারা তাহোলে যে যেখান থেকে পারেন কিছু কিছু কোরে—"

"ঠিক আছে হুজুর।"

"গোলমাল আমাকে ঠান্ডা করতেই হবে।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।"

"আর সেই সঙ্গে ঐ গোলমালের সর্দারটাকেও—"

কিন্তু মনের ইচ্ছা যত্রতত্র প্রকাশ করা বিজ্ঞোচিত হবে না ভেবে অমরেশ নিজেকে চেপে গেল।

সম্মেলন শেষ হোল। অমরেশ তার সমাপ্তি-বক্তৃতায় গোমস্তাদের আরও কড় হোতে নির্দেশ দিয়ে বললে, "এখন থেকে আপনারা সরাসরি আমার সঙ্গেই যোগাযোগ রেখে কাজ করবেন।"

চা ও জলযোগে আপ্যায়িত হোয়ে গোমস্তারা বিদায় নিল।

তাদের ছুটি দিয়ে অমরেশ সবেমাত্র বোসে তার কুকুর জ্যাককে নিয়ে আদর করছে এমন সময়ে একজন চাকর এসে খবর দিলো একটি লোক প্রায় ঘণ্টা দুই হোল বসে আছে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

"কে?" অমরেশ জিগগেস করলো।

"রমানাথ ভটচাযিয়।"

"আঃ ভালো জ্বালা! কেন ও লোকটা রোজ রোজ আসে? এখন হবে না বোলে দে।"

চাকর চলে গেল। খানিক পরে আবার ফিরে এসে বললে, "হুজুর, উনি বলছেন কবে এলে আপনার সুবিধে হবে, তা হোলে সেইদিন আসতে পারেন।"

"বোলে দে আর আসতেই হবে না। আমার কোনদিনই সুবিধে হবে না।"

অবাক হোয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চাকর চলে গেল।

কয়েক মিনিট পরে আবার ফিরে এসে সে বললে, "হুজুর, উনি কিছুতেই যেতে চাইছেন না। বলছেন এই চিঠিখানা আপনাকে দিতে। বলছেন পড়ে যেন হুজুর জবাব দ্যান।"

"আঃ! আচ্ছা জবালা! কই নিয়ে আয় দেখি।"

মেয়েলি হাতে লেখা কাকুতি-মিনতি ভরা চিঠি। দু'এক পংক্তি পরেই লেখা : "একদিন তুমি যে আমায় বড় আশা দিয়েছিলে। আর সেই আশাতেই তো আমি তোমায় আমার সর্বস্ব সঁপে দিয়েছিলুম। আজ আমি হোতে চলেছি তোমার সন্তানের জননী। এতোটা এগিয়ে নিয়ে এসে তুমি আমায় ফেলে দেবে? একবার ভেবে দ্যাখো আমার অবস্থা তা হোলে কি হবে? বাবার যদি অপরাধ হোয়ে থাকে, তোমার পায়ে ধরছি তাঁকে ক্ষমা করো। তোমার মাকেও তুমি একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করো। ওগো, তিনি তো নারী। নারী হোয়ে তিনি নারীর এ সর্বনাশ করতে দেবেন? কখনও না। তুমি আমায় লিখেছ কোলকাতায় গিয়ে থাকতে। কিন্তু বলো সেখানকার সমাজেই বা আমি এ মুখ দেখাবো কি কোরে? না, না, দুনিয়ায় আর কোথাও আমার ঠাঁই হবে না। সবাই আমায় 'ছি ছি' করবে, সবাই আমার গায়ে থুথু দেবে। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি এমন কোরে আমায় পথের ধুলোয় ফেলে দিও না। আমায় বাঁচাও, আমায় রক্ষে করো। ইতি— তোমার অভাগিনী মিত্রা।"

অমরেশের ভিতরটা একবার দুলে ওঠে। অতীতের স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অন্তরের কোণে যেন এক ফোঁটা অশ্রু দেখা দেয়।

কিন্তু মুহূর্তের জন্যে।

পরমুহূর্তেই সে চিঠিখানা টুকরো টুকরো কোরে ছিঁড়ে ফেলে চাকরের হাতে দিতে দিতে বললে, "নিয়ে যা এগুলো। লোকটাকে বল্—"

হঠাৎ কে যেন ঢুকলো।

"কে? কে ওখানে?"

"আমি বাবাজী, রমানাথ।"

"কে আপনাকে এখানে ঢুকতে বলেছে?" তারপর একটু থেমে : "যাক্, ভালোই হয়েছে। এই নিন আপনার চিঠির জবাব।" বলতে বলতে চাকরের হাত থেকে চিঠির টুকরোগুলো নিয়ে তাঁর দিকে সেগুলো ছুঁড়ে দিলো।

"সে কি বাবাজী! তুমি যে আমার ছেলের মতো।"

"মনে কোরে দেখুন একদিন আপনিও আমার বাবাকে এমনি জবাব দিয়েছিলেন।"

"বাবাজী আমি কোনদিন তাঁকে অসম্মান করিনি। তবে হ্যাঁ, তোমারই বিধবা কাকিমা ছেলে কোলে নিয়ে পথে বসবে তাই আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজী হইনি, আমি মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে পারিনি।"

অমরেশ চুপ কোরে রইলো।

"বাবাজী!" রমানাথ ডাকলেন। "বাবাজী একবার ভেবে দ্যাখো আমাদের কি অবস্থা হবে—"

"আপনি এখান থেকে যান। আমারও বড় কম সর্বনাশ আপনি করেননি।"

"বাবাজী কি বলছো? কার সঙ্গে কিসের তুলনা করছো!"

"ঠিকই বলেছি। আপনি যান। আমায় বিরক্ত করবেন না।"

"বাবাজী!"

"যান। যান এখান থেকে, শিগ্‌গির যান। নয় তো দরোয়ান ডাকবো।"

"যাচ্ছি বাবাজী, যাচ্ছি। নারায়ণ! নারায়ণ!"

কাঁদতে কাঁদতে বুড়ো সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন।

রাত অনেক হয়েছে। শিয়ালগুলো এইমাত্র হুক্কাহুয়া কোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে থেমে গেল।

প্রাসাদও শান্ত।

কেবল যা মা ও ছেলেতে আলোচনা চলেছে, বারাণ্ডায়।

"যাক, তুই যে শেষ পর্যন্ত ঐ ভটচাযিার মেয়েটার সংস্রব ত্যাগ করেছিস, এতে বাবা আমি খুবই খুশী হয়েছি।"

এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর মার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে অমরেশের লজ্জা হচ্ছিল। সে চুপ কোরে রইল।

নিরুপমা বলতে লাগলেন, "কি জানিস? এসব জিনিস যদি কনেপক্ষের কানে ওঠে, আমার সেই ভয়। অধ্যাপকের মেয়েটার ব্যাপারটা নিয়ে আমি তত ভাবছি না। কেননা ওটা এখানকার দু'একজন ছাড়া কেউ বড় একটা জানে না। কিন্তু এটা যে একেবারে নিজেদের পল্লীতে, জানাজানিও হয়ে গেছে খুব। শত্রুর তো অভাব নেই কথাটা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে। মানুষের মন, যদি বেঁকে বসে?"

অমরেশ মাথা নিচু কোরে থাকে।

ছেলেকে নীরব দেখে মা আর কথা না বাড়িয়ে শুধু বললেন, "যাক, বিয়েটা এখন ভালোয় ভালোয় হোয়ে গেলেই বাঁচি। এদ্দিন তো কবে হোয়ে যেত।" তারপর একটু থেমে: "ভাল কথা, তুই তা হোলে তোর বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছিস কবে?"

"না মা, আমি ভাবছি আর যাবো না। কেননা জমিদারির তো এই গোলমেলে অবস্থা। আর ম্যানেজারকাকাকেও ঠিক আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। তুমি সেদিন ঠিকই বলেছিলে।"

"লোকটা আগে কিন্তু এমন ছিল না। তা হয় সে বয়সের দোষেই হোক, কি তোকে ছেলেমানুষ পেয়েই—"

হাসতে হাসতে অমরেশ বলে, "হয়তো বা দুটো কারণই হোতে পারে। তবে সে যাই হোক, ভদ্দরলোক ধরা পড়ে গেছেন।"

মাও তার হাসিতে যোগ দিলেন। তারপর বললেন, "কিন্তু তুই না গেলে তোর বন্ধু ক্ষুণ্ণ হবে না?"

"হ্যাঁ মা হবে। কেননা অনেক কোরেই বলেছে। শুধু ও নয়, ওর বাবা মা বৌ সকলে মিলে। কিন্তু উপায় কি? প্রজারা যে রকম গোলমাল পাকাচ্ছে তাতে এখান থেকে নড়া এখন উচিত হবে না। অবিশ্যি আমি যদি সব কথা খুলে লিখে দি মনে হয় ওরা ভুল বুঝবে না।"

"তবে সেই ভালো বাবা। তাই না হয় লিখে দে।"

মা খুশীই হলেন। মনে মনে বললেন, "ভালোই হয়েছে। কি জানি, যা ছেলের মতিগতি, বাইরে গেলে যদি আবার মত বদলে ফেলে?"

উৎকণ্ঠা, ভয়, গ্লানি, লজ্জা—এদেরই মধ্যে সুমিত্রার দিনগুলি কাটছে। মাঝে মাঝে অনুতাপও হয় তার খুব। নিজেকে সে ধিক্কার দিতে থাকে।

কখনও আবার ভাবে তারই বা অপরাধ কি? কি কোরেই বা সে বুঝবে অমরেশের মনে এই ছিলো? সে তাকে সরল মনে, সরল বিশ্বাসেই নিজেকে সঁপে দিয়েছিলো। ভেবেছিল যে তাদের জন্যে এতোটা করেছে সে কখনো মন্দ হোতে পারে না, সে যদি তাকে চায় তাতে ক্ষতিই বা কি? তা ছাড়া অমরেশের ব্যবহারে সকল সময়েই এমন একটা প্রেমপূর্ণ দরদের ভাব প্রকাশ পেতো যাতে যে-কোন মেয়েই তার প্রতি আকৃষ্ট না হোয়ে পারে না। ওঃ, ঘুণাক্ষরেও যদি তখন সে জানতে পারতো শেষে তাকে এইভাবে পস্তাতে হবে!

প্রথম প্রথম কি আনন্দেই না তার দিনগুলি কেটেছে! যেন স্বপ্ন। তৃপ্তিতে, সৌরভে, শোভায় তার দেহমন ভরে উঠেছিল, ঠিক যেমন ভরে ওঠে বসন্তের লতা। কিন্তু তারপর? তারপর যেই মুকুল ধরলো, যেই সে অনুভব করলো তার দেহের মধ্যে আর একটি দেহ—বিস্ময়ে, ভয়ে কেঁপে উঠলো সে। তার সন্দেহ হোতে লাগলো বুঝি তাকে দেখে লোকে যা-তা ভাবছে। কেউ যদি দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে তার বুক ঢিপ ঢিপ করে।

তারপর থেকে সে নিজেকে কেবলই লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা কোরে এসেছে। কারও সঙ্গে আর বেশী মেলামেশা করে না। শৈবলিনীর সঙ্গেও না। তিনিও এলে অসুখের ভান কোরে শুয়ে থাকে। এমন কি বাপমার সামনেও আসতে হোলে গায়ে ভালো কোরে কাপড় ঢাকা দিয়ে তবে আসে।

সে ভেবেছিল এইভাবে কোন রকমে আর গোটা কয়েক সপ্তাহ কাটাতে পারলেই ব্যস, তারপরই তো অমরেশের মা ফিরে আসছেন, তারপরই নিশ্চয় তাদের বিয়ে।

হয়তো বড় জোর আর একটা মাস। অমরেশ তো তাকে বারবার সেই আশ্বাসই দিয়ে এসেছে।

কিন্তু তার জায়গায় যখন সেদিন সে অমরেশের কাছে শুনলো তার মা মত দিচ্ছেন না তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো!

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই আবার যখন অমরেশ তার পিঠ চাপড়ে বললে "ভয়ের কি আছে? আমি দেখছি কি করতে পারি," যখন সমস্ত শুনে তার পিতাও মন্তব্য করলেন "দেখে নিও মিত্রা ছাড়া আর কোন মেয়েকে ও বিয়ে করবে না, ও সে ছেলেই নয়," তখন যেন অন্ধকারের মধ্যেও কিছুটা আলো সে দেখতে পেল।

তারপর কিন্তু সেদিন কি ভয়ঙ্কর ভুলই না সে কোরে বসলো রাধুকাকার বাড়ী গিয়ে—ধরা পড়ে গেল। দেখতে দেখতে চারদিকে কথাটা রাষ্ট্র হোয়ে গেল। এখন এমন হয়েছে যে বাড়ীর বার হওয়া, এমন কি লোকের কাছে মুখ দেখানো পর্যন্ত অসম্ভব হোয়ে উঠেছে।

তাতেই কি নিস্তার আছে? সেদিন আবার বাড়ী চড়াও হোয়ে এসে পাড়ার মাতব্বররা যা-তা শুনিয়ে দিয়ে গেল। শাসিয়েও গেল।

তবু আশা। আশায় আশায় সে দিন গুনতে থাকে। অবশেষে এল হেমার হাতে অমরেশের চিঠি। বুঝি ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। কিন্তু একি! এ যে গলায় কলসী বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া!

বাপের হাত দিয়ে সে কাতর প্রার্থনা জানালো জমিদারকে। কি নিষ্ঠুরভাবেই না জমিদার প্রত্যাখ্যান করলেন! ফিরে এসে যখন রমানাথ কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত ঘটনা বলতে লাগলেন—ওঃ তার মনে হোল এর চেয়ে তার মৃত্যুই ছিল ভালো।

ওদিকে সেদিন যারা অনেকদিন পরে হেমাকে আবার তাদের বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছিল তারা প্রথমটা একটু থতমতই খেয়ে গিয়েছিল। দু'একটা দিনের জন্যে তাদের মুখও ছিল বন্ধ। এখন আবার আকাশ বাতাস মুখরিত হোয়ে উঠেছে তাদের কলরবে। শোনা যাচ্ছে শীঘ্রই তারা তাদের একঘরে কোরে দেবে।

এক কথায় অকূল পাথার। কেউ নেই পাশে দাঁড়িয়ে বলে, "ভয় নেই।" রমানাথ তো উঠতে বসতে কাতরাতে থাকেন "নারায়ণ! নারায়ণ!" সাবিত্রীও ঘোরেন ফেরেন বলেন, "কি সর্বনাশই করলি মা?"

অবশেষে আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব হোল না। এক উজ্জ্বল প্রভাতে ফুলের মত সুন্দর এক পুত্রসন্তান সুমিত্রার কোলে জন্ম নিলো।

নবজাত শিশু কাঁদে, চুপ করে, আবার কাঁদে, আবার চুপ করে। কেউই কিন্তু আনন্দধ্বনি করবার নেই। আশীর্বাদ জানাবারও নেই কেউ।

খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। লোকে হুদোয় হুদোয় আসে দেখতে, বাড়ীর আশেপাশে জটলা করে, টিটকিরি দেয়, শাসায়।

সেদিন কিসের যেন পুজো। সন্ধ্যায় মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠলো। গ্রামবাসীরা এলো দলে দলে মন্দিরপ্রাঙ্গণে। সকলেরই বাড়ী থেকে এসেছে নৈবেদ্য। রমানাথ ভটচায্যির বাড়ী থেকেও এসেছিল, কিন্তু গৃহীত হয়নি।

সাবিত্রী দরজার ধারে দাঁড়িয়ে। মন্দিরের দিকে মুখ কোরে গলবস্ত্র হোয়ে কপালে বার বার হাত ঠেকাতে ঠেকাতে বলছেন, "নারায়ণ রক্ষে করো! নারায়ণ রক্ষে করো!"

ক্রমে রাত্রি গভীর হোল। অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবীকে যেন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। ঝিঁঝিগুলো পর্যন্ত। কেবল যা মাঝে মাঝে ঘুঘুর ডাক শোনা যাচ্ছে। সে ডাকে কেমন যেন এক আতঙ্ক।

হঠাৎ দাসী বাতাসীর ঘুম ভেঙে গেল। তাব মনে হোল সুমিত্রার ঘর থেকে যেন গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। সে আর শুয়ে থাকতে পারলো না, তাড়াতাড়ি খিল খুলে বেরিয়ে এল।

সুমিত্রার ঘরের দরজার ওপর কান বেখে সে ভাল কোরে আবার শুনলো। হ্যাঁ, ঠিকই তো। ডাকলো 'মিত্রাদি! মিত্রাদি!'

সাড়া না পেয়ে তার ভয় হোল। সে চীৎকার কোরে উঠলো। তার চীৎকাবে বমানাথ ও সাবিত্রীর ঘুমও ভেঙে গেল। তাঁরাও ছুটে এলেন।

দরজা শেষ পর্যন্ত সাবল মেরে ভেঙে খুলতে হোল। যা দেখা গেল—লোমহর্ষক ব্যাপার। সকলেই একসঙ্গে শিউরে উঠলো।

পাগলের মত সাবিত্রী কেঁদে উঠলেন "ওগো আমার কি সর্বনাশ হোল গো!"

বৃদ্ধ রমানাথ কাঁপতে কাঁপতে খাটের ওপর লাফিয়ে পড়লেন। কে যেন হঠাৎ তাঁব মধ্যে যুবকের শক্তি এনে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি তিনি ডান হাতে ঝুলন্ত সুমিত্রাব দেহখানা জড়িয়ে ধোরে বাঁহাত দিয়ে তার গলার ফাঁসটা খুলে ফেললেন।

সকলে মিলে ধরাধরি কোরে তাকে বিছানার ওপর শুইয়ে দিলো। সাবিত্রী ছুটে গিয়ে জল ও পাখা নিয়ে এলেন। বাতাসী দৌড়োল ডাক্তার ডাকতে।

দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটতে থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে ফাঁসটা সুমিত্রার গলায় তেমন জোরে পড়তে পারেনি এবং বাতাসী খুব সময়েই জেগে উঠেছিল।

"আশঙ্কার কোন কারণ নেই," ডাক্তার বললেন।

সাবিত্রী এতক্ষণ চোখ মুছছিলেন আর সুমিত্রার নিশ্চল মাথাটা কোলে রেখে তার মুখেচোখে ঘনঘন জলের ছিটে দিচ্ছিলেন। ডাক্তারের মন্তব্য শুনে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কিন্তু তাঁর অন্তর এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। অদৃষ্টে তাঁর এতও ছিল!

বেচারির চোখ দিয়ে দরদরধারে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। অমরেশের প্রতি ক্ষোভে, ঘৃণায় তাঁর মন ভরে উঠলো।

আর কিছুক্ষণ পরেই সুমিত্রার সংজ্ঞা ফিরে এল। সে একবার চারদিক চাইলে, কিছুই বুঝতে পারলে না, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবার দেখতে লাগলো—বাপ, মা, বাতাসী, ডাক্তার...

কানে এলো বাপ বলছেন, "নারায়ণ! নারায়ণ!"

তার সব মনে পড়ে গেল। লজ্জায় ফ্যাকাসে মুখ লাল হোয়ে উঠলো। মুখে চাপা দিয়ে সে কেঁদে উঠলো :"কেন তোমরা আমায় বাঁচালে?"

জগদ্বল্লভপুর। কৃষকসমিতির অফিসে বোসে শচীনন্দন সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করছে এমন সময়ে একজন চাষী এসে বললে, "শুনছো গো? জমিদেরের নোকজন কৈলেসপুরের চাষীদের ওপর আবার বড্ড অত্যেচার শুরু করেছে।"

উৎকণ্ঠিত হোয়ে সকলে তার দিকে চাইল।

লোকটি বলতে লাগলো, "করছে কি জানো? জোর করে ক্ষেতের সব ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছে।"

উষ্মার সহিত শচীনন্দন বলে উঠলো, "কেন, ওখানকার মানুষ কি মানুষ না? সবাই মিলে কি ওদের ঐ কটা লোককে ঠেকাতে পারে না?"

"তা হোলে আর ভাবনা ছেলো কি? চাষীরা যে সব কাপুরুষ হোয়ে গেছে," জগদ্বল্লভপুরের সবচেয়ে বৃদ্ধ চাষী নকুলেশ্বর মণ্ডল মন্তব্য করলো। তারপর একটু থেমে বৃদ্ধ আবার বলতে লাগলো, "এই দ্যাকোনা! শুধু ওখানে কেন? মনসাতলা, পদ্মপুকুর, ধুলোগড় সব জায়গা থেকেই খবর আসছে জমিদের নেটেল নাগিয়ে ফসল কেটে নিচ্ছে। তবু মনিষ্যিগুনো সাহস কোরে নড়বে? আরে বাপু একদিন তো মরতেই হবে। নায় মেরেই মর্!"

তার বলা শেষ না হোতেই কাঁদতে কাঁদতে এক স্ত্রীলোক এসে উপস্থিত।

"কি হোল গো তোমার আবার?" শচীনন্দন জিগগেস করে।

"আমার ভাইকে কাচারির নোকেরা বেঁদে রোদ্দুরে বসিয়ে রেকে দিয়েচে।" মেয়েটি গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলো।

"তোমার বাড়ী কোথা?" একসঙ্গে দু'তিনজন প্রশ্ন করলো।

"কবরডাঙা।"

সহকর্মীদের দিকে চেয়ে শচীনন্দন জিগগেস করে, "সে আবার কোথা?"

"উই তো কৈলেসপুরের পাশেই," নকুলেশ্বর মণ্ডল বললে।

শচীনন্দনের মনে পড়লো কয়েক বছর আগে নিখিলেশ রায়ের হাতেও এই একই ভাবে চাষীরা নিগৃহীত হোত। তার রক্ত টগবগ কোরে উঠলো।

"চলো দেখি কেমন তোমাদের জমিদার আর কেমন তার লোকজন," বলতে বলতে সে দাঁড়িয়ে উঠলো।

কৃষকসমিতির অফিস থেকে গন্টি কয়েক কর্মী সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে শচীনন্দন যখন জলবল্লভপুরের কাছারিবাড়ী এসে পেঁছিলো তখন তার পিছনে অন্তত হাজার-খানেক লোক। চিৎকারে তারা আকাশ বাতাস ফাটিয়ে ফেলছে।

শচীনন্দন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে যে লোকটিকে গাছে বেঁধে রাখা হয়েছিল তার বাঁধন খুলে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সকলে উল্লাসধ্বনি কোরে উঠলো।

নায়েব শ্রীকৃষ্ণবাবু প্রমাদ গণলেন। তিনি এতোটা কল্পনাও করতে পারেননি। এতোদিন প্রজারা শুধু সভা-শোভাযাত্রা করেছে, লেঠেল গোমস্তা ও জমিদারের ঘেড়োমুড়োও খেয়েছে, কিন্তু কখনও কাছারি চড়াও হোতে সাহস করেনি। আজ একি হোল!

তাঁর কান ফেটে যেতে লাগলো। লোকেরা চিৎকার কোরে কোরে বলছে, "কোথা গেল বেটা নায়েব?আসুক আজ বাইরে, দেখি তার কতো নেঠেল আছে? দেখি তার কোন্ বাপ আজ তাকে রক্ষে করে?"

ভয়ে শ্রীকৃষ্ণবাবুর মুখ এতোটুকু হোয়ে গেল! পালাবার পর্যন্ত পথ নেই। তিনি নিচু গলায় লেঠেলদের দু'চারজনকে নাম ধোরে ধোরে ডাকলেনও। সাড়া পেলেন না। দেখলেন দরোয়ান দেবনন্দন পাঁড়ে অত্যন্ত অসহায় ভাবেই দরজার একধারে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ তাঁর কানে এলো জনতার ভেতর থেকে কে চীৎকার কোরে বলছে, "দে শালাকে আজ এইখানেই শেষ কোরে।"

সঙ্গে সঙ্গে দশবারো জন প্রতিধ্বনি কোরে উঠলো: "ঠিক। ঠিক! দে শালাকে খতম কোরে।"

শ্রীকৃষ্ণবাবুর রক্ত যেন হিম হোয়ে গেল।

সৌভাগ্যের বিষয় অবশ্য অঘটন কিছু ঘটলো না। কথাটা শচীনন্দনের কানে যেতেই সে বুঝে নিলো জনতাকে এখনই আয়ত্তে আনতে না পারলে একটা কিছু হোয়ে যেতে পারে। তৎক্ষণাৎ সে চীৎকার কোরে বললে, "ভাইসব, আপনারা থামুন, অযথা উত্তেজিত হবেন না।" তারপর এগিয়ে এলো দারোয়ানের কাছে।

দরোয়ান তাকে চিনতো। সসম্ভ্রমে সেলাম করলো।

শচীনন্দন তাকে জানালো নায়েববাবুর সঙ্গে সে দেখা করতে চায়।

"বহুৎ আচ্ছা জী।"

দরোয়ান ভেতরে ঢুকলো। খানিক পরেই বেরিয়ে এসে জানালো নায়েববাবু বাইরে আসতে ভয় খাচ্ছেন, সে যদি মেহেরবানি কোরে ভেতরে যায় ভাল হয়।

"শ্রীকৃষ্ণবাবুকে গিয়ে বলো আমি বলছি তাঁর কোন ভয় নেই," শচীনন্দন বললে।

দরোয়ান আবার ভেতরে গেল।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবাবু বেরিয়ে আসতে কিছুতেই রাজী নন।

শচীনন্দনও নাছোড়বান্দা। বললে, "তিনি বেরিয়ে আসুন। তাঁর কোন ভয় নেই। কিন্তু তাঁকে বেরিয়ে এসে সকলের সামনে কৈফিয়ৎ দিতেই হবে। তাঁকে বলতেই হবে কেন তিনি ঐ মানুষটাকে অমনভাবে গাছে বেঁধে রেখেছিলেন।"

অগত্যা শ্রীকৃষ্ণবাবুকে বেরিয়ে আসতে হোল। কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় কোরে তিনি বললেন, "আমার অন্যায় হয়েছে, আপনারা আমায় ক্ষমা করুন।"

বিজয়ের আনন্দে জনতা উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি কোরে উঠলো।

চীৎকার থামলে শচীনন্দন বললে, "আমরা আশা করি আপনাদের কাছ থেকে আর এরকম ব্যবহার আমবা পাবো না। জনসাধাবণের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে ও সেই সঙ্গে যে জমিদারের হুকুম আপনি তামিল করছেন তাঁকে হুঁশিয়ার কোরে দিয়ে যেতে চাই। মনে রাখবেন যদি আপনারা অবিলম্বে প্রজাপীড়ন বন্ধ না করেন ভবিষ্যতে আপনাদের অবস্থা শোচনীয় হবে।"

জনতা চীৎকার কোরে উঠলো, "জনতার দাবী মানতে হবে।"

অমরেশের কাছ থেকে রমানাথ যে মাসোহাবা পাচ্ছিলেন তা বন্ধ হোয়ে গেছে। সুমিত্রাও মধ্যে মধ্যে বেশ মোটা টাকা পেতো। তাও বন্ধ।

ফলে রমানাথের সংসারে আবার একটু একটু কোরে অভাব উঁকি মারতে সুরু করেছে। শীঘ্রই যে আবার আগেকার মতোই নগ্নভাবে দেখা দেবে তা খুব স্পষ্ট।

ঝি বাতাসীকে রমানাথ ছাড়িয়ে দিয়েছেন। গরুটাও আব নেই। হঠাৎ একদিন গরুটার কি একটা অসুখ হয়। বমানাথ ডাক্তারবদ্যি করতে পারলেন না বোলে বেচারি চিরকালের মতো চলে গেল।

পাড়াপড়শী একজনও আর আসে না। গ্রাম্য বিচাবসভা রমানাথ ভটচায্যিকে যে একঘরে কোরে দিয়েছে।

আসেন কেবল শৈবলিনী। তিনি মাতব্বরদের এ অন্যায় রায় মানেননি। মানা তো দূরের কথা, বুড়ী প্রকাশ্যেই তাদের গালিগালাজ কোরে বেড়াচ্ছেন। একটা অসহায় পরিবারের ওপর এমন নির্যাতন!

সেদিন ঘাটে এই নিয়ে বেশ এক চোট হোয়েও গেল। কথায় কথায় ঠানদি বললেন, "তোমার ভাই এ ঠিক হচ্ছে না। গাঁয়েব মাথাদেব অমান্যি কোরে ওখানে যাওয়া আমরা পছন্দ করি না।"

শৈবলিনী থাকতে পারলেন না, ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "রাখো তোমাদের মাথাদের। যদি সত্যিই ন্যায়বিচার বোলে দেশে কিছু থাকতো তা হোলে কি ঐ নির্দোষ

মেয়েটা আর তার হতভাগ্য বাপমার ওপর এমন অত্যাচার করতে তোমরা সাহস করতে? কক্ষনো না। তার বদলে বরং যে লোকটা সত্যিকার দোষী, যে লোকটা ঐ নিরীহ মেয়েটার এমন সব্বনাশ করেছে তাকেই সাজা দিতে। সে হিম্মৎ, সে সৎসাহস তোমাদের মাথাদের আছে?”

ঘাটসুদ্ধ মেয়েরা একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করতে পারলো না, ঠানদিও না।

শৈবলিনী তাদের সামনে দিয়ে তাদের দেখিয়েই রমানাথ ভটচাযির বাড়ী ঢুকলেন।

হ্যাঁ। তবু যাই হোক শৈবলিনীই আসেন। আপদে বিপদে এত বড় বন্ধু সত্যিই আর হয় না।

সাবিত্রী কাঁদেন আর বলেন, “জানো মাসীমা ওরা আজ আমাদের একঘরে করেছে। কিন্তু ওদের কখনো ভালো ছাড়া মন্দ করিনি।” তিনি আর বলতে পারেন না। অভিমানে দুঃখে ব্যথায় ফোঁপাতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলেন, “এ ক'দিন আবার পাড়ার দুষ্টু ছেলেগুলো কি করছে জানো? যখন তখন এসে বাড়ীর আশেপাশে জটলা করছে, শিস দিচ্ছে, যা-তা গান করছে। কখনো কখনো এমন কি ঢিলপাটকেলও ছুঁড়ছে। শুনলে অবাক হবে দেশের যারা মাথা—ঐ তিনু ঘোষাল, ঐ হরি পোদ্দার, ঠানদি—এরাই ওদের উস্কে দিচ্ছে। মেয়েটা তো ভয়ে জানলাই খোলে না।”

“সবই কানে আসে বৌমা, চোখেও পড়ে সব। ওরা কি মানুষ? কিন্তু তোমার ভেঙে পড়লে চলবে কেন? তুমি শক্ত হও। তুমি যতো ভয় পাবে, যতো ভেঙে পড়বে, ওরা ততো চেপে ধরবে। ওঠ দিকি, রান্নাবান্নায় মন দাও। অমন না খেয়ে খেয়ে ক'দ্দিন সব কাটাবে?”

অনেক পীড়াপীড়ির পর অবশেষে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে সাবিত্রী উঠলেন।

তাঁকে রান্নাঘরে ঠেলে দিয়ে শৈবলিনী এলেন সুমিত্রার ঘরে। তারও সেই অবস্থা। বেচারির মুখের দিকে চাওয়া যায় না, সান্ত্বনাও দেওয়া যায় না, রাতদিন কেঁদে কেঁদে তার চোখমুখ ফুলে গেছে। শৈবলিনীকে পেয়ে সে তাঁর কোলে উপুড় হোয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে।

প্রাসাদের বার-বারান্দায় বোসে অমরেশ একা। পাশে তার শুয়ে ল্যাজ নাড়ছে তার আদরের কুকুর জ্যাক।

সন্ধ্যা নামে গুটি গুটি পায়ে। দূরে মাঠ থেকে গরুগুলো ফিরছে ধুলো উড়িয়ে। পাখীরাও ফিরছে কিচিরমিচির করতে করতে।

এটা কার্তিকের মাঝামাঝি। আর মাত্র মাসখানেক বাকী অমরেশের বিয়ের।

অবশ্য এখন থেকেই বেশ তোড়জোড় সুরু হোয়ে গেছে। দাসদাসীর সংখ্যা রোজই বাড়ছে। আত্মীয়স্বজনও কিছু কিছু আসতে আরম্ভ করেছে।

নিরুপমা তো সকল সময়েই ব্যস্ত। কি ভাবে প্রাসাদ সাজাবেন, উৎসব ক'দিন ধোরে চলবে, কোলকাতা ও বাইরেকার কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করা হবে, কাকে কোন্ জিনিসের ফরমাস দেওয়া হবে, কোথায় নহবৎ বসবে, কোন্ দিন নাচ আর কোন্ দিনই বা থিয়েটার, ইত্যাদি ইত্যাদি হরেক রকম প্রশ্ন নিয়ে তাঁকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। আগেও অবশ্য তিনি অনেক কাজ করেছেন। কিন্তু তখন মাথার ওপর স্বামী ছিলেন, এসব বিষয়ে তিনি ছিলেন পাকা লোক, কাজেই তাঁকে বিশেষ কিছু ভাবতে হয়নি।

স্বামীর কথা মনে হোতেই নিরুপমার চোখে জল আসে। কিন্তু শোক করবার সময় এ নয়। কাজেই চোখের জল মুছে আবার কাজের মধ্যে তিনি ডুবে যান।

ম্যানেজারও ঘুরছেন। তবে তাঁর মনে শান্তি নেই, কাজেও তেমন উৎসাহ নেই, মা ও ছেলে কেবলই তাঁর কাজে দোষ ধরছেন।

সেদিন নায়েব গোমস্তাদের সভায় তিনি নিজেকে রীতিমতোই অপমানিত বোধ করেছেন। চাকরীতে থাকার আর তাঁর ইচ্ছেই নেই। কিন্তু তবুও তিনি ইস্তফা দিতে পারছেন না, কেননা এই বুড়ো বয়সে যাবেন কোথায়? তা ছাড়া সারা জীবন চাকরী কোরে যা কিছু সঞ্চয় করেছিলেন তা তো অমরেশকেই দিয়ে বসে আছেন। ফিরে পাবার আশা তো এখন বহু দূরে।

এবার অমরেশের কথা। তাকে অবশ্য বিশেষ কিছু করতে দেখা যাচ্ছে না। করতে গেলেই মা বাধা দিয়ে বলেন, "তোকে ভাবতে হবে না, তুই বরং জমিদারির দিকটায় নজর রাখ্। মনে রাখিস এখন কিছুদিন এই রকম ঝড়ঝাপটা চলবে, কি প্রজারা আর কি কর্মচারীরা সবাই সুযোগ নেবে। উনি যখন জমিদার হোয়ে বসেছিলেন তখনও ছিল এই রকম, কিন্তু পরে সব ঢিট হোয়ে গিয়েছিল।"

মার কথামতো অমরেশ শুধু জমিদারিই দেখে আর অবসর সময়ে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আড্ডা দেয়।

অবিশ্যি মার সেদিকেও নজর আছে। হঠাৎ একদিন মা শুনলেন তাঁর পুত্র আর এখন রমানাথ ভটচায্যির বাড়ী না গেলেও কে এক নতুন বন্ধুর বাড়ী খুব যাতায়াত শুরু করেছে। খবর নিয়ে তিনি জানলেন বন্ধুটির এক বিধবা বোনের সঙ্গে নাকি তার খুব ভাবও জমেছে। তিনি আবার তাকে আড়ালে ডেকে তিরস্কার করলেন: "তোর কি কিছুতেই জ্ঞান হবে না রে? বিয়েটা ভালোয় ভালোয় হোয়ে যাক না। তারপর যা খুশী করিস। এখন এইসব কথা যদি মেয়ের বাপের কানে যায় আর তিনি যদি বেঁকে বসেন কি হবে তখন বল্‌তো?"

অমরেশ নিজেকে সামলে নেয়। সত্যিই খুব লোকসান হবে। মার কাছে প্রতিজ্ঞা করে বিয়ের আগে আর সে প্রাসাদ ছেড়ে কোথাও যাবে না।

অন্যান্য দিনের মতো আজও সে বারান্দায় বোসে। আশপাশে বোধ হয় মা নেই। তাই আজ তার সামনে মদের বোতল। সে খাচ্ছে আর ভাবছে : এই সেই প্রাসাদ যাকে হাজার হাজার মানুষ ভয় করে, সমীহ করে। এই প্রাসাদের, এই জমিদারির মালিক সে। আর কিছুদিন পরে সে হবে এর চারগুণ সম্পত্তিব অধিকারী। তার কিছুদিন পরেই রাজা।

হঠাৎ তার কানে আসে পায়ের শব্দ। মা আসছেন বোধ হয়। নাঃ, আর পারা যায় না, এক্ষুনি শুরু হবে লেকচার।

তাড়াতাড়ি মদের বোতল ও গেলাস সে সরিয়ে ফেললো।

কিন্তু না, সে ভুল শুনেছে।

তার ভারী বিরক্তি বোধ হোল। আবার সে মদ ঢাললো।

হঠাৎ সুমিত্রার ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে বিচলিত হোয়ে উঠলো। তাদের প্রতি অবিচার করেছে বোলে কি? না। অমন সুন্দরী মেয়েটাকে যদি শেষ পর্যন্ত হারাতে হয়?

সে ভাবে তার স্ত্রী না হোয়েও তো সে তার সঙ্গে সুখে, আরামে, ঐশ্বর্যে থাকতে পারতো। আচ্ছা, দেখা যাক যায় কোথা। কে তাকে নেবে? সমাজে তার ঠাঁই কোথায়? ফের তাকে আসতেই হবে তাব কাছে। সত্যিই মেয়েটার মধ্যে কি দুর্নিবার আকর্ষণ! এর আগে সে আরও মেয়ের সঙ্গে মিশেছে। কিন্তু ওর পাশে দাঁড়াবার মতো যোগ্যতা তাদের কোথায়? নাঃ, ওকে পেতেই হবে। যত ঐশ্বর্যই নিয়ে আসুক তার ঐ কৃষ্ণাঙ্গী বৌ তাকে নিয়ে তার মন ভরতে পারে না।

কিন্তু গলাটা যে কিছুতেই ভিজতে চায় না! আর এক গেলাস মদ সে গলাধঃকরণ করলো।

তার মনে পড়লো তার বাবাও এমনি ভাবে রাজকীয় ভঙ্গীতে বারান্দায় বোসে সুরাপান কবতেন। সেও করছে। সেই একই ধারা।

হঠাৎ আবার যেন পায়ের শব্দ। কুকুরটা ল্যাজ খাড়া কোরে দাঁড়িয়ে উঠলো। তারপরই ছুটে গেল।

আবার সে গেলাস ভর্তি করলো।

গেলাসে চুমুক দিতে যাবে এমন সময়ে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে নায়েব শ্রীকৃষ্ণবাবু।

"আরে, শ্রীকৃষ্ণবাবু যে! কি খবর? বসুন, বসুন।"

"খবর মোটেই ভালো না হুজুর," বসতে বসতে শ্রীকৃষ্ণবাবু বললেন।

"কি রকম?"

"শোনেননি তা হোলে?"

"না।"

"কাল আর একটু হোলে ওরা আমায় শেষ কোরে দিয়েছিল।" ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বাবুর গলা কাঁপছে।

অমরেশ তাঁর দিকে চেয়ে রইলো।

শ্রীকৃষ্ণবাবু বলতে লাগলেন, "কাল হঠাৎ প্রায় হাজার দুয়েক লোক কাছারি চড়াও হোয়ে আমায় এই মারে তো এই মাবে।"

"তারপর?"

"ওঃ সে অবস্থা আপনাকে বোলে বোঝাতে পাববো না হুজুর। সে কি চীৎকার! একজন যেই একদিক থেকে বোলে উঠলো, "দে শালাকে এইখানেই শেষ কোরে," সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে গলা মিলিয়ে বোলে উঠলো, "ঠিক, ঠিক, দে শালাকে খতম কোরে।" আমাব প্রাণ তো ভযে উড়ে গেল। শেষে অনেক কোরে ঐ শচীনন্দন বোলে লোকটাব হাতে পায়ে ধোরে তবে পবিত্রাণ পাই।"

"বটে?"

"হ্যাঁ। অবস্থা হুজুব খুবই ভয়ঙ্কব। বিশ পঁচিশটা লেঠেলের কর্ম নয় যে ঠেকায়। এক্ষুনি অন্য কিছু ব্যবস্থা কবুন, না হোলে দু'একদিনেব মধ্যেই দেখবেন আমার ধড়ে আর মুণ্ডু নেই।"

"এঃ! আপনি দেখছি একটু বেশীই ভড়কে গেছেন।"

"হুজুর, ওখানকার অবস্থাটা স্বচক্ষে না দেখলে বুঝতে পারবেন না। না না হুজুর, আমি ওখানে আব এক দণ্ডও থাকতে পারবো না। দয়া কোবে আমায় না হয় অন্য কোথাও বদলী করুন।"

চুপ কোরে অমরেশ কিছুক্ষণ বোসে বইলো। তারপর বললে, "আচ্ছা দাঁড়ান, দেখছি।"

সে উঠে গেল।

খানিক পরে যখন ফিরলো, তার হাতে একটা বন্দুক। বন্দুকটা সে শ্রীকৃষ্ণ-বাবুর সামনে দাঁড় করিযে বললে, "এই নিন।"

শ্রীকৃষ্ণবাবু বুঝতে না পেবে অবাক হোয়ে তার দিকে চেযে রইলেন।

"কি দেখছেন? এইটেই আপনাকে রক্ষে করবে, নিযে যান।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"আমি যে বন্দুক ছুঁড়তে জানি না হুজুর।"

"সে আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তা ছাড়া আপনাব সঙ্গে আমাদের পুরনো চাকব ঝগড়ুকেও দিচ্ছি। বুড়ো হোলে কি হবে, এখনো ওর হাতের টিপ অব্যর্থ। বাবা ওকে নিজেব হাতে শিখিযে দিযে গেছেন।"

"কিন্তু—"

"আবাব কিন্তু কেন?"

"আমার তো লাইসেন্স নেই।"

"আরে নাই বা রইলো। ধরবে তো পুলিস। পুলিসের বাবারও মুখ বন্ধ কোরে দেওয়া যায় টাকার জোরে। হ্যাঁ, আসুন, দেখুন, এই...এই ..এই.."

সঙ্গে সঙ্গে একটা আওয়াজ হোল, গুড়ুম!

"হোল তো? অনেক সময়ে এই রকম ফাঁকা আওয়াজেও কাজ হোয়ে যায়। জানেন, একবার বাগ্দীদের একটা ছেলেকে আমি চাপা দিযে মেরে ফেলেছিলুম। ওঃ সে কি কাণ্ড! প্রায় তিনচাব শো লোক ক্ষেপে গিয়ে আমার পেছন পেছন তাড়া কোরে একেবারে আমাদেব প্রাসাদে এসে হাজির। তখন বাবা বেঁচে। তিনি কি কবলেন জানেন? স্রেফ গোটাকতক ফাঁকা আওযাজ। ব্যস, তাইতেই লোকগুলো ভয়ে শ্যালকুকুরের মতো পিল পিল কোরে পালিযে গেল। অবিশ্যি গুলী আপনাকে রাখতে হবে, নিদেন অবস্থার জন্যে। কি? কি ভাবছেন? এখন বুকে সাহস আসছে তো?"

শ্রীকৃষ্ণবাবু মৃদু হাসতে লাগলেন। সত্যিই যেন এবার তিনি নিজেকে নিবাপদ বোধ কবছেন।

"তা হোলে নিয়ে যান। বেশ যত্নে বাখবেন কিন্তু। বন্দুকটা আমি এই হালেই কিনেছি, অনেক দাম দিয়ে। শিকাবে যাবো বোলে।"

"তা হোলে তো—"

"শিকাবে যাওয়া আর হচ্ছে কই? আপনাবা প্রজাদেব ঠিক মতো কণ্ট্রোলে বাখতে পাবছেন না বোলে তো আমি জমিদাবি ছেড়ে কোথাও যেতে পারছি না। তা সে যাক, বন্দুক আমার নিজের জন্যেও দবকাব হবে। আমি দু'একদিনেব মধ্যেই আনিযে নিচ্ছি ম্যানটনের বাড়ী থেকে।"

"আজ্ঞে তা হোলেই হোল। কেননা আপনাব নিজেব জন্যেও তো—"

"সে আব বলতে।"

একটু থেমে শ্রীকৃষ্ণবাবু বললেন, "তা হোলে কি ঝগড়ুকে আমার সঙ্গে দেবেন?"

"হ্যাঁ। আমি তাকে ডেকে বোলে দিচ্ছি।"

শ্রীকৃষ্ণবাবু দেখলেন এখন কাছে অন্য কেউ নেই, জমিদারও বেশ খোশ মেজাজেই বযেছেন, এই সময়ে যদি দু'একটা কথা নিজেব কার্যোদ্ধারেব জন্যে বলে নিতে পাবা যায় তো ভালো হয—এমন সুযোগ পাওয়া হযতো আব নাও যেতে পারে।

কিন্তু তাব আগে একটু ঘনিষ্টতা দবকাব। ঘনিষ্ট হওযাব জন্যে সে বললে, "একটা কথা জিগগেস করবো বোলে ভাবছিলুম, হুজুবেব বিয়েব কদ্দুর কি হোল?"

"আর তো মাত্র কয়েকটা দিন।" হাসতে হাসতে অমরেশ বলে।

"তাহলে তো এ সময়টা চারদিক একটু ঠাণ্ডা রাখাই দরকার।"

"সেটা তো আপনাদের ওপরই নির্ভর করছে।"

"আজ্ঞে, তা তো বটেই। তবে দেখতে তো পাচ্ছেন আমি আমার যথাসাধ্য করছি। এর ওপর যদি ঐ ম্যানেজারবাবু একটু সহায় হোতেন—"

"ওঁর কাছে আশা আর আমি করি না। ওঁর মতলব আমি বুঝে নিয়েছি। কেবল পুরোন কর্মচারী, আর 'কাকা' বলি বোলেই এতটা সহ্য করছি। কিন্তু আর নয়। বিয়েটা হোয়ে গেলে ভাবছি ওঁকে বিদেয় কোরে দোব।"

শ্রীকৃষ্ণবাবু এইটেই চাইছিলেন। সুযোগ বুঝে বললেন, "যদি অপরাধ না নেন তো একটা নিবেদন জানাই।"

"হ্যাঁ বলুন।"

"বলছিলুম কি আমিও তো আপনার একজন পুরোন কর্মচারী। আর বরাবর খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গেই কাজ কোরে এসেছি। রাজাসাহেবও আমায় খুব স্নেহ করতেন। তা ছাড়া দেখছেন তো কত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কাজ কোরে চলেছি, কখনো একটু হেলদোল পর্যন্ত করিনি। বলছিলুম কি আমি আপনাকে আরও ভালভাবে সেবা করতে পারতুম যদি আপনি দয়া কোরে ঐ জায়গায়—"

"ও, আচ্ছা, আচ্ছা। আমি নিশ্চয়ই বিবেচনা কোরে দেখবো শ্রীকৃষ্ণবাবু। তবে বিয়ের আগে তো কিছু করছি না। সেটা দেখাবেও না ভাল। তা ছাড়া মার সঙ্গে একটু পরামর্শও করতে হবে। দেখছেন তো মা এখন কত ব্যস্ত। তবে হ্যাঁ, আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি নিশ্চয়ই বিবেচনা কোরে দেখবো।"

"আজ্ঞে তা হোলেই হোল তা হোলেই হোল। আপনার করুণা যখন পেয়েছি তখন আর আমার ভাববার কি আছে? তবে এটুকু আমি জোর গলায় বলতে পারি আমি যদি ম্যানেজার হোয়ে বসতে পারি তা হোলে ঐ যে বললেন প্রজাদের কণ্ট্রোলে রাখা, দেখবেন কোত্থাও একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত হবে না, আপনি চোখকান বুজে ঘুমুতে পারবেন, যখন যেখানে খুশী যেতে পারবেন। এখনই তো দেখুন না যে দু'একটা মৌজা আমার হাতে সেখানে আপনার এক পয়সাও খাজনা বাকী পড়ছে না। খোঁজ নিয়ে দেখুন আর কোনও মৌজায় কিন্তু এরকম—"

হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি জমিদারির দায়িত্ব আপনি ঠিক মতই বহন করতে পারবেন।"

শ্রীকৃষ্ণবাবুর মুখ গর্বে উৎফুল্ল হোয়ে ওঠে।

"কিন্তু দেখুন, তার আগে আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। তা না করতে পারলে কিন্তু আপনি সফল হোতে পারবেন না।"

"কি সেটা? বলুন হুজুর কি এমন কাজ থাকতে পারে যা আমি আপনার জন্যে না করতে পারি?"

"দেখুন, বরাবর দেখে আসছি যত অনর্থের মূল ঐ শচী সামন্তটা। ওটাকে

যদি কোন রকমে সরাতে পারেন তবেই আপনার পক্ষে প্রজাদের শাসনে রাখা সহজ হবে।"

"কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন হুজুর। বিশেষ কোরে সেদিনকার ঘটনাটার পর আমি তা ভালো করেই বুঝতে পেরেছি।"

অমরেশ বলতে লাগলো, "জানেন, বাবার মৃত্যুর পর আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে এ সম্পর্কে জানিয়েছিলুম। তার ফলে তিনি ওকে কিছুদিন জেলে আটকেও রেখেছিলেন। কিন্তু তাতে ওর কিছুই হয়নি। সেদিন ফের আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে এ বিষয়ে লিখি। কিন্তু তিনি জানিয়েছেন কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ না পেলে অনির্দিষ্টকালের জন্যে কাউকে আটকে রাখা আইনত যায় না। কাজেই ভাবছি অন্য কোন উপায়ে যদি—"

বলতে বলতে থেমে গিয়ে অমরেশ শ্রীকৃষ্ণবাবুর মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল।

তাকে খুশী করবার অতি-আগ্রহে শ্রীকৃষ্ণবাবু বললেন, "আজ্ঞে আমিও অনেক সময়ে তাই ভাবি। শয়তানটাকে যদি একেবারে এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পারা যায়—"

"বাঃ, বাঃ, আমরা দুজনেই তা হোলে দেখছি একই ভাবে চিন্তা করি।"

"আজ্ঞে তা হওয়াই তো স্বাভাবিক। আপনার নুন খাই। কাজেই আপনার চিন্তা আর আমার চিন্তা কি দুরকম হোতে পারে?"

"দেখুন শ্রীকৃষ্ণবাবু, আপনার দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে আমি সত্যিই খুব খুশী হয়েছি। আপনার ওপর তা হোলে এ কাজটার ভার দিলুম। যদি হাসিল করতে পারেন জানবেন আপনার কোন ইচ্ছেই আমি অপূর্ণ রাখবো না।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। আমি ভার নিচ্ছি। তবে কথা হচ্ছে এর ফলে যদি কিছু—"

"কিছু ভয় নেই আমি যখন রয়েছি।"

"ব্যস, আর কিছু বলতে হবে না হুজুর। কাজ হাসিল কোরে তবে আবার আমি আপনার সঙ্গে দেখা করবো।"

"কিন্তু আজ আর আপনার জগদ্বল্লভপুরে যাওয়া চলবে না, পথে সন্ধে হোয়ে যাবে। আজ এখানেই থাকুন, কাল সকালে ঝগড়ুকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।"

"যে আজ্ঞে হুজুর। ওঃ কর্মচারীদের ভালোমন্দের ওপর এমন নজর রাখতে আর কোন জমিদারকে কখনো দেখিনি। ভগবান আপনার, কিন্তু ও কি! ফটকের বাইরে অত ধুলো উড়ছে কেন? একি! এ যে কেবল গাড়ী গাড়ী কাঠ! এত কাঠ কি জন্যে?"

"এটা আর বুঝতে পারছেন না? ভোজ হবে যে।"

"ও। তা এত কাঠ!"

"হা হা হাঁ। সারা জমিদারির লোক যে খাবে।"

"তা বটে, তা বটে। আচ্ছা, এ কাঠ কোত্থেকে আনাচ্ছেন?"

"ও মার ব্যাপার। আমার বিয়ে বটে, কিন্তু মাই যা কিছু করছেন, আমার আর মাথা গলাবার দরকার হচ্ছে না।"

তারপর একটু থেমে মদের বোতলের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে অমরেশ বললে, "আচ্ছা, তা হোলে—"

"হ্যাঁ যখন রইলুমই আমি বরং একবার কাছারিতেই যাই, কিছু হিসেব-পত্তরের কাজ আছে।"

"তা ছাড়া একদিন তো ম্যানেজারের গুরু দায়িত্ব নিয়ে ঐখানেই বসবেন।"

"সে তো আপনারই অনুগ্রহ হুজুর।"

শ্রীকৃষ্ণবাবু এসেছিলেন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। এখন আনন্দে নাচতে নাচতে চলে গেলেন।

অনেক দিন ধোরেই রমানাথ ভাবছেন একদিন শচীনন্দনের সঙ্গে দেখা কোরে সমস্ত বিষয় তাকে জানাবেন - যদি তার দ্বারা কোন সাহায্য হয়। কিন্তু কিছুতেই আর গিয়ে উঠতে পারছেন না। একে তো অনেক দিনই যোগাযোগ নেই, তার ওপর আবার মাথায় এই কলঙ্কের বোঝা। কি কোরে তার সামনে দাঁড়াবেন? হায়, কপালে এও ছিল! আহার জুটছিল না সে বরং ছিল ভালো। কিন্তু এ কি হোল? বোকা মেয়েটা শেষ পর্যন্ত এ কি কোরে বসলো?

কিন্তু নিরীহ মেয়েটাকে দোষ দিয়েই বা কি হবে। দেখতে গেলে সব দোষ তো তাঁরই। তিনিই তো ঐ কালসাপটাকে তাঁর ঘরে অবাধে ঘুরে বেড়াতে সুযোগ দিয়েছিলেন।

এখন তাঁর সবচেয়ে ভাবনা মেয়েটার জন্যে। তাঁদের স্বামীস্ত্রীর যা হবার তা তো হোয়েই গেল, ক'দিনই বা আর, কিন্ত মেয়েটার কি হবে?

অবশেষে রমানাথ আর থাকতে পারলেন না। 'নারায়ণ! নারায়ণ!' বলতে বলতে একদিন বেরিয়ে পড়লেন শচীনন্দনের কাছে যাবার জন্যে।

শচীনন্দন যে এখন তার মামার বাড়ী জগদ্বল্লভপুরেই থাকে তা তাঁর জানা ছিল। তিনি এও শুনেছিলেন যে সেখানে বোসে সে এখন দশের জন্যে খুব কাজ করছে।

শ্রান্ত দেহে শচীনন্দনের বাসায় পৌঁছে রমানাথ শুনলেন সে কোথায় বেরিয়ে গেছে, ফিরতে দেরী হবে। রমানাথ বোসে রইলেন। দেখা না কোরে তিনি ফিরবেন না। আবার কবে এতদূর পথ ভেঙে আসতে পারবেন তার ঠিক কি? তা ছাড়া সেদিনও যে শচীনন্দনের দেখা মিলবে তারই বা কি নিশ্চয়তা? যা ব্যস্ত ও সকল সময়ে থাকে।

পড়ন্ত রোদ্দুরে মুখ রাঙা কোরে অবশেষে শচীনন্দন ফিরলো, তাকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

রমানাথকে দেখেই শচীনন্দন আনন্দে চীৎকার কোরে উঠলো, "আরে রমানাথদা যে! কি খবর?"

"এই এলুম ভাই, একটু বিশেষ বিপদে পড়ে।"

"বিপদ! কেন? কি হোল?"

"বলছি। তার আগে তুমি একটু বোস, জিরোও, তোমাকে বড্ড—'

"ও আমার গা-সওয়া রমানাথদা। আবার একটু পরেই দেখবে আমায় বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। আচ্ছা দাঁড়াও, আগে তোমার জন্যে একটু তামাক নিয়ে আসি। ওঃ, কদ্দিন পরে দেখা! আছো কেমন?"

তামাক খেতে খেতে রমানাথ সাশ্রুনয়নে শচীনন্দনকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বললেন।

শচীনন্দন চঞ্চল হোয়ে উঠলো "ইস্! এ তো তোমারই আহাম্মকির জন্যে হয়েছে রমানাথদা! তুমি কোন্ আক্কেলে ঐ শয়তানটাকে এতোটা বিশ্বাস কোরে বসলে? নিশ্চয়ই লোভে পড়েই তুমি এ কাজ করেছ।"

"তুমিও ঐ কথা বলবে শচীনন্দন?"

"তা ছাড়া আর কি বলবো? জেনেশুনেও কেউ এমন কাজ করে?"

রমানাথের অবস্থা দেখে অবশেষে শচীনন্দনের মায়া হয়। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলে, "আচ্ছা আমায় একটু সময় দাও, ভেবে দেখি কি করা যায়। তবে তোমায় আর কষ্ট কোরে এতদূর আসতে হবে না আমিই গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করছি।'

রমানাথ উঠলেন। শচীনন্দন তাঁকে রাত্রিটা থেকে যাবার জন্যে অনুরোধ করলো। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। বাড়ীতে স্ত্রী ও মেয়ে কি কোরে একলাটি থাকবে?

লাঠিতে ভর দিয়ে অন্ধকার মাঠের ওপর দিয়ে লম্বা শীর্ণ পাদুটি ফেলতে ফেলতে রমানাথ চলতে লাগলেন।

হঠাৎ এদিককার চাষীরা একদিন শুনতে পেল কাছারির দিক থেকে বন্দুকের মতো কিসের যেন আওয়াজ আসছে। রাত তখন আটটা-সাড়েআটটা হবে। কুতূহলী হোয়ে অনেকেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল।

অশথতলাটায় তারা জটলা করে আর শোনে। কেউ কেউ আবার সঠিক হবার জন্যে কাছারিবাড়ীর দিকে ছুটলো।

হ্যাঁ, বন্দুকেরই আওয়াজ। দ্বারিক বেরা, মহীউদ্দিন মিঞা, জাবেদ আলী,

সতীনাথ সামন্ত এবং আরও অনেকে নিজেদের চোখে দেখে এলো শ্রীকৃষ্ণবাবুকে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।

সকলেই বুঝতে পারে কেন হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণবাবুর বন্দুকের প্রয়োজন হোয়ে পড়লো। তারা হাসে, নায়েব তথা জমিদারের উদ্দেশ্যে নানারকম টিটকিরিবিদ্রূপ করে।

সে রাত্রে শচীনন্দন জগদ্বল্লভপুর ছিল না, বাইরে কোন্ কাজে যেন গিয়েছিল।

ফিরে এসে সে সঙ্গীদের কাছ থেকে সব শুনলো। হাসতে হাসতে বৃদ্ধ মণ্ডলের দিকে চেয়ে বললে, "বন্দুকের আওযাজ তোমারও কানে গিয়েছিল নাকি মণ্ডলকাকা?"

"গাছপাথলও শুনেছে। আমি তো কোন ছার।"

"উদ্দেশ্য কি বলতে পাবো?"

"আ! তা বোঝ না? অর্থাৎ কি, এবার যদি কারও ওপর অত্যাচার হয় আর আমরা যদি আবার সেদিনকাব মতো কাছারিবাড়ী চড়াও হই তা হোলে আমাদের গুলী কবা হবে।"

'হা হা হা' শচীনন্দন হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়লো অনেক-দিন আগেকার এমনি এক ঘটনাব কথা। ব্যথায রাগে তাব মুখখানা কালো হোয়ে উঠলো। বললে, "জানো মণ্ডলকাকা? কয়েক বছর আগে তোমাদের এই বর্তমান জমিদাব বাগ্দীদের একটা ছেলেকে মোটর চাপা দিযে মেরে ফেলেছিল।"

"বটে! বটে!"

"বাগ্দীরা তো ক্ষেপে আগুন। তারা পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে একেবারে রাজবাড়ীতে এসে হাজিব।"

"তারপর?"

"তখন ওর বাপ বাজা নিখিলেশ রায বেঁচে। নিখিলেশ বায় কি করলে জানো? বন্দুকের আওযাজ কবতে কবতে বললে 'এই কুকুবগুলো তোবা যদি এক্ষুনি না চলে যাস তোদেব গুলী কোবে মাথাব খুলি উড়িযে দোব।"

"উঃ! কি নিষ্ঠুব!" একসঙ্গে অনেকে বোলে উঠলো।

হঠাৎ শচীনন্দন অন্যমনস্ক হোয়ে কি যেন ভাবে। তারপব বলে, "কিন্তু চিরকাল কি ওবা বন্দুকেব ভয় দেখিযেই আমাদেব এভাবে শিযালকুকুরেব মতো দাবিয়ে বাখবে?"

"শচীকাকা!" হঠাৎ কে যেন ডাকলো।

"কিরে গুরুপদ?"

"তুমি যদি একবারটি হুকুম দ্যাও, আমি ও শালাদের কাছ থেকে বন্দুকটা বার কোরে নে আসি।"

"এই রে! শোন কথা। শেষে ছেলেটা না একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে।"

"তুমি দেখো আমি এমন ভাবে কাজ করবো যে—"

মোড়ল ধমকে ওঠে, "সে ক্ষ্যামোতা থাকে তো যা না বাপু, বার কোরে নে আয়, শুধু শুধু দর বাড়াচ্ছিস কেন? বলে, মনসা চিন্তিতং কম্ম বচসা ন পোকাশয়েৎ।"

উত্তেজিত মোড়লের ফোকলা উচ্চারণগুলো ভারী অদ্ভুত শোনাচ্ছিল। কিন্তু ছেলে বুড়ো সকলেই বেশ শ্রদ্ধার সহিতই শুনলো।

কিছুক্ষণ পরে তারা চলে গেল। এইবার অবকাশ পেয়ে শচীনন্দন কাগজ-কলম নিয়ে বসলো। তাকে আজ একখানা চিঠি লিখতেই হবে—ভুকৈলাসের জমিদার সিদ্ধার্থ হালদারকে।

কি সে লিখবে তা একরকম ঠিক হোয়েই আছে। এ ক'দিন সে কেবলই এ সম্বন্ধে ভেবেছে।

সে স্থির করেছে অমরেশের ভাবী শ্বশুরকে সমস্ত বিষয় জানাবে। তাঁকে সে অনুরোধ করবে যেন তিনি অবস্থাটা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করেন, যেন তিনি তা বিবেচনা কোরে অমরেশের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে না দিয়ে বরং যাতে অমরেশ রমানাথ ভটচায্যির মেয়েকেই বিয়ে করে সেজন্যেই চেষ্টা করেন।

উপসংহারে সে লিখলো, "আমার কথা আপনাকে বিশ্বাস করতে বলছি না। আপনি নিজে দয়া কোরে অনুসন্ধান কোরে দেখুন। দেখুন কিভাবে একটা মেয়ের সরলতার সুযোগ নিয়ে তার সর্বনাশ করা হচ্ছে। আপনি জ্ঞানী, প্রবীণ। আশা করি এতো বড় একটা পাপ সমাজে অনুষ্ঠিত হোতে দেবেন না।"

চিঠিখানা সে নিজে গিয়ে পোস্টঅফিসে দিয়ে এলো।

একে মেয়ের জন্যে দুশ্চিন্তা, তার ওপর আবার পাড়াপড়শীর লাঞ্ছনা। রমানাথ বড্ডই কাতর হোয়ে পড়েছেন। যেদিকেই চান কোথাও আর কোন আশা-ভরসা নেই। এই ক'দিনে তাঁর বয়স যেন আরও দশ বছর বেড়ে গেছে, হঠাৎ তিনি যেন আরও বুড়ো হোয়ে পড়েছেন।

সাবিত্রীর অবস্থাও তাই। তাঁকে দেখলে তো চিনতেই পারা যাবে না।

স্বামীস্ত্রীতে এখন কেবলই ভগবানকে ডাকেন আর চোখের জল ফেলেন।

হঠাৎ একদিন হোল কি দাওয়ায় উঠতে গিয়ে রমানাথ গেলেন পড়ে। মা ও মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে কোনরকমে তাঁকে ধরাধরি কোরে বিছানায় এনে শুইয়ে দিলে।

বৃদ্ধ কাতরাতে লাগলেন। সন্ধ্যার দিকে তাঁর জ্বর দেখা দিল।

একদিন যায়, ক্রমে এক সপ্তাহও যায়, জ্বর আর ছাড়ে না। কাল থেকে আবার এক নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে—রমানাথ ভুল বকতে সুরু করেছেন।

ভয় পেয়ে সাবিত্রী ছুটলেন শৈবলিনীর কাছে। শৈবলিনী গেলেন কবিরাজের বাড়ি।

কবিরাজ কিন্তু আসতে চান না, বলেন "গাঁসুদ্ধ লোক যখন একঘরে কোরে দিয়েছে, কেমন কোরে যাই ?"

"শৈবলিনী তো আগুন . "অ্যাঁ? কি কোরে এ কথা বললে তুমি কবরেজ, ধোপা নাপিত না হয় বন্ধ করতে পারো। কিন্তু তা বোলে চিকিৎসে বন্ধ! তোমাদের চামড়ার নীচে কি মনুষ্যত্ব বোলে কিছু নেই ?"

কবিরাজ আর 'না' করতে পারেন না। অগত্যা শৈবলিনীর পিছু পিছু এলেন রমানাথকে দেখতে।

অনেকক্ষণ ধোরে বেশ যত্ন কোরেই কিন্তু তিনি রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করলেন, তারপর বললেন, "আশা খুবই কম।" তারপর ওষুধের ব্যবস্থা দিয়ে চলে গেলেন

কাজ হোল কিন্তু। অবস্থা একটু ভালোর দিকেই গেল।

একদিন কি জানি কি মনে কোরে হুঁকোহাতে রাধু চক্রবর্তী এলেন দেখতে রমানাথের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তামাক খেতে খেতে তিনি বললেন, "একসঙ্গে সেই ছেলেবেলা থেকেই কাটিয়ে এলুম রমানাথ। এখন শেষ বয়সে যে তোমার এ দুর্গতি দেখবো তা স্বপ্নেও ভাবিনি। কি মেয়েকেই যে জন্ম দিয়েছ!"

রমানাথের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

রাধু চক্রবর্তী বলতে লাগলেন, 'যাক্, যা হবার হোয়ে গেছে। এখন এক কাজ করো—মেয়েটাকে বিদেয় কোরে দাও। সেদিন হরি পোদ্দার, নিতাই মোড়ল তিনু ঘোষাল ওরাও এই কথা বলছিল। তোমার কাছেও এজন্যে চিঠি আসবে।'

রমানাথ ফ্যালফ্যাল কোরে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"কি জানো তোমার ওপর তো কারও রাগ নেই। তোমাকে আবার আমরা সমাজে তুলে নিতে পারি। কিন্তু এতো বড় একটা অনাচার কেমন কোরে বরদাস্ত করা যায় বলো ?"

সুমিত্রা দূরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। তার মাথা ঝিমঝিম কোরে উঠলো। কোনরকমে টলতে টলতে এসে সে নিজের ঘরে ঢুকলো। তারপর ভেঙে পড়লো কান্নায়।

"ছেলেটা গলা লেগে মরে যাবে যে লো! শুনতে পাচ্ছিস না ?" বলতে বলতে ছুটে এসে শৈবলিনী সুমিত্রার ক্রন্দনরত শিশুটিকে বুকে তুলে নিলেন।

সুমিত্রা নিজের কান্নায় এতোই বিভোর যে ছেলের কান্না শুনতেই পাচ্ছিল না। শৈবলিনীকে ঝড়ের মতো ঢুকতে দেখে সে শুধু ফ্যালফেলিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

"তুই কি পাগল হবি, না মারা যাবি কেঁদে কেঁদে?" বলতে বলতে খানিকটা মধু আঙুলে তুলে নিয়ে শৈবলিনী শিশুর মুখে দিলেন। শিশু চুপ করলো।

তাকে নিয়ে এবার শৈবলিনী সুমিত্রার পাশে এসে বসলেন। বেচারির মুখের দিকে চাইতে যাবেন কি সে মুখে চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

শৈবলিনীর মুখে আর কথা যোগালো না। আঙুলে আর একটু মধু নিয়ে তিনি খোকার মুখে ধরলেন তারপর বাঁ হাত দিয়ে আস্তে আস্তে সুমিত্রার উস্কো-খুস্কো চুলগুলি আঁচড়ে দিতে লাগলেন।

"ঠাকুমা! এতোতেও কি তোমার আমার ওপর ঘেন্না আসছে না?" কাঁদতে কাঁদতে সুমিত্রা বলে।

শৈবলিনীর চোখ জলে ভরে ওঠে। মনের কোন্ অবস্থায় যে মানুষের মুখ দিয়ে এমন কথা বেরোয় তা তিনি খুবই বুঝতে পারেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে শৈবলিনী বললেন, "ঘেন্না! নাতনীর ওপর ঘেন্না! কি তুই আজকাল বলতে সুরু করেছিস বল্ দিকি?"

"কিন্তু সবাই যে আমায় ঘেন্নাই করে ঠাকুমা। বাধুকাকা তো এই মাত্তর বলে গেলেন বাবার কাছে নাকি চিঠি আসবে আমায় বিদেয় কোরে দিতে।"

"ওদের মুখে ছাই পড়ুক। তাই বোলে ওদের সঙ্গে তুই তোর শৈব ঠাকুমাকেও জড়াবি?"

"ভুল হয়েছে ঠাকুমা। কিন্তু কি জানো? মনে হয় এবার বুঝি তুমিও আমায় ঘেন্না করতে শুরু করবে। আর যে আমি এ অবস্থা সহ্য করতে পারছি না ঠাকুমা, এর চেয়ে আমার মরণই ছিল ভালো।"

আবার সে অঝোরে কাঁদতে থাকে।

"ছিঃ অমন কথা মুখে আনতে নেই। ফের যদি ও কথা বলবি আমি তা হোলে আর আসবো না।"

হাত দিয়ে তাঁর কোমরটা জড়িয়ে ধোরে আবেগ ভরে সুমিত্রা বোলে উঠলো, "না না ঠাকুমা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি রাগ কোর না। তুমি না এলে আমি পাগল হোয়ে যাব।"

কিছুক্ষণ সে চুপ থাকে। তারপরে আবার বলে "আগে, আগে যখন ঠাকুমা তুমি মিত্রা বোলে ডাকতে বেশ লাগতো। কিন্তু এখন যখন ঐ বোলে ডাকো, কি রকম যেন মনে হয়—মনে হয় আমি যেন আর সে মিত্রা নই। মনে হয় বুঝি তুমি আর কাউকে ডাকছো। সাড়া দিতে গিয়ে ভয় হয়, সাড়া দিতে পারি না।"

শৈবলিনী আর সহ্য করতে পারেন না। তাঁর চোখ দিয়ে টসটস কোরে জল গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কিই বা করতে পারেন তিনি? শুধু অসহায়ভাবে বোসে তার মাথায়, পিঠে, বুকে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন।

হঠাৎ সুমিত্রা উঠে বসে, তার চোখে এখন আর জল নেই, বলে, "আচ্ছা ঠাকুমা, বলতে পারো সত্যিই কি যা হয়েছে তার জন্যে আমিই দায়ী?"

"না দিদি, এতটুকুও না।"

"তবে? তবে কেন—"

শৈবলিনী উষ্ণ হোয়ে ওঠেন "তা আব এতদিনে বুঝলি না? ওরা যে সবলের পা চাটে আর দুর্বলের মাথায় মারে লাথি। ওদেব যত আস্ফালন অক্ষমদেব ওপর—তাদের হুংকোনাপিত ওরা বন্ধ বোবে দিতে পারে। কিন্তু যে পশুটা একটা নিরীহ মেয়ের ওপর এতো বড অত্যাচাব কবলো তাকে গিয়ে কেউ একবার বলতে পারলো না এতো বড় অন্যায তুমি কবতে পাববে না। কেন? সে শক্তিমান বোলে! দেশে কি মানুষ আছে?"

সুমিত্রারও তাই মনে হয। সে গুম হোযে কি যেন ভাবে। খানিক পরে বলে, "তা হোলে কি এর কোন প্রতীকাব নেই ঠাকুমা?"

"প্রতিকাব! হ্যাঁ আছে। এক যদি ভগবান মুখ তুলে চান দিদি।"

সুমিত্রা আবার কি ভাবে তারপর বলে, "দেখ ঠাকুমা, আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো? মনে হয় হযতো একদিন ওঁর অন্তর টলবে, হয়তো একদিন এসে উনি আবার আমাদের মুখ রক্ষে করবেন, ঠিক যেমন সেবাব করেছিলেন যখন জিনিস-পত্তব কোরক কবতে পেযদা এসেছিল।"

শৈবলিনী অবাক হোযে তাব মুখেব দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর অন্তর সহানুভূতিতে ভবে উঠলো।

"সত্যিই তোর মনে হয় দিদি?"

সুমিত্রাব চোখ জ্বলজ্বলে হোয়ে ওঠে। "হ্যাঁ ঠাকুমা," সে বলে।

"ভগবান তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন দিদি। তাই যেন হয়।"

দুজনেরই বুক আশায় দুলতে থাকে।

সন্ধ্যাব অন্ধকাব ঘবে নেমে এসেছে। পাশাপাশি বোসে শৈবলিনী ও সুমিত্রা। শৈবলিনীব কোলে সুমিত্রার অবৈধ শিশু।

নিঃশ্বাসের আওযাজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎ সুমিত্রা বলে, "আচ্ছা ঠাকুমা, জমিদারের সঙ্গে আমি নিজে গিয়ে একবার দেখা করবো?

"যাবি দিদি? তাই বরং যা। যদিও রাজবাড়ীতে এখন খুব ধুম, লোকেরও খুব ভিড, তা হোক, একবাব ববং দেখা কর্ সেবাবেব মতো। হয়তো ওর মন ঘুরতে পারে। ঠিকই বলেছিস, সেবারেও তো তাই হযেছিল।"

কিছুক্ষণ থেমে শৈবলিনী আবার বলতে থাকেন, "শুনেছি নাকি এ বিয়েতে জমিদারের মত নেই, ওর মাব চাপেই নাকি ও রাজী হয়েছে।"

হঠাৎ সুমিত্রা কেঁদে ওঠে, "ঠাকুমা তোমার যে কত আশা ছিল আমি রাজরানী হবো, আর তুমি আমার কাছে গিয়ে আদরে যত্নে থাকবে। ঠাকুমা, তার জায়গায় এ কি হোল? বাবাকে সকলে একঘরে কোরে দিয়েছে, আমাকেও দেশ থেকে বার কোরে দেবে বোলে তৈরী হচ্ছে।"

শৈবলিনী কি বোলে যে সান্ত্বনা দেবেন খুঁজে পান না। কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "কাঁদিসনি দিদি। মাথার ওপর ভগবান আছেন। এত বড পাপ তিনি কক্ষনো হোতে দেবেন না।"

সুমিত্রা শান্ত হয়, আবার কাঁদে, আবাব শৈবলিনীব সান্ত্বনা পেয়ে শান্ত হয়।

রাজবাড়ীতে সত্যিই ধুমধামের অন্ত নেই। পাখানেকেব ওপর মিস্ত্রি লেগেছে প্রাসাদের চারদিকে। একদল চুনকাম কবছে, একদল দরজাজানলায রং দিচ্ছে। অনেকদিনের পড়ে থাকা অসম্পূর্ণ অতিথিভবনটাতেও হাত পড়েছে, সেখানেও খাটছে জন পঁচিশের মতো লোক। তা ছাড়া পুরনো ফটকটা ফেলে দিযে সেখানে আধুনিক ডিজাইনের একটা গেট বসছে। এবাব ফটকেব বাইবেকার রাস্তাটা। সেটাকে আবও প্রশস্ত করা হচ্ছে। ভেতরে বাগানেব রাস্তাগুলিও কি উপেক্ষিত হোতে পাবে? সেখানে তাই পড়ছে লাল কাঁকর। বলা বাহুল্য এসব কাজেও লেগেছে কিছু কিছু লোক।

ওদিকে আবাব ব্যবসাদারদেরও আনাগোনাব বিবাম নেই। আসছে মুদী, ময়রা; আসছে ডেকরেটব স্বর্ণকার, কাপড়ওলা, সানাইওলা প্রভৃতি।

এই সঙ্গে আবাব আসছে নাপিত, পুরোহিত, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন। নতুন নতুন দাসদাসীও নিযুক্ত হচ্ছে বোজ দু'তিন ডজন কোরে।

নিবুপমা দেবীকে সত্যিই বাহাদুরি দিতে হয়। এই তিনি কারও কাজের তদারক করছেন, এই কাউকে ফরমাশ করছেন, এই আবার তাঁকেই অভ্যাগত ও আত্মীযস্বজনদেব অভ্যর্থনা কবতে হচ্ছে। তিনি নিজেও সময়ে সময়ে অবাক হোয়ে ভাবেন এতো কাজ করবার শক্তি তাঁর এলো কোথা থেকে?

সত্যিই আজ তাঁর কতো আনন্দ। ভূকৈলাসের সঙ্গে কুটুম্বিতা—এ যে তাঁর কতোদিনের সাধ!

হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে তাঁর ভাবী পুত্রবধূ দেখতে ভালো না। কিন্তু তাতে কি? সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যে ও মেয়ে। সঙ্গে কোবে নিযে আসছে রাজৈশ্বর্য। ছেলেটাকে তো বলতে হয় নেহাত আহাম্মক তাই এতদিন রাজী হচ্ছিল না। যাক, এখন যে ওর মতিগতি ফিরেছে এ মস্ত সৌভাগ্য। ওঃ যা বেঁকে বসেছিল!

হ্যাঁ, ছেলেটা সত্যিই বোকা। সংসার সম্বন্ধে কিচ্ছুই বোঝে না। তা না হোলে প্রফেসরের ঐ মেয়েটার সঙ্গে অমন কাণ্ড বাঁধিযে বসে! লাটসাহেবের মেয়েকেই বা কে উপহার দিতে গিয়ে মোজা বাঁধা দেয়? শুধু তাই? যে কর্মচারী কিনা

তাদেরই নুন খেয়ে তাদেরই সর্বনাশ করলো তারই মেয়ের সঙ্গে এতটা মাখামাখি। তাকে আবার মাসোহারা দেওয়া! বড্ড, বড্ড ছেলেমানুষ! যাক্, এখন...

কিন্তু তাঁর চোখটা এমন নাচে কেন? চোখ নাচাটা তো ভালো না! মানে মানে কাজটা হোয়ে গেলে. .ওকি! ওখানে বারাণ্ডায় অমু অমন চুপচাপ বসে কেন?

মার গলা পেয়ে অমরেশ তাড়াতাড়ি মদের বোতলটা থামের আড়ালে সরিয়ে রাখে।

"ওমা! এমন মুখ শুকনো কোরে একলাটি বসে আছিস কেন? বন্ধুরা সব গেল কোথা?"

"ওরা যারা আসে তারা তো মা ঠিক বন্ধু না।"

"তা জানি বাবা। বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। তবে কিনা মেলামেশা তো চাই, কাজেই মানুষও চাই।"

"হ্যাঁ। আর তার জন্যে দামও দিতে হয বেশ। ওরা যারা আসে তাদের মুখে কেবলই শুনতে পাবে 'দেহি, দেহি।'

"সেই জন্যেই তো তোর বাবা বেশী মেলামেশা পছন্দ করতেন না। তুই দেখছি অনেকটা তাঁর মতনই হোয়ে উঠছিস। তা একদিক থেকে ভালো।"

অমরেশ হাসে।

নিরুপমার চোখটা আবার নাচতে থাকে। তিনি চঞ্চল হোয়ে ওঠেন। নাঃ, এ তো ভালো না।

দুপুরে স্যাকরার কাছে শোনা সেই খবরটা হঠাৎ মনে পড়ে যায। সেটা তখন সে আরেকজনের কাছে শুনেছে বলায় তিনি সেটায় তেমন গুরুত্ব দেননি।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মা প্রশ্ন করেন, "হ্যাঁরে? শুনিছ নাকি তিন নম্বর মৌজায বড্ড গোলমাল? প্রজারা নাকি ক্ষেপে গিয়ে জগদ্বল্লভপুরের কাছারি ঘেরাও করেছিল? কই, তুই তো কিছু বলিসনি আমায?"

"হ্যাঁ মা। তবে ভয় নেই, আর যাতে না ক্ষেপতে পারে তার ব্যবস্থাও করেছি। কিছু করেছি, আরও কিছু করবো বোলে তোড়জোড় করছি।"

"কি করেছিস?"

"এক নম্বর শ্রীকেষ্টবাবুর হাতে বন্দুক দিয়েছি। দু' নম্বর . ঝগড়ুকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়েছি। এবার যদি ক্ষেপা কুকুরগুলো ঐরকম কিছু করে তো জেনে রাখো নির্ঘাত দু'দশটা মরবে।"

নিরুপমা আরও উদ্বিগ্ন হোয়ে ওঠেন "শ্রীকেষ্টবাবুকে বন্দুক দিয়েছিস! তা হোলে তোর নিজের কাছে কি রাখলি?"

"রাখিনি, তবে অর্ডার দিয়েছি, হপ্তাখানেকের মধ্যেই এসে পড়বে।"

"তা হোলেই হোল। দিনকাল ক্রমে যা হোয়ে উঠছে, শুধুহাতে থাকা আর

নিরাপদ নয়। মনে আছে সেবারের কথা? বন্দুক ছিল বোলেই তো রক্ষে পেয়েছিলি। যাক্, এখন আর কি করেছিস বল্।"

"কববো বলে ম্যানেজারকাকাকে ডেকে পাঠিয়েছি। ঐ যে ম্যানেজাবকাকা আসছেন। বোস না।"

কযেক সেকেণ্ডের মধ্যেই ম্যানেজাব উপস্থিত হলেন।

"আমাকে কি বাবাজী—"

"হ্যা, আপনাকে ডেকেছিলুম। বসুন।"

ম্যানেজাব বসলেন।

"বলছিলুম কি, আমি ঠিক কবেছি এবাব থেকে কংসাবতীব জল আব তিন নম্বব মৌজার প্রজাদের দেওযা হবে না। আপনি ঢোলশহবত কোবে ওদেব জানিযে দিন।"

ম্যানেজাব সবিস্মযে তাব মুখেব দিকে চেযে বইলেন।

"কি ভাবছেন? ভেবে দেখুন সেদিনকাব কথা। আব একটু হোলে তো ওবা শ্রীকেষ্টবাবুকে শেষ কোবেই ফেলেছিল। এতো বাড়! না না আব না। এক্ষুনি, এক্ষুনি ঐ কুকুবগুলোকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে আব কোনদিন না ওবা ঘাড় তুলতে সাহস করে।"

"কিন্তু এতে যে আমাদেবও লোকসান হবে বাবাজী। একে তো এমনিতেই খাজনা দিতে চায না, তাব ওপব আবাব জল বন্ধ কবলে চাষেব ক্ষতি হয়েছে বোলে আবও জো পাবে।"

"কি? জো পাবে? পিঠেব চামড়া তা হোলে তুলে নোব না! আসল কথা কি ম্যানেজাবকাকা, আপনাদেব এই দুর্বলতাব জন্যেই ওবা আজ এতোটা বাড় বেড়েছে।"

নিবুপমাও যোগ দিলেন "কথাটা অমবেশ ভুল বলেনি ম্যানেজাববাবু। কড়া না হোলে কি জমিদাবি বাখা যায়? এই দেখুন না যদ্দিন উনি ছিলেন প্রজাবা একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত কবতে সাহস কবেনি। কিন্তু তাবপব যেই উনি গত গত হলেন ব্যস তখন থেকেই কেবল গণ্ডগোল আব গণ্ডগোল। ওবা দেখছে নতুন জমিদাব ছেলেমানুষ, আপনিও কিছু বলেন না। ফলে এতটা বেপবোযা।"

"তুমি ভেবো না মা, আমি ওদের শীগগিবই ঠাণ্ডা কোবে আনছি।"

"না বাবাজী, ওভাবে ঠাণ্ডা কবতে যেও না। ওতে ফল খাবাপই হবে। একদিন বাজাসাহেবেব নির্দেশে আমিও অত্যাচাব বড় কম কবিনি। কিন্তু পবে দেখলুম ও পথ ঠিক না—ওতে প্রজাবা ববাববের মতোই শত্রু হোযে যায। প্রথম প্রথম সহ্য কবে বটে কিন্তু তাবপব এমন বেঁকে বসে যে আব বাগে আনা যায না। এখনকাব অবস্থাটা হযেছে বোধ হয ঠিক এই কাবণেই।"

নিরুপমা উষ্ণ হোয়ে ওঠেন : "তা হোলে কি আপনি বলতে চান ওদের মাথায় কোরে রাখতে হবে?"

"আজ্ঞে না, তা কেন? আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই পায়ে দলা আর উচিত হবে না, তার চেয়ে বরং গায়ে হাত বুলিয়ে—"

"দেখুন ম্যানেজারবাবু, জমিদারি কি কোরে চালাতে হয় আমায় আপনার কাছে শিক্ষা করতে হবে না। আমরা কিছু হঠাৎ জমিদার হইনি। জমিদারি চালাচ্ছি আজ কয়েক পুরুষ ধোরে।"

"আজ্ঞে যদি বেয়াদপি কোরে থাকি মাপ করবেন। তবে জানবেন ভালোর জন্যেই বলছি। কি জানেন? দিনকাল তো আর এখন আগেকার মতো নেই; অনেক বদলেছে। লোকের চোখও এখন খুলেছে। এই দেখুন না কয়েক বছর আগেও কেউ কি শুনেছে চাষীরা জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই বোলে দল বেঁধে চিৎকার করছে?"

নিরুপমা আর সহ্য করতে পারেন না। আরও উষ্ণ হোয়ে উঠে বললেন "ওসব কথা রেখে দিন। কলকাতার কতকগুলো চালচুলোহীন নেতা ঐরকম বলাচ্ছে বোলেই ওরা বলছে। কিন্তু তাই বোলে কি আপনি বলতে চান আমরা সেই ভয়ে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে গিয়ে রাস্তায় বসবো? আপনি কি ওদের দলে যোগ দিয়েছেন নাকি? আপনার মতলব কি বলুন তো?"

"দেখুন রানীসাহেবা, এতকাল আপনাদেরই নুন খেয়ে এসেছি। আপনাদের ক্ষতি করা আমার মতলব না। ওদের দলেও আমি যোগ দিইনি। তবে কিনা পাছে একটা কিছু হয়—"

"কেন? কেন? দেশে কি অরাজকতা এসে গেছে? আইন নেই? পুলিস নেই? সরকার নেই?"

"আজ্ঞে সবই আছে, কিন্তু ঐ যে বললুম দিনকাল বদলে গেছে ফলে থেকেও নেই। দেখুন না যে ইংরেজ রাজের ওপর আমাদের এত ভরসা ছিল, যাদের ভয়ে একসময়ে লোক থরথর কোরে কাঁপতো আজ তারাই কাঁপছে দেশের লোকের ভয়ে। আজ আপনাকে আমাকে রক্ষে করবে কি, তাদেরই কে রক্ষে করবে তার ঠিক নেই।"

"শুনুন ম্যানেজারকাকা," অমরেশ গর্জে ওঠে। "আপনাকে কাকা বলি, কাকার মতোই সম্মান করি। তাই বোলে ভুলে যাবেন না যে আপনি আমাদের একজন কর্মচারী মাত্র। আপনার কর্তব্য—"

"হ্যাঁ জানি বাবাজী, নতমস্তকে আদেশ পালন করা।"

"তা হোলে যা বলছি করুন। আর যদি না পারেন তো বিদায় নিন, আমি অন্য ব্যবস্থা করি।"

"বাবাজী, বিদায় তো আমায় নিতেই হবে। আমি স্থিরও করেছি

নোব। তবু বলবো বুড়োর কথা শোন, রোখের মাথায় কিছু করতে যেও না।'

'নাঃ, অসহ্য। আপনি যান।"

"যাই বাবাজী। এদ্দিনের সম্পর্ক কিনা, তাই মায়া কাটাতে পারছি না। তবে জেনে রেখো তুমি যেমন আমায় কাকা বলে এসেছ, আমিও তেমনি তোমায় চিরটা কাল ছেলের মতোই স্নেহ কোরে এসেছি। তোমার কল্যাণ ছাড়া কখনও অন্য কিছু কামনা করিনি। যাক্, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, যখন শুনবেই না, যা ভালো বোঝ করো। কিন্তু অন্ততঃ বিয়ের কটা দিন বাদ দিয়ে কোরো।"

কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ম্যানেজার চলে গেলেন।

যতক্ষণ তাঁকে দেখা গেল নিরুপমা নীরবে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

"কি ভাবছো মা অত গালে হাত দিয়ে?" অসহিষ্ণু হোয়ে ছেলে বলে।

"ভাবছি বাবা ম্যানেজারের শেষ কথাটা উড়িয়ে দেওয়া হয়তো ঠিক হবে না। তুই বরং এক কাজ কর্। বিয়ের কটা দিন আর কিছু করতে যাসনি, বিয়েটা মানে মানে হোয়ে যেতে দে। একে তো ঐ সামন্তটা রাতদিনই প্রজাদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে, তায় যদি কিন্তু একি! ছোট বেয়াই আসছেন না? হ্যাঁ উনিই তো। এমন হঠাৎ?"

ছোট বেয়াই অর্থাৎ অমরেশের ভাবী শ্বশুর সিদ্ধার্থ হালদারের ছোট ভাই, সুপ্রসন্ন হালদার।

নিরুপমা দাঁড়িয়ে ওঠেন। বাইরের দিকে চেয়ে বলতে থাকেন, "তুই কি কিছু চিঠিপত্তর ইতিমধ্যে পেয়েছিলি অমু?"

"কই, না তো!"

দেখতে দেখতে সুপ্রসন্ন হালদার এসে গেলেন। পিছন পিছন ম্যানেজারবাবু। ম্যানেজারবাবু কাছারিতে ঢোকবার মুখে তাঁকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে দিতে এসেছেন।

"আসুন, আসুন, বেয়াইমশাই, খবর সব ভালো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বেয়ানঠাকরুণ, ভালোই।"

অমরেশ তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর পায়ের ধুলো নিলো। আগে হোলে সে এতোটা করতো না। কিন্তু এখন সে বুঝেছে তার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি এঁদের হাতে।

"চিরজীবী হও বাবা।" মাথায় হাত দিয়ে বলতে বলতে তিনি সোফায় বসলেন।

"কিন্তু এমন হঠাৎ যে?" প্রশ্ন করলেন নিরুপমা। "চিঠিপত্তর পর্যন্তও তো কিছু দেননি। দেখুন তো, তার ফলে স্টেশনে গাড়ীও পাঠাতে পারিনি। না জানি কত কষ্ট হোল?"

"না বেয়ানঠাকরুণ, হাঁটা একটুআধটু ভালো। তা না হোলে যে বাতে ধরবে। হেঁটে বেড়ানোর মধ্যে কত আনন্দ। দেখুন দিকি দাদার অবস্থা।"

"সত্যিই। কি দুঃখের বিষয়! বয়স ওঁর এমন কি বা হয়েছে, ঐ বয়সে লোকে এখনও দৌড়োদৌড়ি কোরে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা ওটা কি ভালো হবে না?"

"ও তো বাত নয় বেয়ানঠাকরুণ,—পক্ষাঘাত। তবে ডাক্তারে বলছে সম্পূর্ণ না সারুক, মাস ছয়েক পরে অন্তত লাঠি ধোরে কিছুটা চলাফেরা করতে পারবেন।"

"তা হোলেও কতকটা সান্ত্বনা। এই দেখুন না এত বড় আনন্দে ওঁকে আমরা কাছে পাব না।"

সকলেরই মন যেন সমবেদনায় ভবে ওঠে।

এদিকে আর থাকার প্রয়োজন নেই দেখে ম্যানেজারবাবু আস্তে আস্তে বিদায় নিলেন।

সুপ্রসন্নবাবু বললেন, "তারপব? আব তো মাত্র কটা দিন।"

অমরেশ উত্তর দিল. "এই দেখুন না মার অবস্থাখানা। সাবাদিন খেটে খেটে ক'দিনে কতো বোগা হোয়ে গেছেন!"

"বটেই তো!"

"কি করি বলুন বেয়াইমশাই? মাথাব ওপব আর তো কেউ নেই, যা কববো আমি।"

"তা ঠিক। আচ্ছা ওদিকে কি একটা বাড়ী তৈবী হচ্ছে দেখলুম যেন?"

"হ্যাঁ, ওটা অতিথি-ভবন। উনি যখন বাজা খেতাব পান. আপনি সে সময় এসেছিলেন কি?"

"না, আমি আসিনি, দাদা এসেছিলেন।"

"ওঃ যদি আসতেন দেখতেন অবস্থাখানা। প্রাসাদে পা রাখবাবও জায়গা ছিল না। সেই দেখে উনি ঠিক করলেন একটা অতিথি-ভবন তৈবী কববেন। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য আমাদেব. খানিকটা হয়েছে এমন সময়ে হঠাৎ গেলেন মারা। ফলে বাড়ীটা ঐ অবস্থাতেই পড়েছিল। আমি দেখলুম লোকজন এবাবও বড় কম হবে না, অনেকে আবাব দু'দশ দিন থাকবেও, কাজেই যাতে কারও থাকতে অসুবিধে না হয়, আর সেই সঙ্গে যাতে ওঁর ইচ্ছেটাও পূর্ণ হয—"

"বেশ. বেশ, ভালোই হবে।"

"বাড়ীটা কাব নামে হচ্ছে জানেন? বৌমার নামে।"

"বটে! তা ভালো। দাদা শুনলে খুব খুশী হবেন।"

নিরুপমার মুখ আনন্দে ভরে ওঠে।

"কিন্তু ও তো দেখছি বিরাট ব্যাপাব। এই ক'দিনে শেষ হবে?"

"নিশ্চয়ই হবে। শ'খানেকের ওপব লোক লাগিয়েছি।"

"শ'খানেকের ওপর! বাযেদেব ব্যাপাবই দেখছি একটু আলাদা।'

"ঠাট্টা করছেন?" হাসতে হাসতে নিরুপমা বললেন।

"ঠাট্টা! আদৌ না। দাদা বলেন রায়েরা বনেদীয়ানায় আমাদেরও ওপরে। দেখছি কথাটা ঠিক।"

গর্বে নিরুপমার বুকখানা ফুলে ওঠে। "না, না. একি বলছেন?" বলতে বলতে তিনি মাথা নত করেন।

হঠাৎ কি যেন তাঁর মনে পড়ে। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, "ইস্! এ আমি কি করছি? কখন এসেছেন! যাই, চা টার ব্যবস্থা করিগে।"

"সে হবে'খন বেয়ানঠাকরুণ। তার আগে যেজন্যে এসেছি—"

"না, না, সবার আগে এখন চা।"

"না বেয়ানঠাকরুণ। কথায় বলে কাজ সেরে বসি। কাজটা আগে হোয়ে যাক। তা হোলে বেশ নিশ্চিন্ত মনে আরাম করতে করতে চা খাওয়া যাবে।"

"নিশ্চিন্ত মনে!" নিরুপমা উদ্বিগ্ন হোয়ে ওঠেন।

"হ্যাঁ।"

"বেশ, যখন বলছেন।" নিরুপমা বসলেন।

"কিন্তু জামাই বাবাজীকে—"

"ও আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি।" বলতে বলতে অমরেশ দাঁড়িয়ে উঠলো।

নিরুপমা "তুই বরং অমু ততক্ষণে চা-টা করবার জন্যে চাকরদের বোলে দে।"

"আচ্ছা মা।"

অমরেশ চলে গেল।

সুপ্রসন্নবাবুর দিকে মুখ ফেরে নিরুপমা বললেন, "হ্যাঁ বলুন এইবার বেয়াই-মশাই।"

"ব্যাপার কি জানেন? একখানা চিঠি পেয়ে আমরা বড়ই ভাবনায় পড়েছি, দাদা তো খুবই অস্থির হোয়ে উঠেছেন।"

"চিঠি?"

"হ্যাঁ, এই দেখুন না।"

চিঠিখানা পড়তে পড়তে লজ্জায় ক্ষোভে, উদ্বেগে নিরুপমার মুখের রং ঘন ঘন বদলাতে লাগলো। বারদুই ভ্রূকুটিও তিনি করলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "এ নিশ্চয়ই আমাদের ওপর আপনাদের মনকে বিষিয়ে দেবার জন্যে কেউ লিখেছে। দেখছেন না নাম পর্যন্ত দেয়নি! জানবেন সে আমাদের শত্তুর ছাড়া আর কেউ না।"

"আমাদেরও যে তা মনে হয়নি তা নয়।"

"হ্যাঁ, সেইটেই ঠিক। আমার মনে হয় আমার ছোট জা—"

"বোধ হয় তিনি না তিনি তো শুনেছি বর্তমানে এলাহাবাদ না কোথায় থাকেন। চিঠিখানা কিন্তু এখানকার ডাকঘর থেকে ছাড়া। দেখুন তো।"

খামের ওপরটা দেখতে দেখতে নিরুপমা চেঁচিয়ে ওঠেন, "আরে! জগদ্বল্লভপুর! এইখানকারই তো। তা হোলে নিশ্চয় প্রজাদেরই মধ্যে কেউ লিখেছে।"

"দাদাও তাই বলছিলেন। জানেন এতোটা উতলা আমরা হতুম না, ও চিঠির কোন মূল্যই দিতুম না, যদি না অমন ধবনের সব অভিযোগ থাকতো। ভেবে দেখুন কি বলেছে। রমানাথ ভটচায্যি না কি ঐ লোকটাব নাম -- ওব মেয়ের গর্ভে নাকি আমাদের অমরেশের সন্তান। বলছে অনুসন্ধান কোরে দেখুন সত্যি কি না। বলুন তো এইবকম খবব পাবাব পব—"

"না না আপনাদের দোষ কি? উতলা হবার কথা বইকি। ওঃ, এমন কোবেও মানুষ লিখতে পারে!"

"তার ওপর আবাব দাদাব এই একটিমাত্র মেয়ে, আব উনি নিজে আবার পঙ্গু।"

"ফলে বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক।" তারপব একটু থেমে . "যাক, এখন বুঝতে পারছেন তো ব্যাপাবটা? না একটু খোঁজখবব কোবেই দেখবেন।" মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিযে নিরুপমা বললেন।

"ছি ছি, কি যে বলেন বেযানঠাকরুণ! দাদাব আপনাব ওপব অগাধ বিশ্বাস। আপনি যখন বলছেন, ব্যস।"

আদরে আপ্যাযনে বাত্তিরটা কাটিয়ে সুপ্রসন্নবাবু বিদায় নিলেন। নিরুপমা তাঁকে বারবাব জিগগেস কবলেন তাঁব মনে আব কোন খিচ আছে কিনা।

"না বেয়ানঠাকরুণ কিছু না। ও প্রসঙ্গ তুলে আব লজ্জা দেবেন না।"

তবু নিরুপমাব মনে শান্তি নেই। লজ্জায, দুর্ভাবনায তাঁব মুখ কেবলই কালো হোযে ওঠে।

বেযাই বিদায় নিতেই তিনি ছেলেব কাছে দৌড়ে এলেন।

অমরেশ মাথা তুলতে পাবে না। কিছুক্ষণ পরে সে বলে, "জানো মা, রমানাথ ভটচায্যির আমি অনেক করেছি। লোকটা সত্যিই অকৃতজ্ঞ, তাই ওঁদেব কাছ পর্যন্ত ধাওয়া করেছে।"

"সে কি আজ জানলি?"

অমরেশ নীরব।

নিরুপমা বলতে থাকেন, "আমি বাছা সবই শুনেছি—খাজনা মাপ, মাসোহারাব ব্যবস্থা, মেয়েকে কাপড গযনা দেওযা, সব। কি আহাম্মক তুই বল্ তো।"

কিছুক্ষণ থেমে মা আবাব বলতে থাকেন, "ওঃ কি শযতান লোকটা! এতো পেয়েও এখনও ছোবল মাবতে ছাড়ে না! কিসে আমাদেব ক্ষতি হয, কিসে অকল্যাণ হয়, কেবলই সেই দিকে লক্ষ্য।"

"আচ্ছা মা, বলছিলে না চিঠিখানা জগদ্বল্লভপুরে পোস্ট অফিস থেকে ছাড়া?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে কি জানো? এ শচী সামন্তের ষড়যন্ত্র।"

"কি কোরে বললি?"

"আমি তোমায় হলফ কোরে বলতে পারি এ নিশ্চয় ঐ শয়তানটারই কাজ।"

"বটে!"

"হ্যাঁ। দেখছো তো। তুমি আবার তখন বলছিলে কিনা ওর ভয়ে এখন কিছু না করতে। আমি তোমায় বোলে রাখছি ও শয়তানটাকে সরাতে না পারলে কিছুতেই শান্তি নেই। তুমি যদি কিছু নাও করো, ও করবেই।"

"যা ভালো বুঝিস বাপু কর্। এখন মানে মানে -"

"কেন মা? উনি কি সেরকম কিছু বললেন?"

"না, তা বলেননি কেননা চিঠিটা ওঁরা যে ঠিক বিশ্বাস করেছেন তা না, বরং যে সন্দেহটুকু নিয়ে ছোট বেয়াই এসেছিলেন, মনে হোল, আমার সঙ্গে কথাবার্তার পর তা তাঁর কেটে গেছে, বেশ সন্তুষ্ট মনেই উনি ফিরেছেন। তবু কিছু কি বলা যায়? মানুষের মন তো, বদলে যেতে কতক্ষণ। নাঃ, চোখটা দেখছি এখনও নাচছে!"

অমরেশ আর কিছু বলল না। তার ভেতরটা রমানাথ ও শচীনন্দনের প্রতি আক্রোশে ফুলতে থাকে।

ডুম-ডুম্-ডুম্! ডুম্-ডুম্ডুম্! ঢেঁড়ার আওয়াজে তিন নম্বর মৌজার এধারটা গমগম কোরে ওঠে।

কুয়াশাভাঙা রোদ্দুর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দুপাশে খেসারি কড়াইয়ের গাছ। তার ওপর চকচক করছে শিশির। আকাশে উড়ে চলেছে এক ঝাঁক গাঙচিল। তাদেরও শাদা ডানাগুলো চকচক করছে রোদে।

"ও কিসের ঢেঁড়া রে রতন?" মাঠে যেতে যেতে গুরুপদ জিগগেস করে।

"জমিদার জানাচ্ছেন কংসাবতী খালের জল আর আমরা কেউ নিতে পারবুনি।" রতন উত্তর দেয়।

"সেকি! তালে আমরা যাবো কোথায়? এই দ্যাখো না আমিই তো ভাবছি আজ বিগেল থেকেই আমার আলুবাড়ীটায় সেচ দিতে লেগে যাবো, নইলে আলু-গুলোন সব নষ্ট হোয়ে যাবে।"

"বলো কেন দাদা? আমিও তো চলেছি এই দ্যাখোনা, সেপনি কিনে নিয়ে। আমার কপিচারাগুলোও তো শুকিয়ে যেতে বসেছে।"

"তবে?"

"তবে আর কি? ওসব ঢেঁড়া টেঁড়া মানলে চলবেনি।"

"সত্যিই তো কি কোরে চলবে? ধান তো এবার হোলইনি। তবু আলুটা কপিটা কোরেও যদি দুমুঠো জোটানো যায়।"

"ব্যাপার কি জানো? জমিদার আমাদের কিছুতে শান্তিতে থাকতে দেবেনি।"

"না, না, জল আমাদের চাইই।"

"আমারও তো সেই কথা। তবে কথা হচ্ছে হাঙ্গামা টাঙ্গামা না আবার হয়।"

"হোক। পরোয়া করিনে।"

"এক কাজ করলে হয় না? চলো না একবার সমিতির অফিসে। শচীদার সঙ্গে গিয়ে একটু পরামর্শ করিগে।"

"তা মন্দ বলোনি। আরও পাঁচজনকেও তো সেখানে পাবো। তাদের মতামতটাও জানা যাবে।"

কৃষকসমিতির অফিসে এসে তারা দেখে সেখানে একরকম সভাই বোসে গেছে। বহু লোক জড়ো হয়েছে। শচীনন্দনকে খুব উত্তেজিতই দেখাচ্ছে। শচীনন্দন বলছে, "না, না, মগের মুল্লুক নাকি? জল তোমরা যেমন নিচ্ছিলে নেবে।"

একজন বলে উঠলো, "আমি ঢেড়াওলাকে জিগেস করেছিলুম। ও কি বললে জানো? ওটা নাকি বাবুদের খাস।"

ফোকলা মোড়ল রাগে কেঁপে ওঠে "কি বললে? খাস! জানো ও খাল কেটেছে কারা? আমরা—তোমাদের বাপঠাকুর্দারা। ও খাল আমাদের, ওর জলও আমাদের।"

"ঠিক বলেছ। খুব ঠিক কথা। আমরা ও জল ব্যাভার করবো, কারও বাধা আমরা মানবুনি।"

"সাবাস! সাবাস! এই তো মরদের মতো কথা।" শচীনন্দন বোলে উঠলো। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে আরও উঁচু গলায় সে বলতে লাগলো, বন্ধুগণ, শুনুন। তা হোলে আমরা এই সিদ্ধান্তই এখানে নিচ্ছি যে বংশাবতী খালের জল এতকাল চাষীরা যেমন নিয়ে আসছিল সেই রকমই নিতে থাকবে।"

সকলে সমস্বরে বোলে উঠলো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

"জমিদারের কোন অধিকার নেই এ জল বন্ধ করবার।"

"না, না, না।'

"বন্ধুগণ জমিদারের অত্যাচারের শেষ নেই। চেয়ে দেখুন একটার পর একটা জুলুম সে আপনাদের ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছে। কিন্তু তার সকল অত্যাচারই ব্যর্থ হয় যদি আপনারা সংঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ান, যদি আপনারা বাধা দেন, প্রতিরোধ করেন।"

"আমরা প্রতিরোধ করবোই।"

রমানাথের অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপের দিকে। সাবিত্রী তার শিয়রে বোসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর অঝোরে কাঁদছেন।

সন্ধ্যা উৎরে গেছে। শিয়ালগুলো হুক্কাহুয়া করতে করতে এইমাত্র থেমে গেল। চারদিক থমথমে।

শৈবলিনী এ দুদিন আসেননি। তিনি এখানে নেই। হঠাৎ পরশু তিনি খবর

পেলেন তাঁর বোনপোটি জলে ডুবে মারা গেছে। খবর পেয়েই শৈবলিনী ছুটলেন বোনের কাছে। যাবার সময়ে বলে গিয়েছিলেন দু'একদিনের মধ্যেই ফিরবেন, কিন্তু এখনও ফিরতে পারেননি।

সুমিত্রা পা টিপে টিপে এলো বাপের ঘরে। তারপর বেরিয়ে গেল। তারপর আলোটা জেলে নিয়ে আবার এসে বসলো মার পাশে। কিছুক্ষণ পর উঠলো। মাথার দিকের জানলাটা ভালো কোরে খুলে দিলো। মিটমিটে আলোয় দেখলো চারিদিকে ছড়ানো খল, নুড়ি, ওষুধের মোড়া, বিভিন্ন অনুপান ও ছাড়া জামাকাপড়। সেগুলি তুলে যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে আবার এসে সে বসলো পিতার শয্যাপাশে।

বেশীক্ষণ কিন্তু বোসে থাকতে পারলো না, কান্নায় ভেঙে পড়লো, পিতার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো "বাবা! বাবা!"

রমানাথ চোখ চাইলেন। তাঁর চির আদরের মিত্রাকে এভাবে দেখে সেই মুমূর্ষু অবস্থাতেও বুঝি তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়লো।

এদানীং তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়েছে সুমিত্রার ওপর। তিনি তাকে উঠতে বসতে ভর্ৎসনা করেন, এমন কি তাঁর কাছে আসতে পর্যন্ত নিষেধ কোরে দিয়েছেন।

সুমিত্রার তাতে ক্ষোভ ছিল না, অভিযোগও ছিল না। সে যে অপরাধী। তারই জন্যে তো আজ তার বাপমার এ দুরবস্থা। তারই জন্যে তো আজ তার পিতা অকালে মরণের পথে এগিয়ে চলেছেন।

পাছে বাপ কষ্ট পান এই জন্যে সুমিত্রা তাঁর অবাধ্য হয় না, দূরে দূরেই থাকে। যখন একান্ত থাকতে পারে না জানলা দিয়ে তাঁর পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। পুরোন দিনের কথা, পুরোন সঙ্গীদের কথা, পুরোন ঘরকন্নার কথা, পুরোন জীবনের কথা তার মনের মধ্যে উঁকি মারে দুচোখ জলে ভেসে যায়।

হাতখানা আস্তে আস্তে বাড়িয়ে থেমে থেমে রমানাথ বললেন, "এসেছিস মা? আয় মা! ওঃ কত ভর্ৎসনাই না তোকে করেছি! কিছু মনে করিসনি মা, বড় আঘাত পেয়েই"

সুমিত্রার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়

"বাবা! বাবা! তুমি চুপ করো। তোমার কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে বাবা। তুমি চুপ করো। আমি না হয় আর এক সময় আসবখন।"

"না মা যাসনি। অভিমান কোরে চলে যাসনি। আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। আর হোলেও কতক্ষণের জন্যেই বা? হোয়ে তো এসেছে। নারায়ণ! না--"

মা ও মেয়ে দুজনেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে আবার রমানাথের গলা পাওয়া গেল "অমরেশের কাছ থেকে কি আর কোনই খবর পাসনি মা?"

সুমিত্রা মাথা নিচু করে। রমানাথ তার দিকে ফ্যালফ্যাল কোরে চেয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরে : "শচীনন্দন বলেছিল যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারে খবর দেবে। বোধ হয় কিছু করতে পারলো না।"

খানিক পরে আবার "আমি এখন বুঝতে পেরেছি মা ও প্রতিশোধ নিলো। আগে ধরতে পারিনি। ভেবেছিলুম ও হয়তো ওর বাপের থেকে একটু অন্য রকম হবে।"

একটু থেমে আবার, এবার যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন "হায়, এ কি কোরে বসলুম! ফাঁদ না দেখে কেন অবুঝের মতো লাফিয়ে পড়লুম! ওঃ, কি সর্বনাশই না হোল! নারায়ণ! নারায়ণ!"

রমানাথ ছটফট করতে লাগলেন।

খানিকক্ষণ পরে আবার শুরু করলেন 'দ্যাখ্ মা দোষ আমারই। কিন্তু আমি তো চললুম। তোদের কি হবে? তোকে নাকি শুনছি দেশ থেকে বার কোরে—"

রমানাথের স্বর রুদ্ধ হোয়ে গেল। মুদিত চোখদুটি দিয়ে অবিরাম জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তিনি ঝিমিয়ে পড়লেন।

সুমিত্রা এগিয়ে এসে তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। আর সাবিত্রী অসহায়ের মতো তাঁর দিকে ফ্যালফ্যালিয়ে চেয়ে রইলেন।

রমানাথ আবার চোখ খুললেন। খানিকক্ষণ সুমিত্রার দিকে একদৃষ্টে চেয়েও রইলেন। তারপর হঠাৎ তার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন "না, না, তুই আমায় ছুঁসনি, ছুঁসনি। তোর ছোঁয়া অপবিত্র। মনে হচ্ছে তোর মাঠাকুমার পাশে তুই—"

আর বলতে পারলেন না।

সুমিত্রা মুখ তুলে দেখে সাবিত্রী তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। তাঁরও চোখে যেন পিতার কথাগুলিই ভাসছে।

দারুণ লজ্জায় তার ঘাড় ভেঙে পড়লো। উঃ এতোতেও কি তার মৃত্যু হয় না!

আস্তে আস্তে উঠে সে বেরিয়ে এলো। নিজের ঘর পর্যন্ত কোন রকমে এলো, তারপর বিছানার ওপর পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদতে লাগলো।

নাঃ, তার মৃত্যুই ভালো। বার বার এই কথাটাই সে ভাবতে লাগলো।

মরণ তো তার সেইদিনই হয়ে যেত যেদিন সে গলায় দড়ি দিয়েছিল। কেন যে সেদিন ওঁরা তাকে বাঁচাতে গেলেন!

কিন্তু কিন্তু কেনই বা সে মরবে?

সে উঠে বসলো। তার চেয়ে বরং হ্যাঁ সেই ভালো, আর দেরী না, আজই সে অমরেশের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

কিন্তু শৈবঠাকুমা তো নেই। তাঁকে যে চাই।

তা হোক্। তাঁর আশায় বসে থাকবার সময় আর নেই। 'যাই যাই' কোরে অনেকগুলো দিন চলে গেছে। দেখা যদি করতে হয় তো আর দেরী করা উচিত হবে না।

সত্যিই তো বিয়ে যদি সে কোরে ফেলে তখন? নৈরাশ্যে সে কেঁপে ওঠে।

না না হয়তো এখনও নিরাশ হবার মতো কিছু নেই। হয়তো এখনও সে গিয়ে দাঁড়ালে তাকে দেখলে অমরেশের মন ফিরতে পারে।

সেবারে তো তাইই হয়েছিল। একদিকে ঘর ফাটছে, অপরদিকে প্রোক-পরোয়ানা। ম্যানেজার রমানাথকে হাঁকিয়ে দিয়েছেন। কোনদিকে আর কোন আশা ভরসা নেই। কিন্তু যেই সে গিয়ে দাঁড়ালো ব্যাস অমনি সব সমস্যার সমাধান হোয়ে গেল।

না না অমরেশ অবুঝ নন নিষ্ঠুর নয়। এতদিনে বরং সুমিত্রার তার কাছে যাওয়াই উচিত ছিলো। যার না হয়েছে হয়েছে আর দেরী নয়। আজ সে যাবেই এখনই যাবে একাই যাবে।

হায়! কেন সে সেদিন নিজে না গিয়ে তার বাবাকে যেতে দিলো কেনই বা দেখা করার বদলে চিঠি পাঠাতে গেল তারই ভুল হয়েছে তারই অন্যায় হয়েছে। সে যাবে। সে গিয়ে তার হাতে পায়ে ধরবে। তাকে দেখলে সে কিছুতেই না করতে পারবে না। তার মন ফিরবেই। এখনও সময় আছে এখনও আশা আছে, এখনও সে বাচতে পারে তার বাপকেও বাচাতে পারে।

ঠিক ঠিক। তারই ত্রুটি হয়েছে। সে একজন সামান্য প্রজার মেয়ে আর অমরেশ জমিদার নত তাকে হোতে হয় নত তার হওয়া উচিত।

যতই সে ভাবে ভাবনা আর শেষ হয় না।

সত্যিই তো সে স্বেচ্ছায় তাকে [illegible] করেছে। সে তাকে ত্যাগ করে [illegible] মাত্র তো তারই দেওয়া। এ সব [illegible] তারই। হয়তো অমরেশ যা করে ফেলেছে তার জন্য লজ্জায় এমন আত্মগোপন করছে কিন্তু বিশ্বাসঘাতক সে হোতে পারে না। কখনোই না কখনোই না।

বিছানা থেকে সে নিচে নেমে এলো। তার [illegible] বার চুমু খেল। তারপর বুকের কাপড়টা সরিয়ে নাই দিতে লাগল।

আবার ভাবতে লাগলো [illegible] যদি তার পাচজন যেমন বোনের মা হয় সেও ঠিক তেমনি মায়ের হোতে পারে। কি গর্ব কি আনন্দেরই অধিকারী না সে হোত। আবার তার চোখদুটি অশ্রুসজলে ভোরে উঠে।

কিন্তু আর নয় না আর নয় দেরী হোয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ উঠোনে কথাবার্তা শোনা গেল। কবিরাজের গলা। কবিরাজ সাবিত্রীকে বলছেন "দেখুন ঐ ওষুধটা খাইয়ে, হয়তো কাজ হোতে পারে।"

সুমিত্রার প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে। তা হোলে তো এখনও আশা আছে। বাপ তার তা হোলে বেঁচে যেতে পারে!

না, না, আর দেরী না।

বাক্স থেকে জামা বার কোরে সে খোকাকে পরালো। নিজেও বেশ বদল করলো। তারপর ছেলেকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

তার ছেলেকে সে গিয়ে একেবারে তারই কোলে তুলে দেবে। দেখা যাক কেমন কোরে 'না' করে।

নিঃসঙ্গ পথ। চারদিক অন্ধকার। সুমিত্রার গাটা কেমন যেন ছমছম করে। আজও যদি শৈবঠাকুমা সঙ্গে থাকতো!

চেয়ে চেয়ে সুমিত্রা দেখতে থাকে। কি বিরাট প্রাসাদ! কত আলো! কত লোকজন! কত জলুস! প্রথম দিন সে যা দেখেছিল, তার চেয়ে যেন শত গুণ বেশী। গাঢ় অন্ধকারের কোলে যেন ফুটে রয়েছে এক বিরাট পদ্ম। তার চোখ ঝলসে যেতে লাগলো।

অথচ সে যেখান থেকে এসেছে সেখানে না আলো, না হাসি, না প্রাণের স্পন্দনটুকু পর্যন্ত। যেন মৃত্যুপুরী থেকে সে বেরিয়ে এসেছে জীবনের রাজ্যে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখে আর ভাবে এতো আলো কেন? কেন এতো জাঁকজমক?

হঠাৎ এই সময় অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর নহবৎটা আবার বেজে ওঠে।

এ কি! নহবৎ বাজছে! কেন? তা হোলে কি সত্যিই

সে আর ভাবতে পারে না। কাউকে যে জিগগেস করবে তাও পারছে না, সাহসই হয় না।

চেনাশুনোও তো কেউ নেই। কেমন কোরেই বা থাকবে? সে তো চেনে শুধু জমিদারকে, হেমা ঝিকে আর পাঁড়ে দারোয়ানকে।

কিন্তু হেমা কই? পাঁড়েজীই বা কোথায়? ফটকে যে লোকটি রয়েছে ও তো অন্য। ওকে তো সে কোনদিন দেখেনি!

ইস! শৈবঠাকুমা যদি এই সময়ে সঙ্গে থাকতো!

অবশেষে কোন রকমে এগিয়ে এসে সে দরোয়ানকে জিগগেস করে, "জমিদার-বাবু বাড়ী আছেন?"

"জেমিনদারবাবু? জেমিনদারবাবু তো সাধি করতে গেছে মাইজী।"

"সাধি করতে গেছে? সে আবার কি?"

"সাধি বোঝ না? তুমহাদের মুলুকে যাকে বিয়া বোলে।"

"না, না, হোতে পারে না।"

"কি হোতে পারে না?"

"ঐ যা বললে। তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো।"

"মাইজী তুমহার সঙ্গে ঠাট্টা কোরে হামার কি লাভ হোবে?"

"তুমি তা হোলে ঠিক বলছো?"

"হাঁ আমি ঠিক বলছি, তামাম মুলুকের লোগ জানে, তুমি জানো না?"

সুমিত্রার মাথা টলতে থাকে। চোখে সে অন্ধকার দেখে। বুঝি এখনই পড়ে যাবে।

একজন লোক তাদের তর্ক শুনে এগিয়ে আসে। "কি হয়েছে?" সে জিগগেস করে।

"হামি বলছি জেমিনদার সাধি করতে গেছে। মাইজী বিশ্ওয়াস করছে না।" দরোয়ান উত্তর দেয়

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আজ জমিদারের বিয়ে। জমিদারবাবু বৌ আনতে গেছেন।"

সুমিত্রার মনের কোণে যেটুকু আশা-ভরসা ছিল সব ভেঙেচুরে একেবারে খান খান হোয়ে গেল।

কাঁপতে কাঁপতে, টলতে টলতে সে বাড়ী ফেরে।

রমানাথের তখন নাভিশ্বাস আরম্ভ হয়েছে। সাবিত্রী মেঝের ওপর উপুড় হোয়ে পড়ে কাঁদছেন।

সুমিত্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

দীপ নিবলো বোলে। আর কি জন্যে? আর কিসের আশাতেই বা?

অনেকক্ষণ পরে সে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো। ঢুকতে গিয়ে দরজায় মাথাটা ঠুকে যায়। বুক দুটো বাঁ হাতে টিপে কোনরকমে এগিয়ে এসে হেঁট হোয়ে সে খোকাকে শোয়ালো। খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলো। খোকা দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছে। হায়! ক্ষুদ্র শিশু তো জানে না সে তার মার কত বড় লজ্জা, কত বড় কলঙ্ক! সে তো জানে না যেখানে সে শুয়ে, সেখানকার মানুষগুলির জীবনে সে কত বড় অভিশাপ!

সুমিত্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার তাকে দেখতে থাকে। হঠাৎ তার রাগ হয়। এতের পরও নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে! ওঃ! কেন সে তাকে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে গলা টিপে মেরে ফেলেনি? তা হোলে তো সব আপদ সেইদিনই চুকে যেত।

কিন্তু, কিন্তু এখনও তো সে তা পারে। নিশ্চয়ই পারে।

হঠাৎ যেন তাকে বিসে পেয়ে বসে। সে হাত বাড়ায়। পরক্ষণেই চমকে ওঠে। একি! এ কি করছে সে? সে না তাকে জন্ম দিয়েছে! সে না তার মা! সে তো তাকে দিয়েই না সে মাতৃত্বের আস্বাদ পেয়েছে!

তার সারা দেহ কেঁপে ওঠে। চোখে জল আসে সে পিছিয়ে যায়। দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে আবার তাকে দেখতে থাকে। এবার কিন্তু যতই দেখে তার দুচোখ, তার অন্তর মায়ায় ভরে ওঠে।

আবেগপূর্ণ অন্তরে হেঁট হোয়ে সে তাকে চুমু খায়।

হঠাৎ ঘড়ঘড় শব্দ কানে আসে। সে কান খাড়া কোরে শোনে। দাওয়ায় বেরি এসে উঁকি মেরে দেখে তার মা দুধে ন্যাকড়া ভিজিয়ে তার মুমূর্ষু পিতার ঠোঁ বুলিয়ে দিচ্ছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মুমূর্ষুর মুখে কিন্তু সে দুধ যা না, কস বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। পিদিমের মিটমিটে আলোয় সে পরিষ্কার দেখতে পায় তার মার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ কোরে দিয়ে মৃত্যু তার বাবাকে একটু একটু কে টেনে নিচ্ছে।

কান্নায় সে ভেঙে পড়ে। পিতার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়বার জন্যে আকুলি বিকুলি করতে থাকে তার অন্তর।

কিন্তু কেমন কোরে যাবে? সে গেলে, সে ছুঁলে যে

না না, একবারটি। শুধু একবারটি। তাঁর এই অন্তিম কালে শুধু একবারটি সে তার পায়ের তলে মাথাটি রাখবে, তাঁর কাছে শেষবারের মতো ক্ষমাভিক্ষা করবে একটিবার 'বাবা' বোলে ডাকবে।

কিন্তু না। তার জন্যেই তো আজ তাঁর এ দুর্গতি। কলঙ্কিনী সে। অশুচি সে। তাঁকে সে ছুঁতে পারে না, তার সতী সাধ্বী মার পাশে গিয়েও বসতে পারে না।

তার চেয়ে বরং তার এখান থেকে বিদায় নেওয়া উচিত। এখনই, এখনই। হ্যাঁ সেইটেই তার কর্তব্য। কেননা যদি সে থাকে, হয়তো তার পিতার সৎকারের জন্যে লোকই জুটবে না, হয়তো কেন নিশ্চয়ই।

সে শিউরে ওঠে। ভাবে সেই তো কাল তাকে যেতেই হবে, রাত পোহালে তো তাকে ওরা গ্রাম থেকে বার কোরে দেবে বলেছে, তবে আর কেন?

ঠিকই। তবে আর কেন?

সে গুম হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কি করবে কিছু ঠিক করতে পারে না।

না না, আর না। আর না।

কিন্তু কোথা সে যাবে? যেখানে দুচোখ যায় যেখানে দুপা চলে, এই পৃথিবী থেকে বাইরে, বহুদূরে, অন্য কোথাও।

সেই ভালো। হা হা হা! হি হি হি!

এ কি! সে হাসছে কেন? তার নিজের হাসিতে সে নিজেই চমকে ওঠে।

যাবার জন্যে এইবার সে প্রস্তুত হয়। ছেলেকে কাঁধে তোলে।

নাড়া পেয়ে ছেলে কেঁদে ওঠে। আস্তে আস্তে তার পিঠ চাপড়ে আবার তাকে সে ঘুম পাড়ায়।

হঠাৎ আলমারিটার ওপর তার চোখ পড়ে। তার মাথার মধ্যে কেমন যেন কোবে ওঠে। এই আলমারিটাতেই না রয়েছে অমরেশের দেওয়া উপহার-সামগ্রী?

ঘৃণায়, রাগে সে কাঁপতে থাকে।

বাচ্চাটাকে তাড়াতাড়ি শুইয়ে দিয়ে আলমারিটা সে খুলে ফেলে, কাপড় জামা গয়না সব টেনে টেনে বার করে।

জিনিসগুলোর মধ্যে থেকে অমরেশের হাতের আংটিটাও উঁকি মারে। সে চেয়ে চেয়ে দেখে।

একদিন এটাই না অমরেশ নিজের আঙুল থেকে খুলে তার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল?

অবশ্য এদানিং সে সেটা আর পরে না—লজ্জায়, ঘৃণায়।

সে থমকে দাঁড়ায়। সেদিনকার সে ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চোখে জল আসে। ওঃ তখন কি সে স্বপ্নেও ভেবেছিল এমন অবস্থা একদিন হবে? কি শয়তান! কি বিশ্বাসঘাতক!

আবার তার মাথার মধ্যে কি কি বোলে ওঠে... কেন কেন আর এ সব?

তাড়াতাড়ি উঠে সে কুলুঙ্গী থেকে দেশলাইটা পাড়ে। একটা কাঠি জ্বালে, তারপর জ্বলন্ত কাঠিটা হঠাৎ তার ওপর ছুঁড়ে দেয়।

আগুন! আগুন! দাউ দাউ কোরে জ্বলে ওঠে আগুন।

"যাঃ শেষ হোয়ে যা, সব শেষ হোয়ে যা," সে বোলে ওঠে। তারপর হাসিতে ফেটে পড়ে, হা হা হা! হি হি হি!

কিন্তু এখনও যে আছে, এখনও যে সব শেষ হয়নি। ঐ, ঐ দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ লাল পাড় দিয়ে মোড়া চিঠির তাড়াটা। আরও আরও ভয়ংকর ওটা।

চিঠিগুলো সে পাড়ে। কি সুন্দর কাগজ! কত সুন্দর সুন্দর কথা লেখা ওতে! ওঃ এই সব কথা লেখার পরও বিনা দোষে তাকে সে এমনি কোরে দূরে ফেলে দিলে! কি শয়তান! কি বিশ্বাসঘাতক! ওঃ! ওঃ! যা, তোরাও যা।

চিঠিগুলো সে আগুনে ছুঁড়ে দিলে।

তারপর আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো হা হা হা! হি হি হি!

সাবিত্রী ছুটে আসেন সন্ত্রস্ত হোয়ে। দেখেন সুমিত্রা দাঁড়িয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে। অবাক হোয়ে তিনি খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু কি বলবার আছে? করবারই বা আছে কি? আস্তে আস্তে তিনি চলে গেলেন।

'উঃ'! সজোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সুমিত্রা। তার চোখ দিয়ে বড় বড় কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়লো।

অনেকক্ষণ আগুন নিবে গেছে। আর নয়। এইবার সে বেরোবে। আঁচলখানা ভালো কোরে কোমরে বাঁধলো।

এগিয়ে এসে সে খোকাকে বিছানা থেকে তুললে। ঘুমন্ত শিশু একবার হাই তুলে আবার তার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

পিতার ঘরের জানলার কাছে এসে সে দাঁড়ালো। দেখলো তিনি তেমনি কোরেই শ্বাস টানছেন, আর মা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ঠিক তেমনি ভাবেই কাঁদছেন।

তার বুক ফেটে যেতে লাগলো। কান্না এসে গলার মধ্যে কুণ্ডলী পাকাতে লাগলো।

কিন্তু আর না, আর না। তাকে যেতেই হবে। কাঁদতে কাঁদতে সে বলে "চললুম বাবা। চললুম মা। ক্ষমা কোর তোমাদের মিত্রাকে ক্ষমা কোর তোমাদের কলঙ্কিনী মেয়েকে।"

জানলার ওপর মাথাটি রেখে সে তাঁদের প্রণাম করলো।

বেলগাছটার তলায় এসে দাঁড়ালো। পাতাগুলোর দিকে করুণ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। এরই তলায় বোসে সে শিবপুজো করতো এরই পাতা দিয়ে।

আজ কিন্তু ছেড়ে যেতে হবে।

এইবার পুকুরধারে এল। জ্ঞান হওয়া থেকেই এই পুকুরটির সঙ্গে তার পরিচয়। কালো থমথমে জল। এই জলেই সে প্রত্যহ স্নান করেছে, এরই সিঁড়িগুলিতে বোসে বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করেছে। এখনো তার পায়ের দাগ এখানে ওখানে দেখা পাওয়া যাবে।

কিন্তু নাঃ, তাকে যেতেই হবে।

তার সঙ্গিনীরাও তো অনেকে গেছে এই গ্রাম ছেড়ে। কিন্তু তার মতো এমন ভাবে কে গেছে? তারা গেছে সসম্মানে, সগৌরবে, তাদের স্বামীর ঘর করতে।

কান্নার ভারে সে চলতে পারেনা।

তবু চলতেই হয়।

শৈবলিনীর ঘর দেখা যায় ওই। আলোটা মিটমিট কোরে জ্বলছে। সে থমকে দাঁড়ায়। সত্যিকার বন্ধু বলতে তো একমাত্র শৈল ঠাকুমাই ছিল। সুখে দুঃখে আপদে বিপদে শৈব ঠাকুমাই সকল সময়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের সকলের সঙ্গে, এমন কি নিজের বাড়ীর সঙ্গে পর্যন্ত ঝগড়া করেছে তাদের জন্যে। হায়, যাবার আগে একবারটি, যদি একবারটিও শৈব ঠাকুমার সঙ্গে দেখা হোত!

কিন্তু নিশ্চয়ই শৈব ঠাকুমা এখনও ফেরেনি। ফিরলে বুড়ী তার কাছে ছুটে আসতোই।

তা ছাড়া দেখা কোরেই বা কি হবে? সব তো শেষ! বরং দেখা না হওয়াই ভাল। দেখা হোলে বুড়ী ছাড়বে না। ফলে তাকে নিয়ে বেচারিকে নানা অপমান সহ্য করতে হবে।

না, না, আর না।

আর না, আর না। কেউই তাকে চায় না। তারাগুলো পর্যন্ত না। ওইতো ওরা

মিটমিট কোরে তার দিকে চাইছে আর ফিসফিস কোরে কি যেন বলছে। হয়তো বলছে "আর এখানে না, আর এখানে না।"

হ্যাঁ, ঠিকই, আর এখানে না।

কান্নার ভারে সে ভেঙে পড়ে। পাটা মুচড়ে যায়। মাগো' বলতে বলতে সে পড়ে যায়। কোলের ছেলেটা ডুকরে কেঁদে ওঠে।

অনেক দিন পরে। অমরেশের বিয়ের ধুমধাম শেষ হোয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে পাঁচ লাখ টাকার ওপর খরচ হয়েছে। প্রজারা বলছে এমন ধুমধাম তারা জীবনে আর কখনো দেখেনি। নিখিলেশ রায় যখন রাজা খেতাব পান তখন এলাহি হয়েছিল বটে, কিন্তু এর সঙ্গে তুলনাই হয় না।

অথচ একটুকরো জমিও বাঁধা দিতে হয়নি। ঘর থেকে একটা পয়সাও বার করতে হয়নি। বুদ্ধিমতী বটে নিরুপমা দেবী।

মাকে দুহাতে খরচ করতে দেখে একদিন থাকতে না পেরে অমরেশ বোলে ফেলেছিল, এ কি করছো মা? শেষে-'

"দূর পাগল ছেলে! আমি কি তোর মতন? আসল কথা কি, মোহর পেতে হোলে সোনার থালা পাততে হয়। তোকে আমি বলিনি, হালদার মশাই শুধু জমিদারিই দিচ্ছেন না তার সঙ্গে নগদ ২৫ লাখ টাকাও দিচ্ছেন। এখন যদি আমি অন্তত ৫ লাখও না খরচ করি তা হোলে যে লোকে বলবে ছোট নজর।"

সপ্রশংস দৃষ্টিতে অমরেশ সেদিন মার দিকে শুধু চেয়ে ছিল।

যাই হোক, কদিন অবিরাম উৎসব ও হুল্লোড়ের পর এখন চারদিক বেশ নিঝুম লাগছে। প্রাসাদে আর তেমন সরগরম নেই আশপাশেও আর তেমন লোকজন গিসগিস করছে না। আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব অতিথি অভ্যাগত প্রায় সবাই বিদায় নিয়েছে।

এইবার হিসাব নিকাশের পালা। কর্মচারীরা উপুড় হোয়ে পড়েছে কাছারীবাড়ীতে খাতাপত্র নিয়ে। কে কি সরবরাহ করেছে, কার কতো পাওনা, কার জিনিস ভালো হয়নি বোলে টাকা কাটা যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে চলেছে লেখালেখি তর্কবিতর্ক।

পুরোন ম্যানেজার আর এখন নেই। তাঁর জায়গায় বসেছেন শ্রীকৃষ্ণবাবু। অমরেশের বিয়ের পর শ্রীকৃষ্ণবাবু জগদ্বল্লভপুর থেকে এখানে চলে এসেছেন। তার পদোন্নতি হয়েছে। জগদ্বল্লভপুরে তাঁর জায়গায় বসেছে তারই শ্যালক তাঁরই সুপারিশে। অবশ্য জগদ্বল্লভপুরের পরিস্থিতি বড় গোলমেলে বোলে এখনও মাঝে মাঝে শ্রীকৃষ্ণবাবুকে সেখানে গিয়ে দেখাশুনো করতে হচ্ছে।

এদিকে পুরোন ম্যানেজার সম্বন্ধে অনেক কিছুই শোনা যায়। তিনি স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিয়েছেন কি তাঁকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তা বাইরের কেউ জানে না। তবে নিরুপমা তাঁর টাকা শোধ কোরে বাঁধা দেওয়া মৌজাখানা খালাস কোরে নিয়েছেন

নূতন পুত্রবধূকে নিয়ে নিরুপমার আনন্দ আর ধরে না। অমরেশ যদিও মনে মনে খুঁত খুঁত করে, কিন্তু বাইরে কিছুই প্রকাশ করতে পারে না। বৌ তার দেহভরা রূপ না নিয়ে এলেও দু'হাত ভরে ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছে যে।

অমরেশের বিয়েতে সকলেই এসেছিল, আসেনি কিন্তু তার অন্তরঙ্গ বন্ধু সলিল চৌধুরী। এই দুই পরিবারের মধ্যে এত ঘনিষ্টতা সত্ত্বেও কেন যে সলিল এলো না তা এক রীতিমত বিস্ময়।

অমরেশের মা বলেন, "বোধ হয় তুই ওদের সঙ্গে হাজারিবাগ গেলি না বলেই ও এলো না। তা ছাড়া নেমন্তন্নটাও তো হয়েছে চিঠি দিয়ে। কাজেই—"

"কিন্তু মা দেখলে তো সময় পেলুম কই। প্রজারা সকল সময়েই একটা না একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে বসে আছে। জমিদারি ছেড়ে বলো যাই কি কোরে? আর নেমন্তন্নের কথা বলছো? ওরা যদি এখানে থাকতেন গিয়েই তো করতুম। কিন্তু হাজারিবাগে গিয়ে নেমন্তন্ন করা কি সম্ভব? তবে যেরকম অনুনয়বিনয় কোরে লিখেছিলুম তাতে অন্ততঃ সলিলের আসাটা উচিত ছিল।"

"আমি বলছি ওর নিশ্চয়ই অভিমান হয়েছে, তুই দেখিস।"

"না মা, ভুল বোঝবার মতো ছেলে ও নয়। বিশেষ কোরে আমাকে তো কখনোই না। জানি না অন্য কিছু হোল কিনা। একখানা চিঠিও যে কেন দিলে না! যাক, ঝামেলাটা একটু কমলে একদিন বরং গিয়েই দেখা কোরে আসি।"

কিন্তু যাবে বলে ভাবলেও যাওয়া আর তার হয় না। আজ-যাই-কাল-যাই কোরে দিন কেটে যায়।

হঠাৎ এই সময়ে একদিন তিন নম্বর মৌজা থেকে কয়েকজন চাষী এসে উপস্থিত। উপযুক্ত নজরানা দিয়ে তারা জানালো জমিদারের সঙ্গে তারা দেখা করতে চায়।

জমিদার তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেননি। কাজেই বাগানবাড়ি কাছারির দরজায় তাদের অপেক্ষা করতে বলা হোল।

অন্ততঃ ঘণ্টাদুই মাছি তাড়াবার পর তারা শুনলো জমিদার উঠেছেন, এবং তারপর আরও ঘণ্টাখানেক পরে তাদের ডাক হোল।

ভূমিষ্ঠ হোয়ে প্রণাম কোরে চাষীরা মেঝেতেই বসলো। জমিদার তখন সোফায় বোসে কুকুরকে আদর করছেন। তিনি ভ্রূক্ষেপও করলেন না কুকুরকে আদর করছেন তো আদরই করছেন।

অনেকক্ষণ পরে যেন তার হুঁস হ'ল। তিনি জিগগেস করলেন, "কি চাই তোমাদের?"

একজন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাত জোড় কোরে বললে, "খুব সৌভাগ্য হুজুর যে চরণ দর্শন পেলাম। আমরা তিন নম্বর মৌজার চাষী। হুজুরের কাছে

আমাদেব নিবেদন খালেব জলটা হুজুব বন্ধ কববেন না। ও জল চাষীবা যেমন নিচ্ছিল তেমনি তাদেব নিতে দিন। নইলে চাষ-আবাদ আমাদের নষ্ট হয়ে যাবে।'

"জল তোমবা আব পাবে না।'

"হুজুব তা'লে—"

'না, না।"

'হুজুব তা লে আমাবা মাবা যাব।

'না, না, পাবে না, যাও।'

চাষীবা যায় না।

খানিকক্ষণ নীবব থেকে অমবেশ বলে, "তাতালে আমাব বিরুদ্ধে চক্রান্ত কববে আব সামনে 'হুজুব হুজুব।' ওসব হবে না, যাও।

'হুজুব আপনাব বিরুদ্ধে চক্রান্ত কি বলছেন?'

অমবেশ ধমকে ওঠে "সেদিন দল বেঁধে তোমবা শ্রীকেষ্টবাবুকে মাবতে যাওনি?'

হুজুব মাবতে যাযনি। তিনি আমাদেবই একজনকে গাছে বেঁধে বেখে দেছলেন। তাই তাকে আমবা ছাড়াতে গেছলুম।'

শ্রীকেষ্টবাবুকে তোমবা শেষ কোবে দোব' বলে শাসাওনি?

হুজুব, ভালোমন্দ সব বকম মানিষই তো থাকে। কেউ [illegible] [illegible] [illegible] কথা কয়নি [illegible] নয় কিন্তু তাই বোলে মাবতে—'

ও একই কথা। জল পাবে না যাও।'

[illegible] আপনি যে আমাদেব মাবাপ। ছেলে যদি দোষ কবে বাপ [illegible] [illegible] দেয়

[illegible] কথা খুব শিখেছ। [illegible] তিনটি শর্তে তোমবা জল পেতে পাবো।"

[illegible] হোযে চাষীবা মুখ তুলে চাইল।

প্রথম হোল ওসব [illegible] কথা আব চলবে না।

চাষীবা কোন জবাব দিলো না।

[illegible] [illegible] তোমবা এক [illegible] মধ্যে [illegible] দিতে হবে।'

হুজুব তা কেমন কোরে হয়? সবাবই ধান [illegible]। [illegible] এইবাব [illegible] [illegible]—

'ওসব আমি শুনতে চাই না। আজ থেকে এক মাসেব মধ্যে সমস্ত [illegible] খাজনা মিটিয়ে দিতে হবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] নন্দন বোডে লোকটাব সঙ্গে তোমাদেব কোন সম্পর্ক বাখা চলবে না। [illegible] তোমাদেব ওখান থেকে তাড়াতে হবে আব না হয় তো ওব [illegible] নালিশ কবে কোর্টে দিতে হবে।'

'হুজুব, তেনাব অপবাধটা কি যে এত বড় শাস্তি—"

অমরেশের মেজাজটা তিরিক্ষে হোয়ে ওঠে। জমিদারের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া তবু নিজেকে চেপে সে বলে, "অপরাধ একটা নয়, অনেক।"

"না হুজুর, উটি পারবুনি। আপনিও যেমন আমাদের মাবাপ, তিনিও তেমনি।"

"কি? আমিও যেমন মাবাপ তিনিও তেমনি! আমার সঙ্গে তুলনা! তবে আমার কাছে আসা কেন? একেই বলে চাষীব বুদ্ধি, মাবাপ দুটো হয়!"

চাষীরা মাথা হেঁট কোরে বসে থাকে।

একটু থেমে অমরেশ বলে, "যাও, যাও সব এখান থেকে। জল পাবে না।"

"হুজুর আমাদের অবস্তাটা তাওলে কি হবে একবার—"

"কোন কথা না। হয় যা বললুম কবো, নয় এক ফোঁটাও জল পাবে না।"

"হুজুর এই কি বিচাব হোল? ও খাল তো চাষীরাই কেটেছে। চাষীরা জল পাবে না কেন?"

"এই, কে আছিস? দবোয়ানকে ডাক্‌তো, এদের এখান থেকে এক্ষুনি হটিয়ে দিক।"

দরোয়ান এলো।

লোকগুলি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। তারা খুবই আঘাত পেল। এমন দুর্ব্যবহার! কেন, তারা কি মানুষ না! তারা এসেছিল শান্তিতে, সদ্ভাবে একটা বোঝাপড়া কোরে নিতে। তাব এই উত্তব! দবোয়ান ডাকিয়ে হটিযে দেওয়া।

অপমানে ঘাড হেঁট কোবে তাবা চলতে লাগলো।

চারদিক রোদে খাঁ খাঁ কবছে। একটা দাঁড়কাক মাথাব ওপর দিয়ে ডেকে চলেছে. কা, কা, কা।

শচীনন্দন বসেছিল কৃষক সমিতিব অফিসে। বুড়ো মোড়লও বসেছিল। চাষী প্রতিনিধিরা ফিবে গিযে তাদেব সমস্ত জানালো।

ধীরভাবে সব শুনে শচীনন্দন বললে "বেশ তো আমাকে তাড়িয়ে দিলেই যদি—"

"তুমি ক্ষেপোচ শচীদা? তালে আমাদেব অবস্তা কি হবে একবাব ভেবে দ্যাকো দিকিন।" একসঙ্গে সবাই চেঁচিযেমেচিযে উঠলো।

ফোকলা মোড়ল বলে, "জমিদেরেব মতলব কি তা কি তোমরা বুয়েছ?"

একজন বোলে উঠলো "তা আব বুঝিনি? অথাৎ শচীদাকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে পারলে ব্যাস, উনি তখন আমাদেব ঘাডে আব মুণ্ডুটি রাখবেননি।"

আরেকজন যোগ দিলো "জানো শচীদা, আমাদের সঙ্গে কি দুববহারটাই না কবলে। দরোয়ান ডেকে কিনা তাড়িয়ে দিলে।"

"আমি জানতুম ভাই এ হবে। সেইজন্যেই সেদিন যখন তোমরা প্রস্তাবটা

করলে, দেখেছিলে বোধ হয় আমার এতে সায় ছিল না। তবে আমি বুঝে দেখলুম তোমরা সবাই যখন চাইছো একটা বোঝাপড়ায় আসতে, আমার বাধা দেওয়াটা উচিত হবে না। আপস-আলোচনায় যদি কিছু হয় সে তো উত্তম কথা। কিন্তু দেখলে তো ওরা সে ধাতেরই লোক নয়। গরীবকে ওরা মানুষ বোলেই জ্ঞান করে না। তাই একে ঠেঙাচ্ছে, ওকে গাছে বেঁধে রাখছে। সেবার অঘোর বান্দীর ছেলেটাকে যখন অমরেশ রায় মোটর চাপা দিয়ে মেরে ফেললো, আর সারা পাড়ার লোক ছুটে এলো রাজবাড়ী বিচারপ্রার্থী হোয়ে, রাজা নিখিলেশ রায় বন্দুক দেখিয়ে তাদের খেদিয়ে দিলে। মানুষের লাঞ্ছনার যেন শেষ নেই ওদের হাতে। এই সেদিনই দেখ না কি হোল? রঘু সামন্ত তার বৌকে নিয়ে পাল্কী কোরে আসছিল। বেচারাকে পাল্কী থেকে নামিয়ে ওঃ সে কি মার! তারই বৌয়ের সামনে! তার অপরাধ? সে রাজ-বাড়ীর সামনে দিয়ে পায়ে হেঁটে না এসে পাল্কী চড়ে আসছিল। এই আমার কথাই ধরো না কেন। আমাকে কিছুতে জড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কিনা পুলিসকে ঘুষ খাইয়ে ক'মাসের জন্যে জেল খাটিয়ে ছাড়লো।"

"এ সবের শোধ একদিন আমরা তুলবই।" দু'তিনজন বলে উঠলো।

মোড়লের নাতি বলে, "আচ্ছা, ওর বাপ না নিজের ভাইকে হত্যে করেছিল সম্পত্তির লোভে?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা শচীদা, রমানাথ ভটচায্যি বোলে সেই যে ভদ্রলোক সেদিন এলেন তাঁর খবর কি?" ভীমচন্দ্র জিগগেস করলো।

"শেষ পর্যন্ত তিলে তিলে মরলেন।"

"ইস্!"

"ও গ্রামের বাধু চক্রবর্তীর সঙ্গে সেদিন হাটে দেখা তাঁরই মুখে শুনলুম।"

"আর ওঁর মেয়ে?"

"সে তো এখন আধ-পাগলা হোয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"ওঃ!"

"ভটচায্যি মশাই অনেক আশা নিয়েই আমার কাছে এসেছিলেন। কিন্তু কিছু তো করতে পারলুম না। এমন কি শেষ সময়ে গিয়ে একবার দেখা পর্যন্ত করতে পারলুম না। অবিশ্যি আমি ভাবতেও পারিনি যে এত শীগ্‌গির মারা যাবেন।"

"জমিদেরের শ্বশুরকে তুমি এ সম্বন্ধে একখানা চিঠি দিয়েছিলে না?"

"হ্যাঁ। ভেবেছিলুম যদি কিছু হয়। কিন্তু কিছুই হোল না। ছেঁড়া-ট্যানা-পরাদের কথা ওরা কানে নেবে কেন?"

একটু থেমে শচীনন্দন আবার বলতে লাগলো, "জানো মোড়লকাকা, বড্ড খাঁটী লোক ছিল ঐ মানুষটি। নিখিলেশ রায় যখন ওকে ডেকে বললে,'তুমি যদি আমার ভায়ের হোয়ে সাক্ষ্য দাও তার পরিণাম কি হবে জানো?' ও বললে, 'জানি। আমার

চাকরী যাবে, আমায় উপোস কোরে মরতে হবে।' জমিদার বললে, 'আর যদি না দাও আমি তোমায় ম্যানেজার কোরে দোব।' ও বললে, 'হুজুর চাকরীর লোভ দেখিয়ে অধর্ম করতে বলছেন? না, তা পারবো না।' খুব কম লোকই এতোখানি সাচ্চা হোতে পারে।"

শচীনন্দনেব চোখ দিযে জল গড়িয়ে পড়লো।

সকলেই চুপ।

হঠাৎ মোড়ল বোলে ওঠে, "ওঃ! এরাই আমাদের মাথার মণি!"

খানিক পরে শচীনন্দন বললে, "হ্যাঁ, তা হোলে এখন যাও সব, নাওয়া খাওয়া কবগে, অনেক বেলা তো হোল।"

একজন জিগগেস করলো "সিদ্ধান্তটা তা'লে কি হোল?"

"সিদ্ধান্ত আব কি, জল যখন নিতে দেবে না তখন জোর কোরেই নেওয়া হবে।"

পরদিন সকালে জমিদাব সঙ্ঘের কয়েকজন তরুণ সদস্য এসে উপস্থিত হোল নওগাঁব প্রাসাদে। এরা অমরেশেব বন্ধু। সম্প্রতি অমরেশেব বিয়েতে ঘুরে গেছে। কাজেই অমরেশ খুব অবাক হোল আবাব তাদেব দেখে "আবে! এমন হঠাৎ! কি ব্যাপাব?"

খুব খাতিবযত্ন কোরেই সে তাদেব ওপবে বারাণ্ডায নিযে গিয়ে বসালো।

"তুই কিছু শুনিসনি?" যশোহবেব উৎপল বাঁড়ুয্যে বললে।

"কি বল তো?"

"সুব্রত চৌধুবী মাবা গেছেন।"

"সে কি! সে কি!"

অমরেশেব মুখচোখেব ভাব দেখে কেউ আর কিছু বলতে সাহস কবে না।

অমরেশকে সুব্রত চৌধুবী নিজেব ছেলেব মতোই ভালো বাসতেন। তাঁব স্ত্রীও। ওদিকে সলিলেব সঙ্গেও তাব বন্ধুত্ব বড় কম নয। নিজের মা ছাড়া তাব মতো হিতৈষী আব তাব কে আছে? সেই তো তাকে মাথা তুলে ওঠবার জন্যে প্রেবণা দিযেছে, তাবই উৎসাহে তো সে লাটপত্নী তথা লাট সাহেবের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছে। আবাব তাবই অনুবোধে তাব বাপ সুব্রত চৌধুরী তার রাজা খেতাবেব জন্যে পাঁচ জায়গায লেখালেখি কবেছেন। আঘাতটা লাগবাব কথা বইকি।

অনেকক্ষণ পরে সে মুখ খুললো, "কি হযেছিল?"

উৎপলই উত্তব দিলো "কবোনারি থ্রম্বোসিস।"

"এখানে থাকতেও তো একবার অ্যাটাক হযেছিল। শুনেছিলুম হাজাবীবাগ গিযে তো বেশ ভালোই ছিলেন।"

"হ্যাঁ, প্রথমে তাই ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ হোল কি, ভালো লাগছে না বোলে

বাড়ী ফিরে এলেন, তারপর তোর বিয়ের দিন আবার হঠাৎ অ্যাটাক হোল, তারপর আবার তোর বৌভাতের দিন। ব্যস, শেষ।"

"ইস্! কই তোরা তো আমার বিয়েতে এসে কিছু বলিস নি?"

"কেমন কোরে জানবো বল্? তোরও যে অবস্থা আমাদেরও তো সেই। তোর এখানে নেমন্তন্ন খেয়ে কোলকাতায় ফিরে গিয়ে সব শুনলুম।"

"কই কাগজেও তো—"

"হ্যাঁ, কাগজে খুব বড় বড় কোরেই বেরিয়েছিল। তোর চোখে হয়তো পড়েনি।"

"তা হবে। এ ক'দিন কাগজ পড়বার তেমন সময়ই পাইনি। তবে স্কুলের মাস্টারমশাইরা তো নিয়মিত পড়েন, তাঁরা তো কই--"

"হয়তো তাঁদেরও চোখে পড়েনি।"

"তা হবে। এখন বুঝতে পারছি কেন সলিল আমার বিয়েতে এলো না। আমি অবশ্য এ ক'দিন কেবলই ভাবছিলুম আজ যাই কাল যাই কিন্তু কিছুতেই আর সময় কোরে উঠতে পারছিলুম না। যাক, আর নয় এক্ষুনি আমায় গিয়ে একবার ওদের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"বেশ তো, আমাদের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়্।"

"হ্যাঁ, সেই ভালো। তোরা তো আজ থাকছিস। চল্, কাল সকালেই -"

"কেন, আজ?"

"আজ?"

"ও, বুঝেছি। এখন তো আর তুই নিজের ইচ্ছেয় চলতে পারবি না, অর্ধাঙ্গিনীর মত চাই।"

"না, তা ঠিক নয়। অন্য কাজকর্ম—"

"অন্য কাজকর্ম? ও তো অছিলা।" সকলে হো হো কোরে হেসে উঠলো। "তা বেশ, তুই না হয় কাল যাস। আমাদের কিন্তু ভাই আজই ফিরতে হবে। কিন্তু ওকি, উঠছিস কেন?"

"খবরটা মাকে দিয়ে আসি। মণ্টু যে ক'দিন ধোবে বড্ড উদ্বিগ্ন হোয়ে রয়েছেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা। ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা তো তোদের বড় কম না।"

গিরীন বললে, "কিন্তু ভাই একটু তাড়াতাড়ি আসিস। আরও অনেক আলোচনা আছে।"

"না, না, আমি বেশী সময় নোব না।"

খানিকক্ষণ পরেই অমরেশ ফিরে এলো। চা এলো। 'টাও' এলো। সিগারেট ও চুরুটের গন্ধে সারা বারাণ্ডা ভরে গেল।

অমরেশ জিগগেস করলো, "কি যেন আলোচনা আছে বলছিলি না?"

গিরীন · "বলছি। তার আগে তুই এই কাগজখানায় একটা সই দে।"

"কি ব্যাপার?"

"পড়্ না, তা হোলেই বুঝতে পারবি।"

অমরেশ পড়তে লাগলো। পড়া শেষ হোলে বললে, "এ তো দেখছি তোদের জমিদার সঙ্ঘের ব্যাপার—সেক্রেটারির ওপর অনাস্থা প্রস্তাব!"

"হ্যাঁ। বর্তমান সেক্রেটারিকে আমরা সরাতে চাই।"

"ওতে ভাই আমি নেই।"

"কেন?"

"ওতে কি লাভ? যেই গিয়ে ওখানে বসুক না কেন—"

"কি যে বলিস? সঙ্ঘের সঙ্গে তুই কোন সম্পর্ক রাখতে চাস না বোলেই এমন কোরে কথা বলছিস। মনে কোরে দ্যাখ্ দিকি গত অ্যানিভার্সারিতে ও তোর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছিল?"

"ও সেই জন্যে! তা হোলে তো তখনই অনাস্থা প্রস্তাব আনা উচিত ছিল।"

"না, আরও কারণ আছে।"

নাড়াজোলের পূর্ণেন্দু শাসমল এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। এইবার সে যোগ দিল "ব্যাপার কি একটা মাত্র অন্যায় করলে তো কারও ওপর চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।"

"বেশ। আর কি দোষ শুনি।" বাঁ হাতে সিগারেটটা ধোরে ডান হাত দিয়ে কুকুরটাকে আদর করতে করতে অমরেশ বলে।

"বলছি। কিন্তু তার আগে একটা কথা তোকে বলতে চাই বাবা," উৎপল বললে। "তুই মনে হচ্ছে বিশ্বাস করছিস না যে সেদিন তোর সঙ্গে সেক্রেটারির ওরকম ব্যবহারে আমরা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম।"

"তা না হয় হোল এবং আমি তা বিশ্বাসও করছি। তারপর?"

"তারপর এই সুব্রত চৌধুরীর ব্যাপারটাই ধর্ না। সাধারণ সভায় প্রস্তাব নেওয়া হোল সুব্রত চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় তাঁকে উপযুক্তভাবে সম্বর্ধনা জানানো হবে। কিন্তু সেক্রেটারি করলেন কি অনুষ্ঠানের তারিখ কেবলই পিছোতে পিছোতে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিলেন। ফল হোল এই যে সম্বর্ধনা আর তাঁকে দেওয়াই হোল না।"

পূর্ণেন্দু বোলে উঠলো "আমাদের দিক থেকে এ কি কম আফসোসের কথা! কোনো প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি এমন করে?"

"এতে শুধু যে সুব্রত চৌধুরীকেই তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হোল তা না, জমিদার সঙ্ঘকেও খেলো করা হয়েছে।" গিরীন বললে। গিরীন আরও বলতে লাগলো, "লোকে বলছে জমিদার সঙ্ঘ এমন যে ভদ্রলোককে একটা সম্বর্ধনা

পর্যন্ত দিয়ে উঠতে পারলো না। একখানা দৈনিক পত্রিকা তো এ নিয়ে আমাদের বেশ এক হাত নিয়েছে।"

"সত্যিই এটা বড্ডই আফসোসের কথা।" অমরেশ স্বীকার করলো।

"উৎপল· "আরও আফসোসের কথা কি জানিস? মেম্বারদের উদাসীনতা। মেম্বাররা সকলেই যদি বেশ সজাগ থাকে তা হোলে কোন এক ব্যক্তি, তা তার হাতে যত কর্তৃত্বই থাকুক, এমন করতে পারে না।"

অমরেশ চুপ কোরে থাকে।

উৎপল বলে, "কি? মানিস কি না?"

"তা ঠিক। তবে আমি ভাবছি অন্য কথা। ওর এতে কি স্বার্থ? কেন ও ওভাবে এটাকে ঠেকিয়ে রাখলো?"

"লোকটার প্রকৃতিই ঐ রকম। সেবার বর্ধমানের মহারাজা যখন 'সি-আই-ই' পেলেন তখনও এইরকম করেছিল। এই তোর ব্যাপারটাই ধর্ না। জানিস ও তোর বিরুদ্ধে কি লাগিয়েছে গভর্নমেণ্টের কাছে?"

"কি?"

"তুই রাজা খেতাব পাবার অযোগ্য।"

"হ্যাঁ?"

"হ্যাঁ।"

"লোকটা তো দেখছি ভয়ানক কুচক্রী!"

"সেই জন্যেই তো ওকে আমরা সরাতে চাইছি।"

"কিন্তু কেমন কোরে জানলি ও আমার বিরুদ্ধে ঐসব লাগিয়েছে?"

"লাটসাহেবের স্ত্রী সম্প্রতি সলিল চৌধুরীকে যে চিঠি লিখেছেন তাতে তিনি জানিয়েছেন। চিঠিখানা সলিল ওর বাপ মারা যাবার কয়েকদিন আগে পেয়েছে।"

"বটে?"

"হ্যাঁ। লাটসাহেবের স্ত্রী দুঃখ কোরে জানিয়েছেন ও নাকি গভর্নমেণ্টকে লিখেছে তুই হচ্ছিস একজন তৃতীয় শ্রেণীর জমিদার—কাজেই 'রাজা' খেতাব পাবার অনুপযুক্ত। অবশ্য এও লিখেছে যে নিখিলেশ রায়ের কথা স্বতন্ত্র, কেননা তিনি সরকারকে যুদ্ধের সময়ে অনেক টাকা তুলে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু তোকে নাকি এ সম্মান দিলে খেতাবেরই অসম্মান হবে।"

হঠাৎ এই সময়ে নীচে একটা গোলমাল শোনা গেল।

"কি হোল? কি হোল?" বলতে বলতে সকলে বারান্ডার ধারে এসে দাঁড়ালো। দেখলো এক তরুণী একটি ছোট্ট শিশু কোলে নিয়ে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ ওপরে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার বেশ মলিন দেহ ধুলোয় ভরা। কিন্তু কি নরম পুরুষ্টু দেহ! কি রঙ! কি মুখশ্রী! রাজরাজড়ার ঘরের মেয়েদেরও হার মানিয়ে দেয়।

তরুণীর কাছ থেকে এক ধাপ পেরিয়ে দুহাতে পথরোধ কোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ।।কজন চাকর। নীচে জমেছে মেলাই লোক।

তরুণী ওপরে উঠতে চাইছে, চাকর তাকে বাধা দিচ্ছে।

আর সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে অমরেশও দেখতে লাগলো। চোখ ঘোরাতেই সে দেখতে পেল সেই ভিড়ের মধ্যে রুক্ষ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার মা আর তাঁর কয়েক হাত দূরে তার নবপরিণীতা স্ত্রী, তারও মুখেচোখে দারুণ বিরক্তির ভাব।

পরক্ষণেই অমরেশের কানে এলো মার গলা, "তাড়াতাড়ি পাগলীটাকে নাবিয়ে নিয়ে এসো হরিচরণ।"

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, "কি বলছো? পাগলী? আমায় পাগলী বলছো? কিন্তু আমায় পাগলী করেছে কে?" তারপর হঠাৎ ওপর দিকে চাইতে গিয়ে অমরেশকে দেখতে পেয়ে তার দিকে আঙুল তুলে চিৎকার কোরে উঠলো, "ওই, ওই তোমার ছেলে। ওই আমার এ সর্বনাশ করেছে। জিগ্গেস করো ওকে আমার কোলে এ কার ছেলে?"

অমরেশ চেয়ে দেখে তার মা উত্তেজনায় কাঁপছে, তার স্ত্রীর মুখ রাঙা হোয়ে উঠেছে। পাশে বন্ধুরা মনে হচ্ছে যেন বেশ মজাই উপভোগ করছে। নীচে চাকর-বাকররাও। সবাই যেন পাগলীটার কথা বিশ্বাস কোরে ফেলেছে, সবাই যেন তাকে অপরাধী সাব্যস্ত কোরে ছি ছি করছে।

তার মাথা হেঁট হোয়ে গেল। এতো লজ্জা তাকে এর আগে কেউ কখনো দেয়নি।

পরক্ষণেই কিন্তু নিজেকে সে খুঁজে পেল। তার ভয়ানক রাগ হোল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে চিৎকার কোরে উঠলো, "এই হরিচরণ, এ কি খেলা হচ্ছে তোমাদের?"

"হুজুর, দেখুন না, কিছুতেই ছুঁড়িটাকে নাবিয়ে নিয়ে যেতে পারছি না।"

"নড়াটা ধোরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও পাগলীটাকে।"

"অ্যাঁ? অ্যাঁ? কি বললে? তুমিও ঐ কথা বললে? বলতে পারলে? একদিন না এই পাগলীটাকেই বাড়ী বয়ে গিয়ে কত—"

অমরেশ চেয়ে দেখলো সে বলছে আর সবাই অমরেশের দিকে হাঁ কোরে চেয়ে রয়েছে। এ কি অসহায় অবস্থা! এতগুলো লোক ঠায় কি দাঁড়িয়েই থাকবে আর ঐ মেয়েটা এমনি কোরে তাদের সামনে তাকে যাচ্ছেতাই করবে!

তার বলা শেষ না হোতেই সে রাগে ফেটে পড়লো "এখনও দেরী করছো তোমরা? হয় এক্ষুনি ও আপদটাকে দূর কোরে দাও, না হয় তোমরাই দূর হোয়ে যাও। কোথা গেল দরোয়ান?"

দরোয়ান নতুন লোক, হালে বাহাল হয়েছে পুরোন দরোয়ান দেবনন্দন পাণ্ডের জায়গায়, পাণ্ডে থাকে এখন জগদ্বল্লভপুর।

এ বেচারি এখনও জমিদারবাড়ীর আদবকায়দায় ঠিকমতো রপ্ত হোয়ে উঠতে পারেনি। কাজেই কি করা উচিত স্থির করতে না পেরে সে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এতক্ষণ দেখছিল। মনিবের হুকুম পেয়ে এইবার সে ছুটে এল।

"এই জল্দি উতার আ, আ জল্দি," লাঠি ঠুকতে ঠুকতে সে বলে।

তবু পাগলী নড়ে না।

ওদিকে হরিচরণও আর নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। মনিবকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে সেও ধমকে ওঠে, "নাব্ বলছি পাগলী, নাব্ শীগগির, নইলে এক্ষুনি ধাক্কা মেরে ফেলে দোব।"

সত্যিই সে ধাক্কা মারলো। পাগলী দুতিন ধাপ ঠিকরে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বোলে উঠলো "অ্যাঁ! গায়ে হাত দিলি? মেয়েছেলে বোলে মানলি না? গায়ে হাত দিলি?"

"ঠিক হুয়া হ্যায়। আভি বাহার চলো।" বলতে বলতে দরোয়ানও তাকে ঠেলা দিল।

"একি! একি! তোমরা শুধু দাঁড়িয়েই থাকবে? কিছু বলবে না?" মেয়েদের দিকে চেয়ে পাগলী বলতে লাগলো।

শেষে কিন্তু তাকে পরাজয়ই স্বীকার করতে হোল। দরোয়ান তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

যেতে যেতে সে চেঁচাতে লাগলো, "মেয়েমানুষের ওপর এমনি অত্যাচার! কেউই দেখবার নেই! মেয়েমানুষ হোয়ে তোমরাও কিছু বললে না? হা নারায়ণ!"

দরোয়ান তাকে গেটের বার কোরে দিয়ে গেট বন্ধ কোরে দিল।

কিছুক্ষণ কেটে গেছে। বন্ধুদের সঙ্গে অমরেশ আবার আলোচনায় ফিরে এসেছে।

উৎপল বলে, "হ্যাঁ তাহোলে?"

অমরেশকে কোন উত্তর দিতে না দেখে পূর্ণেন্দু মন্তব্য করলো, "মনে হচ্ছে পাগলীটা তোকে খুব অন্যমনস্ক কোরে দিয়ে গেছে।"

"দূর! ঝেড়ে ফেলে দে। ও অমন কত হয়।" উৎপল বললে।

"আমার মনে হয় দোষ দরোয়ানেরই। ও ঠিক নজর রাখেনি বোলেই পাগলীটা ঢুকতে পেরেছিল।" গিরীন মন্তব্য করলো।

"দরোয়ানকে একটু কড়কে দেওয়া উচিত।" বললে পূর্ণেন্দু।

"পরে সময়মতো দিসখন। এখন আয় আলোচনাটা সেরে নি।"

তবু অমরেশ অমনোযোগী। উৎপল বলে, "নাঃ, তুই ব্যাপারটা ভুলতে পারছিস না দেখছি। অত সেণ্টিমেণ্ট্যাল হোলে কি চলে? নে, অনাস্থা প্রস্তাবটায় সই কর্ দিকি।"

অমরেশ কাগজখানা নিয়ে সই করতে লাগলো।

"তোর আপত্তি নেই তো?" উৎপল জিগগেস করলো।

"আপত্তি? না, না, অবাঞ্ছিত লোকদের নিশ্চয়ই সরানো দরকার।"

"ঠিক। ঠিক।" ওরা সবাই একসঙ্গে বোলে উঠলো।

"আচ্ছা, এখন প্রশ্ন নতুন সেক্রেটারি কে হবে?" উৎপল ধীরভাবে বললে।

"সকলে যাকে করবে।"

"সকলে তোকে করবে বোলে ঠিক করেছে।"

"দূর! সে কি হয়?"

"কেন?"

"তার চেয়ে সলিলকে কর্। ও সব দিক দিয়েই উপযুক্ত।"

"কিন্তু ও রাজী নয়।"

"কেন?"

"প্রথমত ও খুব শোক পেয়েছে। এখন কোন কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। দ্বিতীয়ত হয়তো শীগগিরই বছর খানেকের জন্যে ও বিদেশে পাড়ি দেবে। তৃতীয়ত ওরই বাবার ব্যাপার নিয়ে যখন বর্তমান সেক্রেটারিকে সরানো হচ্ছে, ও নিজেই যদি সে জায়গায় সেক্রেটারি হোয়ে বসে পাঁচটা কথা হোতে পারে।"

"তা ঠিক।"

"ওই তো তোর কথা বললে।"

"আমার দ্বারা ভাই ও হবে না। তার চেয়ে বরং তোদের মধ্যে থেকে কেউ হ।"

"আমাদেরও যে অসুবিধে আছে। অসুবিধেটা আর কিছু না—আমরা তিন জনে শীগগিরই একটা ব্যবসায়ে জড়িত হচ্ছি। কাজেই সময় পাবো না।"

"কিন্তু তোর হোতে আপত্তি কি?" গিরীন প্রশ্ন করলো।

"আপত্তি এই যে আমার চেয়েও তো যোগ্য ব্যক্তি অনেক রয়েছে।"

"ও কথা ছেড়ে দে।" পূর্ণেন্দু যোগ দিল। "এতে এমন কিছু বিশেষ যোগ্যতার দরকার নেই। আর লোকও যে মিলবে না তাও না—বুড়োদের মধ্যে তো অনেকে মুখ উঁচিয়েই বসে আছে। তবে আমরা চাই আমাদের ছেলেছোকরাদের ভেতর থেকে কেউ যাতে হয়, কেননা জমিদার সম্বন্ধে আমাদের কোন কথাই খাটে না, বুড়োরা আমাদের গ্রাহ্যই করে না।"

"তা ছাড়া আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থও তো রয়েছে।" বললে উৎপল।

"যেমন?"

"যেমন ধর্ না সেক্রেটারি যদি আমাদের নিজেদের লোক হয় আর আমরা যদি ব্যবসায়ে নাবি, সে দিক দিয়েও আমাদের অনেক সুযোগসুবিধে হতে পারে। তারপর এই তোর নিজের কথাই ধর্ না। সরকারের চোখে তোর দামও কি তখন বড় কম বেড়ে যাবে? তুই তা নিজের কাজেও লাগাতে পারবি।"

অমরেশ চুপ কোরে থাকে।

"কি ভাবছিস?"

"ঠিক আছে।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ রাজী।"

"হুররে! হুররে!" আনন্দে উৎফুল্ল হোয়ে বন্ধুরা চেঁচিয়ে উঠলো।

হর্ষধ্বনি থামলে উৎপল বলে, "কিন্তু তোকে ভাই তা হোলে দু'চারদিন কলকাতায় গিযে থাকতে হবে এই ধর্ পরশু তো শোকসভা—"

'শোকসভায় তুই নিশ্চয়ই আসছিস?' পূর্ণেন্দু জিগগেস করলো।

"নিশ্চযই। তবে তার আগে আমায় একবার সলিলদেব বাড়ী ঘুরে আসতে হবে।"

"সে তো বটেই, সে তো বটেই।"গিবীন বলে।

পূর্ণেন্দু "শোকসভা কোথায হচ্ছে জানিস তো?"

"না।"

"অ্যালবার্ট হলে।"

"ঠিক আছে।"

"তা হোলে শোন্," উৎপল শুরু কবলো। "শোকসভাব পব দিনই আমবা ইণ্ডিযান এসোসিযেশন হলে বর্তমান সেক্রেটারির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনবাব জন্যে সভা ডাকছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা বেশী ভোট পাবই। এখন কথা হচ্ছে, তাবপরই প্রশ্ন আসবে নতুন সেক্রেটাবিব নাম প্রস্তাবেব। কাজেই তোব সেই সভায উপস্থিত থাকা খুবই প্রযোজন।"

"ঠিক আছে। কিন্তু প্রস্তাব যে গৃহীত হবেই এমন নিশ্চয়তা—"

"হবেই। জমি তৈরী না কোবে কি আমরা তোর কাছে এসেছি?"

একজন চাকর এই সময় এসে খবব দিল রানীমা অমবেশকে অন্দব মহলে ডাকছেন, একটু তাড়াতাড়ি।

বন্ধুরা বললে, "তা হোলে আমরা উঠি।"

"ক্ষেপেছিস সব? আজ থাক্, বিশ্রাম কর্। কাল সকালেই সকলে এক-সঙ্গে যাওয়া যাবে।"

উৎপল · "না ভাই, তা হোলে সমস্তই পণ্ড হোয়ে যাবে। এখন আমাদেব কাছে প্রত্যেক মুহূর্তটাই মূল্যবান। এখনও কি কম ঘোরাঘুরি কবতে হবে!"

"কিন্তু মা শুনলে—"

"মাকে একটু বুঝিয়ে বলিস।"

গিবীন · "তা ছাড়া মা যদি শোনেন তাঁব ছেলেকে জমিদাব সঙ্ঘের সেক্রেটারি করবো বোলে আমরা ছোটাছুটি কবছি তিনি কিছু মনে করবেন না। হো হো হো।"

সকলেই হাসিতে যোগ দিল।

"তা হোলে ভাই উঠি। তুই কিন্তু কাল ঠিক রওনা হোস। আর কলকাতায় পৌঁছেই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিস। কোনরকমেই যেন ফেল করিস নি।"

"না না। কিন্তু এখন কি ট্রেন পাবি?"

"ট্রেন ক'টায়?"

"পৌনে ছটায়।"

হাতঘড়িটা দেখতে দেখতে "ওরে বাবা! আর বাইশ মিনিট মাত্র বাকী।"

"হোতে পারে যদি এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া যায়," গিরীন বললে।

"কেন যাবে না? চ!"

অমরেশ ড্রাইভারকে ডেকে হুকুম করলো তারা নীচে পৌঁছবামাত্র যেন গাড়ী তৈরী হয়।

ছুটতে ছুটতে সকলে নেমে গেল।

অমরেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মোটরের দরজাটা খুলে এক পাশে দাঁড়ালো। বন্ধুরা হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়লো।

"ট্রেন যেমন কোরেই হোক ধরিয়ে দেওয়া চাই," অমরেশ ড্রাইভারকে হুকুম করলো।

গাড়ী ছেড়ে দিল।

"তা হোলে ঠিক আসছিস, দেখিস যেন কোন রকমেই না—"

বলতে বলতে তারা অনেক দূরে চলে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমরেশ ভাবে · সত্যিই তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। না হোলে এমন অযাচিত ভাবে একটার পর একটা অবশ্য হ্যাঁ, রাজা খেতাবের জন্যে তাকে খুব উচ্চ মূল্যই দিতে হয়েছে। তা হোক। তার বাবাকেও তো দিতে হয়েছিল, কিন্তু দিয়েই বা কটা লোক পায়? হ্যাঁ, ওরা ঠিকই বলেছে, এখন ঐ সেক্রেটারিকে সরাতে না পারলে—

তার চিন্তায় বাধা পড়লো, চাকর আবার এসে জানালো রানীমা একটু তাড়াতাড়িই যেতে বলছেন।

অন্দরে পা দিতেই সে লক্ষ্য করলো কেমন একটা থমথমে ভাব। নিজের ঘরে ঢুকে দেখে স্ত্রী বিছানায় শুয়ে। মা তার শিয়রে বোসে মাথায় হাওয়া করছেন আর হেমা জলহাত বুলিয়ে দিচ্ছে পায়ে। আরও দু'তিনজন ঝি এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে।

"কি হয়েছে মা? কি ব্যাপার?" সে জিগগেস করে।

"বৌমার শরীরটা বাবা হঠাৎ খুব খারাপ হয়েছে। ঘন ঘন ফিট হচ্ছে।"

"কখন থেকে এমন হয়েছে?"

"সেই পাগলীটা চলে যাওয়ার পর থেকে।"

"তা ডাক্তার ডাকতে পাঠাওনি কেন?"

"কবিরাজমশাইকে ডাকিয়েছি। ডাক্তারে এসব অসুখে তেমন সুবিধে করতে পারে না।"

অমরেশ কি যেন ভাবে। তা হোলে কি তার স্ত্রী পাগলীটার কথাটা সত্যি বোলেই বিশ্বাস কোরে নিয়েছে? মার কথাতেও যেন কেমন একটা ইঙ্গিত রয়েছে। ঝিরাও তার মুখের দিকে কেমন যেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইছে। তা হোলে কি হেমা কিছু ফাস কোরে দিয়েছে? একমাত্র সেই তো এসব জানে। কিন্তু সে কি তা করবে? তাকে তো রীতিমতোই সাবধান কোরে দেওয়া আছে যেন সে ঘুণাক্ষরেও এসব কথা কারও কাছে না প্রকাশ করে।

পরিবেশটা তার খুবই অস্বস্তিকর বোধ হয়। তার থাকতে ভালো লাগে না। বলে "আমায় কি তা হোলে আর মা দরকার আছে?"

"তোর তো একটু থাকা দরকার। সেই জন্যেই তো ডেকেছি। কেন, বন্ধুরা কি- "

"না, ওরা সব চলে গেছে।"

"সেকি! আমি তোকে ডাকলুম বোলে?"

"না, না। ওদের অন্য কাজ আছে। ওরা এসেছিল আমাকে জমিদার সঙ্ঘের সেক্রেটারি করবে বোলে।"

"তাই নাকি?"

এমন সময়ে বধূমাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। মনে হোল যেন তার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করবার জন্যেই। সঙ্গে সঙ্গে বৌয়ের হাতের মুঠোও গেল খুলে।

"ওই, ওই, জ্ঞান হয়েছে" নিরুপমা বোলে উঠলেন। তারপর তাড়াতাড়ি ঝির হাত থেকে ফীডিং কাপটা নিয়ে তার মুখের কাছে ধোরে বললেন, "একটু গরম দুধ খাও তো বৌমা।"

বৌ মাথা নাড়লো।

"কেন?"

সে আবার মাথা নেড়ে জানালো তার খেতে ইচ্ছে নেই।

"এখন কি কষ্ট হচ্ছে মা?" নিরুপমা জিগগেস করলেন।

বৌমা কিছুই বলে না। তার চোখ দিয়ে শুধু কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। খানিক পরে আস্তে আস্তে সে বলে "আমি বাবার কাছে যাব।"

অমরেশ "সে হবেখন। এখন দুধটা তো খেয়ে ফেলো।"

সে চুপ কোরে থাকে।

নিরুপমা বলেন, "শুনলে তো বৌমা অমরেশ কি বলছে?"

ধীরে ধীরে রোগিণী আবার আগেকার মতো আচ্ছন্ন হোয়ে পড়লো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কবিরাজ এসে উপস্থিত হলেন—জমিদারবাড়ীর মাইনে করা কবিরাজ রামকমল সেন। খুবই বয়স হয়েছে, পাল্কী ছাড়া চলতে পারেন না। সারা জেলায় এতোবড় কবিরাজ আর নেই।

নাড়ী পরীক্ষা কোরে তিনি বললেন, "ভয় নেই। ওষুধ দিচ্ছি, দু পুরিয়া খেলেই সেরে যাবে।" তারপর অনুপান ও পথ্যের ব্যবস্থা দিয়ে কবিরাজ বিদায় নিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওষুধ এসে পড়লো। ওষুধের সত্যিই গুণ আছে। আধ ঘণ্টাও গেল না রুগী চাঙ্গা হোয়ে উঠলো।

কিন্তু তার বায়না গেল না, কেবলই সে বলতে থাকে, "আমি বাবার কাছে যাব।"

রাত্রে শোবার সময়ে তাকে একান্তে পেয়ে অমরেশ জিগগেস করে, "কি তোমার হঠাৎ হোল বলতো?"

"আমার আর এখানে থাকতে ভালো লাগছে না।"

"কেন?"

ইন্দিরা চুপ কোরে থাকে।

"বলো লক্ষ্মীটি।"

"তুমি ঐ মেয়েটার অমন সর্বনাশ করলে কেন?"

"ও এই! তুমি তা হোলে দেখছি ঐ পাগলীটার কথা বিশ্বাস কোরে ফেলেছ?"

"হ্যাঁ।"

"হা-হা-হা। পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়? পাগলের কথা মানুষে বিশ্বাস করে?"

ইন্দিরা জবাব দেয় না।

"না, না, ও নিয়ে মাথা গরম কোর না। ও সব মিথ্যে।"

"না, মিথ্যে নয়।"

"এ বড় বাড়াবাড়ি ইন্দিরা। পাগলের কথা মিথ্যে নয় মিথ্যে আমার কথা?"

"ওকে পাগল করেছ তো তুমি।"

অমরেশ চমকে ওঠে। এমন জোর দিয়ে কথা ও বলতে পারছে কি কোরে? তবে কি পাগলীটার কাছ থেকে ছাড়া আর কারও কাছ থেকে ও কিছু শুনেছে? উঠে বসে সে বলে, "তুমি কি পাগলীটার কথা শুনেই ইন্দিরা এসব বলছো?"

"আমি অনেকের কাছ থেকেই শুনেছি, অনেক দিন আগেই শুনেছি।"

"বেশ, কার কার কাছ থেকে শুনেছ নাম করো।"

"হ্যাঁ, তারপর তুমি তাদের ওপর অত্যাচার করো!"

অমরেশ সবিস্ময়ে স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকে।

ইন্দিরা বলে, "সত্যিই বলতো তুমি কি ঐ মেয়েটাকে মিথ্যে প্রলোভনে ভুলিয়ে ওর সতীত্ব নষ্ট করোনি? ওর সন্তানের জন্মদাতা কি তুমি নও?"

অমরেশ জবাব দিতে পারে না। কে যেন তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে গেছে। আর কত সে গোপন করবে? আর কত মিথ্যে বলবে? জিনিসটা দেখা যাচ্ছে এখন খুবই জানাজানি হোয়ে গেছে। আগে বাইরেই যা কিছুটা কানাকানি হোত। পরে মা অবশ্য কিছুটা টের পায়। বিয়ের আগে শ্বশুরবাড়ীতেও উড়ো চিঠি গিয়েছিল। কিন্তু এভাবে কোনদিন তাকে কারও প্রশ্নের সম্মুখীন হোতে হয়নি। আর মার কাছে যদিও সময়ে সময়ে কিছুটা লজ্জায় পড়তে হয়েছে কিন্তু সে কিছু না। তার সব চেয়ে ভয় ছিল নবপরিণীতা স্ত্রীকে। সে যদি জানতে পারে তা হোলে আর লজ্জার সীমা থাকবে না।

অ্যাঁ! শেষ পর্যন্ত কিনা তাই হোল?

তা হোলে দেখা যাচ্ছে এ হেমারই কাজ, ওই সকল সময়ে তার কাছে থাকে।

"কি হোল? উত্তর দাও।" হঠাৎ স্ত্রী দাবি করে।

একি ঔদ্ধত্য! তার সঙ্গে সে এমনি কোরে কথা কইবে? অমরেশের রক্ত গরম হোয়ে ওঠে "কারও কাছে উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।"

"হ্যাঁ বাধ্য। আমার কাছে। আমি তোমার বিয়ে করা বৌ।"

অমরেশ আর রাগ চেপে রাখতে পারে না। ঝাঁঝিয়ে ওঠে "বটে! কিন্তু বিয়ে করেছি সে তো দয়া কোরে।"

"না। দয়া কোরে নয়।"

"তবে?"

"সম্পত্তির লোভে।"

"কি বললে?"

"সম্পত্তির লোভে।"

হঠাৎ তারা যেন বুঝতে পারে তারা রাগের মাথায় যা-তা বোলে বসছে। আর তারা এগোয় না।

অমরেশের মনটা আজ খুব খারাপ। কেন যে কাল রাত্রে সে স্ত্রীর সঙ্গে ওভাবে ঝগড়া করতে গেল।

ওদিকে ভোর থেকে সমানে টিপ টিপ কোরে বৃষ্টি। আকাশের গায়ে কে যেন এক পিপে কালি ঢেলে দিয়েছে। গাছপালাগুলোও বিমর্ষ। মনে হচ্ছে যেন ওদেরও মন খারাপ।

স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে তারপর থেকে অমরেশের আর কথা হয়নি। অমরেশ

দু'একবার তার দিকে তাকিয়েছিল কিন্তু অপর পক্ষের কোন আগ্রহ লক্ষ্য না কোরে সে পিছিয়ে আসে। মাও যেন সকাল থেকেই পুজো ইত্যাদি নিয়ে একটু বেশীরকমই ব্যস্ত।

সত্যিই কিছু আর ভালো লাগছে না অমরেশের। এমন কি আজ সকালের ট্রেনে সলিলদের বাড়ী যাবার কথা বার বার মনে হওয়া সত্ত্বেও যেন যেতে গা আসছে না। আবার শুধু ওখানেই তো নয়। সুব্রত চৌধুরীর শোকসভায়ও যেতে হবে। তারপর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে অনাস্থা প্রস্তাবের সভাতেও।

কিন্তু ঐ পাগলীটার কথা নিয়ে ইন্দিরা যে ব্যবহার কবলো! অতটা করা কি তার উচিত হয়েছে? এ আর এমন কি ব্যাপার যে এই নিয়ে ঝি, চাকর, মা সকলের সামনে এতোটা বাড়াবাড়ি করতে হবে! অবশ্য তার মনে যে এ প্রতিক্রিয়া একদিনেই এসেছে অথবা ঐ পাগলীটার কথাতেই এসেছে তা নয়। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তাকে লাগিয়েছে। নিশ্চয় হেমাই লাগিয়েছে।

হঠাৎ এই সময়ে অমরেশ দেখতে পেল হেমা খানকতক বই নিয়ে ইন্দিরার ঘরের দিকে যাচ্ছে। ইন্দিরা বই পড়তে ভালবাসে।

অমরেশ তাকে ডাকে।

"তুমি কি হেমা রমানাথ ভটচায্যির মেয়ের সম্বন্ধে ইন্দিরাকে কিছু বলেছ?"

"না তো।" মাথা হেঁট কোরে হেমা উত্তর দেয়।

"তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে আমি তোমায় অনেক কোরে বারণ কোরে দিয়ে-ছিলুম—"

"আজ্ঞে আমি তো কিছুই বলিনি।"

"ঠিক বলছো?"

"হ্যাঁ।"

"আর কেউ লাগিয়েছে বোলে শুনেছ?"

"না।"

"আচ্ছা যাও। আমি তদন্ত কোবে দেখছি। তবে যেই করুক আমি তার রক্ষে রাখবো না।"

"কেন আপনি অমন কোরে বলছেন? আমি কি কখনো আপনার কোনও কথা কাউকে বলেছি?"

"আমাব আবার আর কি কথা?"

"স্মরণ কোবে দেখুন এক সময়ে আমাকে নিয়েও আপনি কি রকম টানাটানি করেছেন?"

"করেছি। নেশার ঝোঁকে।"

"কোরেছেন তো? কিন্তু আপনি না আমাদের জমিদার? আপনার কাছে আমরা কি আশা করি? আপনি আমাদের রক্ষে করবেন, এই না?"

"তুমি কি আমার কাছ থেকে তার বদলে কিছু পাওনি? তোমার নামে যে দশ বিঘে জমি আমি বন্দোবস্ত কোরে দিয়েছি তা কি কিছু না?"

"হ্যাঁ, যথেষ্ট। সেজন্যে আমি আপনার কাছে কিতজ্ঞ। সেজন্যে আমায় আর পাঁচজনে হিংসেও করে। কিন্তু বলুন তো ঐ ভটচাযিমশায়ের মেয়েটার কি হাল করলেন?"

"ওকেও তো আমি বলেছিলুম 'কলকাতায় থাকো, আমি ব্যবস্থা কোরে দিচ্ছি।'"

"কিন্তু কথা তো তা নয়। ওকে কলঙ্কিনী করলেন কেন? একটা নিরীহ মেয়েকে আশা দিয়ে তার সন্তানের জন্মদাতা হোয়ে তাকে আজ পথে বসালেন কি দোষে? কিন্তু আর না, ঐ ম্যানেজারবাবু আসছেন। আমি যাই, আমায় যেতে অনুমতি দিন।"

"যাও।"

ম্যানেজারবাবু এলেন—নতুন ম্যানেজারবাবু। হেমা চলে গেল।

"কি খবর শ্রীকেষ্টবাবু? এতো সকালে?"

"আজ্ঞে গোবিন্দপুরের ব্যাপারটা—"

"আঃ কেবল আপনার গোবিন্দপুর আর গোবিন্দপুর। আব ভাল লাগে না।"

"আজ্ঞে ব্যাপারটা যে আর ঠেকানো যাচ্ছে না, ক্রমে বড্ডই ঘোরালো হোয়ে উঠেছে। ওরা এখন রোজই মীটিং করছে। কাল প্রায় হাজাব পাঁচছয় লোক মীটিং করে গেছে সোনারপুরে। কাল নাকি লাঠি টাঙি বল্লম এই সব নিযে একেবারে সেজে-গুজে এসেছিল।"

"কেন? মতলব কি?"

"মতলব খারাপ। ওদের নেতা ঐ শচী সামন্ত ওদের বলেছে ময়নামতী খালের জল চাষীদেরই, কাজেই তাদের এ অধিকাবে বাধা ওরা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।"

"বটে! এতো বড় স্পর্ধা! আচ্ছা। কিন্তু নাঃ, আপনাদেব কারও দ্বারা কিচ্ছু হবে না।"

"হুজুর, আমি তো—"

শ্রীকৃষ্ণবাবু এখন আর গোমস্তা নন, ম্যানেজার। কিন্তু মাইনেও যেমন তাঁর এখনও বাড়েনি, 'হুজুর' বলা অভ্যাসটাও তেমনই এখনও যায়নি।

"না, আপনিও কোন কাজের না!" অমরেশ ধমক দিয়ে উঠলো। "বলুন তো কোন্ আক্কেলে আপনি এদ্দিন ওখানে আপনার শালাকে রেখে এখানে নিশ্চিন্তে বসে রয়েছেন?"

"হুজুর, আপনিই তো আমাকে এখানে এনেছেন। যদি হুকুম করেন আমি এখনই ওখানে যাচ্ছি।"

"হ্যাঁ, তাই যান, আপনাকে দেখলে তবু ওরা খানিকটা সমীহ কোরে চলবে। অবিশ্যি সব চেয়ে বড় কাজ হোত যদি আপনি এদ্দিনে কোন রকমে ঐ সামন্তটাকে সাবাড় কোরে ফেলতে পারতেন।"

"হুজুর, ওটা যে আমার মাথায় নেই তা না। আমি তগে তগে আছি, লোকও লাগিয়ে রেখেছি, তবে সুযোগ পাচ্ছি না। সকল সময়েই ঐ লোকটার সঙ্গে দেখবেন দশবিশ জন লোক আছেই আছে।"

অমরেশ খানিকক্ষণ নীরবে কি ভাবে, তারপর বলে, "চাষীরা কি খালের জল নিচ্ছে?"

"তা পারবে কেমন কোরে হুজুর? খালেব দুধার জুড়ে রয়েছে আমাদের লেঠেলরা।"

"তা হোলে ভাবনার কি?"

"ভাবনার যথেষ্টই আছে হুজুর। রোজই চাষীরা এসে খালের ধারে জড় হোয়ে আমাদের লেঠেলদের শাসাচ্ছে। কিন্তু এরকম তো বেশীদিন চলতে পাবে না। এইরকম হোতে হোতে একদিন একটা খুনোখুনী হোয়ে যাবেই।" তাবপব হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায় "অবিশ্যি তাতে একটা সুযোগও মিলবে।"

"কি রকম?"

"অর্থাৎ সেইদিনই জানবেন শচী সামন্তেরও শেষ।"

"বাঃ বাঃ, তা হোলে তো উত্তম। তা হোলে আর ভাবছেন কেন? বরং জানবেন সেইদিন থেকেই আপনারও মাইনে হোয়ে যাবে দ্বিগুণ।"

কৃতজ্ঞতায় শ্রীকৃষ্ণবাবু মাথা নত কবেন।

অমরেশ বলে, "তা হোলে আব আপনাব ওখানে যাবার দবকার নেই। বরং না যাওয়াই ভাল। থাক্ তবে।"

"না হুজুর, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমায় একবার যেতেই হয, আব তা আজকালের মধ্যেই। কেননা আমার শালা শুনছি ওখানে নেই। এইসব দেখেশুনে সে ভয়ে পালিয়েছে। সেই কথাটাই বলবাব জন্যে আমার আসা।"

"বটে?"

"হ্যাঁ।"

"তা হোলে অবশ্য, কিন্তু তা হোলে তো আপনাকে বন্দুকটন্দুক সঙ্গে নিযে যেতে হয়।"

"সেইখানেই যে অসুবিধে।"

"কি অসুবিধে?"

"আপনার নতুন বন্দুকটা তো আজও পর্যন্ত এসে পেঁছলো না। অথচ

এখানেও তো একটা থাকা দরকার। এ নিয়ে কাল সকালে রানীমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁর এতে আপত্তি আছে। সেবারে ওভাবে দেওয়ায় তিনি খুব ক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন।"

"ওহো হো! সত্যিই তো! ম্যাণ্টন তো বন্দুকটা আমায় আজও পাঠালো না। কথাটা নানান ঝঞ্ঝাটে একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি না হয় এগোন, আমি দু'একদিনের মধ্যেই বন্দুকটা আনিয়ে নিয়ে আপনাকে পাঠাচ্ছি।"

"হুজুর, একটা কিছু সঙ্গে না নিয়ে ওখানে একদিনও কাটানো যায় না।"

"বেশ, তবে দু'চারদিন পরেই না হয় যান।"

"কিন্তু হুজুর অবস্থা এমন যে আর একটুও দেরি করা চলছে না। কেবলই ওখান থেকে লোক আসছে।"

"তবে না হয় এই বন্দুকটাই নিয়ে যান, মাকে আর জানাবেন না। আমি তো আজই কলকাতায় যাচ্ছি। দেখি যদি ফেরবার পথে ম্যাণ্টনের কাছ থেকে আমার অর্ডারী বন্দুকটা তুলে নিয়ে আসতে পারি।"

"কিন্তু যদি—"

"না, ও নিশ্চয়ই রেডি আছে।"

"তা হোলে কি আমি হরমাধববাবুর হাতে ভার দিয়ে কালই বেরিয়ে পড়বো?"

"হ্যাঁ তাই পড়ুন। কলকাতা থেকে ফিরে এসে আমি যেন শুনি গোবিন্দপুরের গোলমাল একেবারে ঠাণ্ডা, আর সেই সঙ্গে সামন্তটাও।"

"আমার যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করবো হুজুর," বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

"দাঁড়ান তবে, বন্দুকটা এনে দি।"

বন্দুক নিতে নিতে শ্রীকৃষ্ণবাবু বললেন, "আপনি তা হোলে আজই কলকাতায় যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

"বন্দুকটা তা হোলে নিয়ে আসতে যেন কোনরকমেই ভুল না হয়।"

"নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না। আমি এই সাড়ে এগারটার ট্রেনেই রওনা হচ্ছি। তবে আমার ফিরতে হয়তো দিন চারপাঁচ দেরী হবে।"

"এ ক'দিন কি তা হোলে কলকাতার বাড়ীতেই থাকবেন?"

"দেখি। ওখানেও থাকতে পারি আবার হোটেলেও থাকতে পারি।"

"কিন্তু শুনছিলুম বৌরানীর যেন অসুখ?"

"হ্যাঁ। না, তেমন কিছু না, এখন ভালোই আছে।"

"তা হোলে কি আমি—"

"হ্যাঁ, আপনি আসুন। আমিও তৈরী হোয়ে নি।"

জমিদারবাড়ীর কাজ সেরে বাড়ী ফিরতে হেমার আজ একটু বেশীই দেরী হোয়ে গেছে অন্যান্য দিনের চেয়ে।

একটা জিনিস তাকে কেবলই খোঁচা দিচ্ছে : অমরেশ হয়তো ব্যাপারটা সহজে ছাড়বে না। কলকাত্তা থেকে ফিরে এসে সে নিশ্চয়ই খোঁজখবর করবে। তখন কে কি লাগাবে কে জানে?

অবশ্য রমানাথ ভটচায্যির মেয়ের ব্যাপারটা নিয়ে সে কোনদিন কারও কাছে মুখ খোলেনি, এক বৌরানী ছাড়া। তাও বৌরানী অনেক কোরে পীড়াপীড়ি করেছিল বোলেই। কিন্তু সে যাই হোক, এখন যদি কোনরকমে কথাটা কোন দিক দিয়ে প্রকাশ হোয়ে পড়ে থাকে তো মুশকিল!

তবে এটা ঠিক বৌরানী কিছু বলবে না। যদি একান্ত কেউ লাগায় তো ঝি-চাকরদের মধ্যে থেকেই লাগাবে, যদি অবশ্য সে আড়াল থেকে কিছু শুনতে পেয়ে থাকে।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই আজ সে কাজ সেরে বেরিয়ে আসছে এমন সময় ইন্দিরা ডেকে বললে, "জানিস হেমা, আমি কালই বাপের বাড়ী চলে যাচ্ছি।"

হেমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"বিশ্বাস করতে পারছিস না?"

"না। রানীমা রাজী হয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"জমিদারবাবু?"

"ও এসেই না হয় শুনবেখন।"

"কিন্তু আমার অবস্থা কি হবে তা'লে বৌবানী? তুমি থাকতে, তবু ভরসা ছিল।"

"কেন?"

"জমিদারবাবু তো বলেই গেছেন রক্ষে রাখবেন না।"

"জানতে পারবে কি কোরে? তুই কি মনে করেছিস আমি বলে দিযেছি, না দোব?"

"আমি কি এত নীচ হোতে পারি বৌরানী যে তা ভাববো?"

"তবে?"

"অন্য কেউ তো পারে!"

"আর কে জানে যে বলবে?"

"আমার সন্দেহ হয় রাঁধুনিদিদিকে। মনে হয় যখন আমি তোমায় গপ্প করছিনু ও আড়াল থেকে সব শুনেছে। হয়তো ওই কিছু নাগিয়েচে, নইলে হঠাৎ কেন জমিদারবাবু—"

"বেশ, তুই না হয় তো আমার সঙ্গেই চ।"

হেমা উত্তর দেয় না।

"কি ভাবছিস?"

"ভাবচি তা নয় গেনু। এখনকার মতো না হয় রক্ষেও পেনু। কিন্তু এখানে আমার মা-ভেয়ের অবস্তা কি হবে?"

"কেন? ওরা কি করেছে যে ওদের অবস্থা—"

"তুমি তো জানো না বৌরানী, আমরা যে জমিতে আছি ও জমি জমিদারবাবু আমায় দয়া কোরে দিয়েচেন। এখন উনি যদি ও জমি কেড়ে নেন আমার মাভাই পথে বসবে।"

"দূর! দিয়ে কখনো কেউ কেড়ে নেয়?"

"কিছু মনে কোর না বৌরানী, এরা সব পারে।"

বৌরানী অবাক হোয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ভাবে এ কোথায় এসে সে পড়েছে! বাড়ীর একটা ঝিও এমনি কোরে কথা বলে!

হঠাৎ হেমার মনে হয় সে এ কি করছে? কার কাছে কার নিন্দে করছে? না, না, এ ঠিক হচ্ছে না। তাড়াতাড়ি বৌরানীর পায়ের ওপর উপুড় হোয়ে পড়ে সে বলে "দোহাই বৌরানী, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যেন এসব জমিদারবাবুকে বোল না।"

"তুই ক্ষেপেছিস? ওঠ্, ওঠ্, পা ছাড়্।"

হেমা ওঠে।

বৌরানী বলে, "আচ্ছা, ঠিক আছে। তোর ভয় নেই। তুই আমার সঙ্গে চল্। আমার বাবার জমিদারিতে আমি তোদের বসিয়ে দোবখন। সেখানে তোরা নির্ভয়ে থাকতে পারবি। আমার বাবা দেবতুল্য লোক। প্রজাদের তিনি নিজের সন্তানের মতো দেখেন। প্রজারাও তাঁকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। এখানে তোর কত জমি আছে?"

"দশ বিঘে।"

"চল্, তোকে আমি বিশ বিঘে দোবখন।"

হেমা চুপ কোরে থাকে।

"কি? বিশ্বাস হচ্ছে না?"

হেমা জিব কেটে বলে, "বৌরানী, তোমার কথা অবিশ্বেস করবো! তোমার মতো সতীলক্ষ্মীকে অবিশ্বেস করলে যে নরকেও ঠাঁই হবে না। না, তা না। আমি ভাবচি অন্য কথা। ভাবচি এই পাপের জায়গায় সারা জীবন তুমি থাকবে কি কোরে?"

"সেইজন্যেই তো চলে যাচ্ছি।"

"এখন নায় যাচ্ছ। আবার তো আসতে হবে।"

"আর আসবো না।"

"আর আসবে না?"

"না। তুই যাবি কি না বল্।"

"তুমি যদি ছিচরণে ঠাঁই দাও নিশ্চয়ই যাবো।"

"তোর মা-ভাই?"

"ওরাও যাবে।"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বৌরানী আবার বলে, "জানিস হেমা, বিয়ের আগে আমার, আমার কেন, আমার বাপের বাড়ীর সকলেরই এদের সম্পর্কে খুব একটা উঁচু ধারণা ছিল। কিন্তু এখন এখানে এসে যা দেখছি তাতে এদের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে।"

আবার কিছুক্ষণ থেমে বলে, "হালে আমার এক বন্ধুর বিয়ে হয়েছে আমার খুড়শাশুড়ীর ছোট ভায়ের সঙ্গে। খুড়শাশুড়ীকে অবিশ্যি আমি কখনো চোখে দেখিনি।"

হেমার মুখ হঠাৎ খুলে যায় "দেখবে কেমন কোরে? যা ব্যাভার করেচে এরা তাঁর সঙ্গে? আর তিনি এখানে আসেন?"

"আমার বন্ধুটিও তাই লিখেছে। লিখেছে আমার শ্বশুরমশাই নাকি সম্পত্তির লোভে আমার খুড়শ্বশুরকে হত্যা করেছিলেন। ওঃ কি ভয়ংকর কথা! শুধু তাই? নিজের ভায়ের ছেলেকে বঞ্চিত করবার জন্যে নাকি রটিয়ে দিয়েছিলেন ও ছেলে তাঁর ভায়ের ঔরসজাতই নয়। ওঃ! ওঃ!"

হেমা বলে, "সেইজন্যেই তো রমানাথ ভটচায্যির ওপর এদের এত রাগ। দেখতে গেলে বৌরানী উনিই তোমার খুড়শাশুড়ীকে বাঁচিয়েছেন, মানইজ্জত বলো, অর্থ বলো, সব দিক থেকে।"

"দ্যাখ্ হেমা, আমি অনেকের কাছেই এ কথা শুনেছি। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না যাদের জন্যে ঐ ভদ্রলোক এতো করলেন, কেন তারা ওঁকে একটু দেখলো না।"

"আপনার খুড়শাশুড়ীর বৌরানী তুলনা হয় না। অনেক চেষ্টা তিনি করে-ছেলেন রমানাথ ভটচায্যিকে কিছু সাহায্য নিতে রাজী করাতে। নিজের বাড়ী ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেক অনুরোধও করেছেলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই রাজী হননি। ওঁর মেয়ের মুখে শুনেছেন এমন কি কয়েকবার বাড়ী বয়ে ট্যাকাও পাঠিয়ে দিয়ে-ছিলেন, কিন্তু উনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ সে সময়ে ওঁর এমন অবস্থা যে ঘরে হাঁড়ি চড়ে না।"

"কিন্তু কেন বল্তো?"

"মানুষটা যে বরাবরই ধম্মভীরু ছেল। বলতো কি, যা করেছি ন্যায়ের জন্যে করেছি, তার জন্যে কিছু নিলে পাপ হবে।"

"ওঃ এমন মানুষেরও মেয়ের কি না এমন সর্বনাশ করলে!"

"জানো বৌরানী, পেরথম পেরথম আমরা খুবই অবাক হতুম জমিদারবাবুকে

ওদের বাড়ি এত ঘন ঘন যেতে দেখে। ভাবতুম জমিদারবাবু বোধ হয় ওঁর বাপের অন্যায়চারহ—

হঠাৎ দরজায় কার যেন ছায়া পড়লো।

"কে?"

"আমি তুলসী বৌরানী।"

তুলসী পরিচারিকাদের অন্যতম।

"কেন রে?"

"আপনাকে খাবার দেওয়া হবে কি?"

'খাবার!' বলতে বলতে বৌরানী ঘড়ির দিকে চেয়েই চমকে উঠলো. "আরে! এতো রাত হোয়ে গেছে! আমার যে খেয়ালই নেই! ওঠ্, ওঠ্, হেমা। তোর মা এতক্ষণে না জানি কত ভাবছে!"

হেমা যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

"তোর মা-ভাইয়ের মত নিয়ে তা হোলে আমায় কাল জানাস।"

মাথাটি নত কোরে হেমা বলে, "আচ্ছা বৌরানী।" তারপর বেরিয়ে আসে। পেছন থেকে সে শুনতে পায় তুলসী বলছে, "ও বুঝি আপনার সঙ্গে যাবে বৌরানী?"

"হ্যাঁ।"

"আমাকেও নিয়ে চলুন না।"

"সকলে গেলে এখানে কে থাকবে? মাকে কে দেখবে?"

"তা না। আপনি আমাদের থেকে ওকে বেশী ভালবাসেন।"

কৃতজ্ঞতায় হেমার চোখে জল আসে। সে আর দাঁড়ায় না।

আকাশে জ্যোৎস্না ফেটে পড়ছে। নীচে ক্লান্ত পৃথিবী যেন রুপোলি আলোর চাদর মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছে। ক্ষেত খামার কুটীর গাছপালা—যেদিকেই চাও কোথাও স্পন্দনটি পর্যন্ত নেই। কেবল যা মাঝে মাঝে থেমে থেমে দূরদূরান্তর থেকে ভেসে আসছে নিদ্রাহারা পাখীর ডাক—ঘু-উ! ঘু-উ! নীরব পুরী চমকে চমকে উঠছে।

গোবিন্দপুর কাছারি। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর খাওয়াদাওয়া সেরে শ্রীকৃষ্ণবাবু সবে জানলার ধারটিতে বোসে তামাক খাচ্ছেন। আগে তিনি হুঁকোতেই খেতেন, এখন ম্যানেজার হবার পর থেকে গড়গড়া ধরেছেন।

হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণবাবু যেন দেখতে পেলেন নির্জন মাঠের ওপর দিয়ে চলেছে শচী-নন্দন সামন্ত—একা, একেবারে একা!

এ কি হোল? এরকমটি তো বড় দেখা যায় না! তা হোলে কি আর কেউ হবে? তিনি কি ভুল দেখছেন?

বাইরে বেরিয়ে এসে শ্রীকান্তবাবু আরও নিরীক্ষণ কোরে দেখতে

লাগলেন। হ্যাঁ, ঠিকই, ও শচীনন্দন ছাড়া আর কেউ না। সেই রকমই চলন, সেই রকমই সবকিছু।

ওঃ কি সুযোগ! একেবারে কি না তাঁর সামনেই! অতীতে তো কখনো এমনটি...

হ্যাঁ, বোঝা গেছে, মনে হয় শচীনন্দন জানে না যে তিনি এখানে এসে রয়েছেন। বরং সে এইটেই জানে যে তাঁর শালা ভয়ে এখান থেকে পালিয়ে গেছে। সে এও নিশ্চয়ই খবর রাখে যে লেঠেলরা এ সময়ে কাছারিতে থাকে না, মদ ভাঙ খেয়ে অথবা বেশ্যাপল্লীতে গিয়ে পড়ে থাকে। তাই অমনভাবে একাই বেরিয়েছে। হয়তো কোন জরুরী কাজ সেরে ফিরছে এই ধার দিয়ে।

নাঃ এমন সুযোগ দুবার আসবে না!

না, না. না, এ সুযোগ ছাড়া হবে না।

কিন্তু কি করবেন তিনি? কি করতে পারেন তিনি? কেন অন্তত দু'পাঁচজন লেঠেলকেও ধোরে রাখলেন না?

এখন তিনিও তো একা! যদি এখনই প্রজারা দল বেঁধে এসে তাঁকে আক্রমণ করে? ওঃ কি ভুলই না কোরে বোসে আছেন! ভাগ্যিস বন্দুকটা সঙ্গে এনেছিলেন!

বন্দুকের কথা মনে হোতেই শ্রীকৃষ্ণবাবু লাফিয়ে উঠলেন, ঠিক তো! বন্দুকটা তো কাছেই রয়েছে। ঠিক, ঠিক আর একটুও দেরি না। এখনই, এখনই—

কিন্তু কি কোরে হয়? অত দূরে তাগ করা কি সম্ভব? তাঁর হাত তো তেমন তৈরী না। যদি ফস্কে যায়? ইস্, ঝগড়ুটাও যদি থাকতো!

কিন্তু তা হোলেও বা কি কোরে হোত? বন্দুকের আওয়াজ তো তা হোলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো, গ্রামবাসীরা জেনে ফেলতো। আর যদি গুলি খেয়ে ও মরতো পুলিস এসে নির্ঘাৎ তাঁকে নিয়ে টানাটানি করতো।

ইস্! ইস্! তা হোলে এমন সুযোগটা একেবারে চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে? না, না, না। কিছুতেই তা যেতে দেওয়া হবে না। এরই ওপর নির্ভর করছে তাঁর বেতনবৃদ্ধি, তাঁর ভবিষ্যৎ, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা।

তাইতো! কি করা যায় তা হোলে?

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় দরোয়ানের কথা। তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। ঠিক তো! এতক্ষণ তো মনে পড়েনি! দরোয়ান পাঁড়ে যে রয়েছে!

মাত্র কিছুক্ষণ আগেই পাঁড়ে, অর্থাৎ দেবনন্দন পাণ্ডে, জগদ্বল্লভপুর থেকে এখানে এসেছে। এখনও সে ক্লান্ত। তা হোক। এ আর এমনকি পরিশ্রমের কাজ! ওই বরং যাক। লাঠিটা নিয়ে, কিংবা আরও ভালো হয় টাঙিটা নিয়ে সেই ভালো, সেই ভালো, একেবারে নিঃশব্দে কাজ হোয়ে যাবে।

চাপা গলায় শ্রীকৃষ্ণবাবু পাঁড়েকে ডাকলেন। সাড়া পেলেন না। আবার ডাকলেন। তবু না। তিনি ছুটে ভেতরে ঢুকে গেলেন। দেখেন পাঁড়ে একটা প্রদীপের নীচে একখানা কি হিন্দী বই, রামায়ণ কিংবা গীতা হবে হয়তো, বেখে নিবিষ্ট মনে পড়ছে।

"দরোয়ান! দরোয়ান!"

"হুজুর!"

"শীগগির একবার বাইরে এসো।"

পাঁড়ে তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর পিছন পিছন বেরিয়ে এল।

"ঐ ঐ দেখতে পাচ্ছ কে যাচ্ছে?"

আঙুল দিয়ে শ্রীকৃষ্ণবাবু দেখিয়ে দিতে লাগলেন।

"ও তো শচীনন্দনবাবু আছে না?"

"হ্যাঁ ঠিক বলেছ। তোমায় এক্ষুনি একটা কাজ করতে হবে।"

"যা বলবেন হুজুর, হামি তৈরি আছি। ওঁকে খবর দেবো?"

'না না। তোমাকে এক্ষুনি ছুটে গিয়ে ওকে একেবারে শেষ কোবে দিতে হবে, মানে যাকে বলে খতম কোরে ফেলতে হবে। তুমি ঐ টাঙিটা নিযে দৌড়ে যাও। যেনো কাজ হাসিল কবতে পারলে—"

"কি বলছেন হুজুব? খতম?"

"হ্যাঁ।"

"সে কি! সে কি!"

'তুমি জানো তো ও আমাদের দুশমন।"

"তাই বোলে জান নিতে হোবে? ও হামি পারবে না হুজুব।"

"তোমায় পাঁচশো টাকা ইনাম দোব।'

"হো হো হো। না, হামি পারবে না।"

"তোমায় করতেই হবে। জমিদারের হুকুম।"

"ও হুকুম হামি মানবে না হুজুব।"

"মানবে না?"

"না।"

"তুমি চাকরি করছো, হুকুম মানবে না?"

"হামার নোকরি তো পাহারা দেবার নোকরি হুজুব। কাবও জান নেবাব জন্যে নয়।"

"নোকরী যখন কবতে এয়েছ যা যখন দরকাব তাই করতে হবে।"

"মাফ করবেন হুজুর। তা হোয় না।"

"তুমি জানো জমিদার শুনলে তোমার চাকরি যাবে?"

"যাক। হামি পবোযা করি না। নওকরিকে লিয়ে দেবনন্দন পাঁড়ে এত্তো

নীচ হোতে পারবে না। নিজের মুলুক ছেড়ে হামি এত্তো দূর এসেছি কি এই জন্যে"?

তার দৃঢ়তা দেখে শ্রীকৃষ্ণবাবু থতমত খেয়ে গেলেন। শেষে নিজের জিদ বজায় রাখবার জন্যে বললেন, "তবে যাও। আমি তোমায় এই দণ্ডে বরখাস্ত করলুম।"

"ঠিক আছে। আপনি মেহেরবানি কোরে হামার তলব চুকিয়ে দিন, হামি কালই চলে যাচ্ছি।"

"না, তুমি এক্ষুনি যাও। তলব কাল বড় কাছারিতে গিয়ে নিও।"

"বহুৎ আচ্ছা হুজুর। হামি এখনই যাচ্ছি।"

দেবনন্দন পাণ্ডে যাবার জন্যে তল্পিতল্পা বাঁধতে ভেতরে চলে গেল। শ্রীকৃষ্ণবাবু তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাগে তিনি গসগস করতে লাগলেন। এতোটা তিনি কল্পনাই করতে পারেননি, ভাবতেই পারেননি দরোয়ান তাঁর মুখের ওপর এইরকম ভাবে জবাব দিয়ে শেষ পর্যন্ত চলেই যাবে।

যাক্‌গে। মরুকগে। নিশ্চয়ই ওর ওদের সঙ্গে যোগসাজস আছে। না হোলে এত দরদ কেন?

না, না, ওরকম লোক থাকার চেয়ে যাওয়াই ভালো। থাকলে জমিদারির ক্ষতিই হবে।

কিন্তু .কিন্তু এখন কি করা যায়? এখনও হয়তো--

হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণবাবু ফিরে মাঠের দিকে তাকালেন।

একি! সামন্তটা অতদূর চলে গেছে! একেবারে নাগালের বাইরে! ইস! এমন সুযোগ এসেও চলে গেল! মাত্র একটুর জন্যে! ইস্!

আজ এত অশান্তি তো ঐ লোকটারই জন্যে। সকল সময়েই প্রাণ হাতে নিয়ে ফিরতে হচ্ছে ওরই ভয়ে। অথচ ও লোকটাকে যমালয়ে পাঠানো আজ কত সহজই না ছিল! যদি আজ ওকে শেষ করা যেত, ব্যাস, প্রজারা একেবারে ঠাণ্ডা হোয়ে যেত, জমিদারও কত খুশী হতেন, আর সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর মাইনেও হোয়ে যেত দ্বিগুণ! আঃ সব কিনা ভেস্তে গেল!

বেতন আদায় করতে কিন্তু দেবনন্দনের বেশ বেগ পেতে হোল। জমিদারের খাস কাছারিতে এসে বলতে তাঁরা জানালেন ম্যানেজারের সই না হোলে তাঁরা টাকা দিতে পারবেন না। এ অসঙ্গত কথা নয়, কাজেই দেবনন্দনকে আবার ছুটতে হোল গোবিন্দপুরে শ্রীকৃষ্ণবাবুর কাছে।

শ্রীকৃষ্ণবাবু সই দিলেন বটে, কিন্তু এই সর্তে যে সে যেন টাকা পাবামাত্রই জমিদারি ছেড়ে চলে যায় আর তাঁর সঙ্গে তার যেসব কথাবার্তা হয়েছে তা যেন সে ঘুণাক্ষরেও কাউকে না বলে।

গোবিন্দপুর থেকে ফের নওগাঁয় এসে পৌঁছতে দেবনন্দনের বিকেল হোয়ে

গেল। তলব মিলতে হোল সন্ধে। টাকার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নির্দেশ দেওয়া হোল যেন সে পরদিন সকালেই জমিদারি ছেড়ে চলে যায়, মাত্র একটা রাত্রিই তার এখানে থাকবার অধিকার। বলা বাহুল্য, ম্যানেজার লোক মারফৎ আগে থেকেই এ নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

গেটে নতুন দরোয়ানের সঙ্গে বোসে দেবনন্দন অনেকক্ষণ ধোরে গল্প করলো। খইনীও খেল। একসময়ে এইখানে বোসে সে এমনিভাবেই নওগাঁর প্রাসাদের গেট পাহারা দিত, অনধিকারপ্রবেশকারীদের ঢুকতে দিত না। আর আজ রাত্রের পর সারা জমিদারিতে সেই হবে অনধিকারপ্রবেশকারী!

প্রাসাদের ঝিচাকররা সকলেই তাকে ভালোবাসে, সকলের সঙ্গেই তার সদ্ভাব। তারা তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল, কেউ জিজ্ঞেস করে সে কেমন আছে, কেউ জিগগেস করে বদলী হোয়ে সে আবার এখানে এসেছে কি না।

সে মুখ খুলে কিছু বলতে পারে না। শুধু জানায় তার চাকরি ছুটে গেছে, কালই সে চলে যাবে।

তারা শুনে সমবেদনা জানায়।

অবশ্য সমবেদনা পাবার আশাতেই যে দেবনন্দন এতক্ষণ এখানে বসে আছে তা নয়। সে বসে আছে অন্য কারণে—হেমার প্রতীক্ষায়।

এমনি মজা কিন্তু, হেমার পাত্তা নেই।

হেমা কি তা হোলে আজকাল এ ধারটায় আর আসে না? বারান্ডাতেও কি বেরোয় না? বেশ। বাড়িও কি সে যাবে না? বাড়ি যেতে হোলে তো এইধার দিয়েই যেতে হবে।

দেবনন্দন কাউকে যে জিগগেস করবে তাও পারছে না। যদি কেউ কিছু মনে করে? হাজার হোক মেয়ে মানুষ তো!

হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগে হেমা অসুস্থ হোয়ে পড়েনি তো? সেবারকার মতো?

হোতে তো পারে! খুবই হোতে পারে। হয়তো সেই জন্যেই সে চাকরিতে আসতে পারেনি।

দেবনন্দনের ভেতরটা আনচান কোরে ওঠে। কতদিন ধোরেই যে হেমা তাকে ডেকে পাঠাচ্ছে। সেদিনও তো তার ভাই যখন জগদ্বল্লভপুর হাটে আনাজ বেচতে গিয়েছিল তার সঙ্গে দেখা কোরে সে বলে এসেছিল "দরোয়ানজী হেমা তোমায় ডেকেছে, সময় কোরে একদিন যেও।" হায়, কিছুতেই যে আর সে সময় কোরে উঠতে পারছিল না।

অথচ এই তো চাকরি! যে চাকরির জন্যে সে তার প্রিয়জনের সঙ্গে একবার দেখা করবার পর্যন্ত সময় পাচ্ছিল না সেই চাকরি কিনা আজ এক কথাতেই চলে গেল!

হেমার বাড়ীর দিকে সে চলেছে। সত্যিই হেমা তার প্রিয়জন। তারই জন্যে তার এখানে থাকা। না হোলে এতদিন কবে সে অন্যত্র চলে যেতো। এ মনিবকে তার কোনদিনই ভালো লাগেনি। এ জমিদার, এ ম্যানেজার কেউ ভালো লোক না। নওগাঁয় তার একমাত্র আকর্ষণ হেমা। কিন্তু, কিন্তু আজকের রাত পোহালেই তাকে চলে যেতে হবে। আর হেমার সঙ্গে দেখা হবে না। চাকরি গেছে তার দুঃখ নেই কিন্তু হেমাকে তো আর সে দেখতে পাবে না!

তার মনে পড়ে এক সময়ে সে হেমাকে বলেছিল আর সে তাকে চাকরি করতে দেবে না, তাকে সে খিলাবে। আজ যদি হেমা তাকে সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেয়?

হেমার সে কথাটা সত্যিই খুব ভালো লেগেছিল। সেবার যখন জমিদারের বিয়েতে দেবনন্দন এখানে এসে দুচারদিন ছিল হেমা প্রায়ই এবং খুব খুশীর সঙ্গে সে কথাটা পাড়তো।

মনে পড়ে একদিন রাত্রে তারা পাশাপাশি বোসে অনেকক্ষণ ধোরে গল্প করেছিল। হেমার হাতখানি তুলে সে ধোরে রেখেছিল নিজের হাতে। হেমা তাতে একটুও আপত্তি করেনি। সে স্মৃতি সে কখনো ভুলবে না।

বাজারের কাছে এসে সে থেমে পড়ে। হেমার জন্যে একখানা কাপড় কেনে। যদি সে অসুখে পড়ে থাকে এই ভেবে কিছু ফলও নেয়। তারপর আবার চলতে থাকে।

চারদিকে জ্যোৎস্না। মনে হচ্ছে পৃথিবী যেন শুয়ে শুয়ে আকাশকে হাতছানি দিয়ে তার কাছে ডাকছে।

হঠাৎ দেবনন্দনের নিজেকে যেন বড়ই একা মনে হয়। এত একা এর আগে আর তার কখনও বোধ হয়নি।

সে চলতে থাকে। এ রাস্তা তার খুবই পরিচিত। কিন্তু হায়, কাল থেকে এ পথে আর সে পা দিতে পারবে না। এখানে থাকার আর তার কোন অধিকার নেই।

চাকরি তাব গেছে যাক্, চাকরি সে আবার জুটিয়ে নেবে। কিন্তু হেমাকে তো সে আর দেখতে আসতে পারবে না! একি কম দুঃখের। তবে হ্যাঁ, এক যদি হেমা তাব সঙ্গে যায়।

কিন্তু তা কি সম্ভব? আচ্ছা, হেমা তো আবার সাধি করতে পারে? সে তো কোন্ ছোট বয়সে সে বিধবা হয়েছে। আচ্ছা তাকেই যদি সে সাধি করে। এঃ! এ কি আবোল তাবোল ভাবছে সে? তা কখনো হয়? হেমা যদি শোনে কি মনে করবে? হয়তো আর কোনদিনই তাব সামনে আসবে না। না, না, ওসব সে আর ভাববে না।

হেমার বাড়ির কাছ বরাবর এসে সে দেখে সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। ভেতরে বা বাইরে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। সে চুপটি কোরে দাঁড়িয়ে থাকে। একবার মাথা

ওপরে চায়, দেখে আকাশের চাঁদও ঠিক তার মত ঐ রকম চুপটি কোরে একলাটি দাঁড়িয়ে।

তার কানে ভেসে আসে ঝিঁঝির ডাক।

কি ব্যাপার? ওরা কি তবে ঘুমিয়ে পড়েছে? কিন্তু এতো সকাল সকাল তো ওরা ঘুমোয় না? তবে? সে এদিক উদিক উঁকি মারে। সঙ্কোচও হয়, যদি কেউ দেখে কিছু ভাবে?

আবার উঁকি মারে। শেষে দরজায় ধাক্কা দেয়। দু'একবার ধাক্কা দিতেই সাড়া আসে, "কে? যাই।"

তারপরেই দরজা খোলার শব্দ।

তার একটু পরেই: "আরে দরোয়ানজী যে! এমন সময়ে?"

দেবনন্দন দেখে তার সামনে দাঁড়িযে হেমার ভাইয়ের স্ত্রী। বলে, "খবর সব ভালো তো বহিন? হেমা কোথা?"

"ইস্! যদি কালও আসতে দরোয়ানজী!"

"কেনো?"

"দিদির সঙ্গে দেখা হোত।"

"দিদি কোথায়?"

"সে তো জমিদারবাবুর ইস্ত্রির সঙ্গে তাঁর বাপের বাড়ি গেছে।"

"তাই নাকি? কবে ফিরবে?"

"কিছু তো বোলে যায়নি। দেরিও হোতে পারে, আবার শীগ্গিরও আসতে পারে। আহা আজ যদি সকালেও আসতে, দেখা হোত।

দেবনন্দনের মুখ থেকে কে যেন কথা কেড়ে নিয়ে গেছে। আফসোসের তার আর সীমা থাকে না। সে তো খুবই আসতে পারতো। না হয় তাব তলব নেওয়া নাই হোত। ইস্, কেন সে এলো না।

রমণী বলতে থাকে, "দিদি তো তোমায় দেখবার জন্যে পাগল।"

"পাগল?"

দেবনন্দনেব অবস্থা দেখে হেমার ভাজ মুচকে হাসে। কিন্তু তাকে সে বুঝতে দেয না, বলে, "হ্যাঁগো।"

"হামার নসীব খারাপ আছে। না হোলে তো ও হামাকে কোতবার ডেকিয়েছে. হামি আসতে পারলেম না।"

রমণী উপভোগ করে কিছু বলে না।

খানিকক্ষণ পরে দেবনন্দন বলে, "জেমিনদারের স্ত্রীর বাপেব বাড়ি কোথা আছে বহিন?"

"আমি জানি না তো।"

"ঠিক আছে। হামি খুঁজে নেবে। হামি কালই যাচ্ছি।"

"কালই যাবে? তুমিও দেখছি দিদির জন্যে কম পাগল নও।"

দেবনন্দন লজ্জা পায়। সে বুঝতে পারে একটু বেশীই অধীরতা সে প্রকাশ কোরে ফেলেছে। সামলে নেবার জন্যে বলে, "না, না, হামার এখানকার নওকরি ছুটে গেছে কিনা তাই।"

"নোকরি ছুটে গেছে? কেন?"

দেবনন্দন কিছু বলে না, শুধু চুপ কোরে দাঁড়িয়ে থাকে।

রমণী বলে, "বোধ হয় দিদি নেই বোলে তোমার এখানটা আর ভালো নাগছে না, না দরোয়ানজী?'

"না, না, হামায় এরা ছাড়িয়ে দিয়েছে। কি করতে আর থাকবো?"

"সত্যি বলছো?"

"ঝুট বোলে হামাব লাভ কি আছে বোল?"

"কিন্তু বসবে না? ভেতবে এসো।"

"না, ওনেক রাত হোয়ে গেছে।"

"দিদি থাকলে তো বসতে?"

রমণী আবার মুখ টিপে টিপে হাসে।

"হ্যাঁ, সে তো—"

"তোমাব হাতে ওটা কি?"

"ফল আছে। এই লাও, বাচ্ছাদেব দিয়ে দিও।"

"আর ওটা?"

"এটা কাপড়া আছে।"

"দেখি. দেখি। বাঃ বেশ পাড় তো। এটা কি আমাব জন্যে?"

"হ্যাঁ, তা তুমি লিতে পারো।"

"কিন্তু আমার জন্যে তো আনোনি?

"না, এনেছি হেমাব জন্যে। তা তুমি লিয়ে লাও। হামি দুসরা একখানা—"

"বারে! তা বুঝি হয়? দিদির নাম কোরে যখন এনেছ, আমি নিলে ও কি ভাববে?"

"বেশ, তুমহার জন্যে আউর একঠো—"

"সেই ভালো। ওখানা দিদির সঙ্গে দেখা হোলে দিদিকেই দিও। সে খুব খুশী হবে।"

"হ্যাঁ।"

"তা হোলে হামি এখন যাই। লেকিন যদি এর মধ্যে হেমা এসে পড়ে?"

"খুব খুশী হোবে?"

"খুব সম্ভব শীগগির এখন আসবে না। মাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে, যদি জায়গাটা

পছন্দ হয় ঐখানেই থেকে যাবে। বৌরানী বলেছে জমি দেবে। আর, আর আমরাও হয়তো তালে ঐখানেই চলে যাবো।"

"বাঃ, বাঃ, তা যদি হোয় তো খুব ভালো হোবে। দুসরা জায়গা আউর আচ্ছা হোবে। আচ্ছা, হামি চলি।"

"হ্যাঁ, এসো, দিদি যখন নেই তখন আর কি করতে থাকবে?"

"না, না, তা না।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ তাই। আচ্ছা নমস্কার।"

"নমস্কার।"

শ্রীকৃষ্ণবাবু পরদিনই লেঠেলদের ডেকে পাঠালেন। রীতিমতো সভা বসে গেল। শ্রীকৃষ্ণবাবু বললেন, "দ্যাখো এভাবে আর কতোদিন চলবে? জমিদার টাকাকড়ি বড় কম খরচ করছেন না। অথচ তিনি যা চাইছেন তা আমরা পূরণ করতে পারছি কই? দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে—কিছুই হচ্ছে না। ভেবে দ্যাখো পরশু রাত্তিরেব অমন সুযোগটা কিভাবে হাতছাড়া হোয়ে গেল! এখন জমিদার যদি কোন রকমে জানতে পেবে আমার কাছে কৈফিয়ৎ চান আমি কি জবাবদিহি করবো?

সকলে নীরব।

হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে ঝগড়ু সর্দাব দাঁড়িয়ে উঠে হাতজোড় কোরে বলে, "ম্যানেজারবাবু, যা হযেছে হয়েছে, আমাদের আর একটা দিন সময় দিন।" তারপর সঙ্গীদের দিকে চেয়ে নাটকীয ভঙ্গীতে বললে, "গা তোল ভাই সব, চলো আমার সঙ্গে।"

কেউ দ্বিরুক্তিটিও করলো না। সর্দারেব সঙ্গে সবাই বেরিয়ে গেল।

শ্রীকৃষ্ণবাবু প্রথমটা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না, শুধু গড়গড়াটা মুখের কাছে টেনে নিয়ে আপন মনে তামাক খেতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পবে তাঁর কানে এল তারা মুখে আওযাজ করছে 'বম্-বম্-বম্, ববম্-বম্।' আবার কিছুক্ষণ পরে 'বম্-বম্-বম্, ববম-বম।' আবার, আবার।

উন্মুক্ত প্রান্তর যেন ফেটে ফেটে পড়তে লাগলো সে আওয়াজে।

কয়েকদিন বাইরে থাকার পর অমরেশ আজ প্রাসাদে ফিরছে। এ ক'দিন তাকে খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কাটাতে হযেছে— কখনো চৌধুরীদের ওখানে তাদের সান্ত্বনা দিতে কখনো সুব্রত চৌধুরীর শোকসভায়, কখনো বা জমিদার সঙ্ঘের অফিসে। এই যদি সে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে, পরক্ষণেই লাট ভবনে, পরক্ষণেই আবার মন্ত্রী ও অন্যান্য হোমরাচোমরাদেব কাছে। দেশী বিদেশী এমন কোন গণ্য-

মান্য ব্যক্তি কলকাতায় নেই যাঁর সঙ্গে সে দেখা না করেছে। এখন সে যে জমিদার সঙ্ঘের সেক্রেটারি!

অধিকাংশ সভ্য, বিশেষ কোরে যুবকরা সকলেই তাকে ভোট দিয়েছে। ট্রেনে বোসে অমরেশ সেই কথাটাই ভাবছে। কি কোরে সে অত ভোট পেল?

কিন্তু কেনই বা পাবে না? পাবার অযোগ্য সে কিসে? যখন বিপুল ভোটাধিক্যে সে সেক্রেটারি নির্বাচিত হোল, সে কি হাততালি! ফুলের মালা দিয়ে সভা তাকে অভিনন্দন জানালো। অবিস্মরণীয় সেই মুহূর্তগুলি!

তার বুকখানা যেন দশ হাত হোয়ে উঠেছিল। যখন দাঁড়িয়ে উঠে সে সভ্যগণকে অভিবাদন জানালো, সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, "কিছু বলুন, কিছু বলুন। আমরা শুনতে চাই।"

কি আশ্চর্য! অথচ কয়েক মাস আগে এইরকম এক ডেইস থেকে তাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল তৃতীয় শ্রেণীর জমিদার বোলে।

আজ কিন্তু সে আর তৃতীয় শ্রেণীর জমিদার নয়। আর সেই জন্যেই বুঝি তাকে ডেকে এনে জমিদার সঙ্ঘের সেক্রেটারি করা হোল। ভাগ্য যখন ফেরে এমনি ভাবেই ফেরে।

কিন্তু একটা কথা। সে কি ভাবতে পেরেছিল অমন সুন্দর ঝরঝরে বক্তৃতা সে করতে পারবে? ওরাও কি পেরেছিল? খাড়া হোয়ে দাঁড়িয়ে সে যখন বলতে লাগলো, "বন্ধুগণ, আমাদের সামনে আজ বহু সমস্যা উপস্থিত", এমন কি বয়স্ক সদস্যরা পর্যন্ত উদ্‌গ্রীব হোয়ে উঠেছিল। না থেমে সে বলতে লাগলো, "বন্ধুগণ, আমরা দেখছি সরকার বাহাদুর আর আগের মতো আমাদের তেমন সুনজরে দেখছেন না। কিন্তু তাঁদের আমি সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাঁরা বিদেশী, তাঁদের শাসন এদেশে কায়েম রাখতে হোলে আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। অতীতেও তাঁদের আমরা অনেক সাহায্য করেছি, ভবিষ্যতেও করবো। কিন্তু তাঁরা যেন মনে রাখেন আমরাই তাঁদের সবচেয়ে বড় বন্ধু, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য খুঁটি।"

সবাই সজোরে হাততালি দিয়ে উঠলো।

একটু থেমে সে আবার বলতে লাগলো, "বন্ধুগণ, আর একদিকে আমরা এও দেখছি যে, একদল লোক হঠাৎ নেতা সেজে দেশবাসীকে বোঝাতে চেষ্টা করছে জমিদারি-প্রথা দেশের সর্বনাশ করছে, জমিদাররা পরগাছা, কাজেই জমিদারি-প্রথার উচ্ছেদ চাই। বন্ধুগণ, এদের বিদ্যাবুদ্ধি আছে বলে মনে হয় না। অথবা এরা অন্ধ, তাই দেখতে পাচ্ছে না। জিগগেস করি বাংলার জনজীবনে, বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে জমিদারদের যে বিরাট ও অতুলনীয় দান তা কোন্ মূঢ় অস্বীকার করবে? বন্ধুগণ, এ ষড়যন্ত্র আমাদের ব্যর্থ করতে হবে। জমিদাররা সরে গেলে দেশ যে মস্তিষ্কহীন হোয়ে পড়বে।"

আবার হাততালি, প্রচণ্ড হাততালি।

বক্তৃতা সেরে সে মঞ্চ থেকে নেমে এল। 'সাবাস! সাবাস!' কোরে উঠলো সবাই।

বাইরে আসতেই সংবাদপত্রের *ফোটোগ্রাফাররা তার ফোটো নিল। পরদিন জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলো বিরূপ সমালোচনা করলেও দেখা গেল সাহেবদের সব চেয়ে নামকরা দৈনিকখানা তার বক্তৃতা ও ছবি খুব ফলাও কোরে ছাপিয়েছে, তার বক্তৃতার ওপর ঝাড়া এক কলম সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লিখেছে, মন্তব্য করেছে "জমিদার সঙ্ঘের এই নূতন সেক্রেটারিকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই তরুণ জমিদার যা বলেছেন, কি সরকার আর কি জনগণ উভয়েরই তা প্রণিধানযোগ্য। আমরা এঁর উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধি কামনা করি। এঁর পিতা রাজা নিখিলেশ রায়ও সরকারের একজন সত্যকার দরদী বন্ধু ছিলেন। গত যুদ্ধের সময়ে তিনি সরকারকে অনেক-ভাবে সাহায্য করেছিলেন। মিস্টার অমরেশ রায় পিতার উপযুক্ত পুত্র। শোনা যাচ্ছে এঁকেও রাজা উপাধি দেবার জন্যে সুপারিশ করা হয়েছে। আমরা এঁকে অদূর ভবিষ্যতে রাজা উপাধি ভূষিত দেখতে পেলে খুশীই হবো।"

অমরেশ ভাবতে লাগলো . এ কাগজের তো সরকারী মহলে খুবই প্রতিপত্তি। এ কাগজে যখন এমন কোরে লেখা হয়েছে, রাজা খেতাব আর তার আটকায় কে?

হঠাৎ সে চেয়ে দেখে ট্রেন নওগাঁ স্টেশনে পেঁীছে গেছে।

তাড়াতাড়ি সে নামলো --- নামলো জমিদার সঙ্ঘের সেক্রেটারি ভাবী 'রাজা' অমরেশ রায়।

সে যে আজ আসছে এ খবর সে আগেই টেলিগ্রাম কোরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কাজেই স্টেশনের বাইরে গাড়ি ও ভিড় মোতায়েন ছিল। লোকে তাকে তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল।

"জমিদারবাবু ফিরে এসেছেন! জমিদারবাবু ফিরে এসেছেন!"

দরোয়ান থেকে শুরু কোরে দাসদাসী পর্যন্ত সবাই তটস্থ।

কাছারিতেও আগে থেকে অনেকে এসে বসেছিল। বন্ধুবান্ধব ও অনুগৃহীত মোসাহেবরাও ছিল। কর্মচারীরা তো ছিলই।

অমরেশ খানিকক্ষণ তাদের কাছে বসলো। খবর নিয়ে জানলো ম্যানেজার শ্রীকৃষ্ণবাবু এখন গোবিন্দপুরেই আছেন। শুনে সে খুশীই হোল। তারপর জমিদারি সংক্রান্ত দুএকটা টুকিটাকি আলোচনা হোতে হোতে প্রসঙ্গক্রমে তার গত ক'দিনের কলকাতায় থাকার কথা উঠলো। মোসাহেবরাই তুললো। অমরেশ দেখলো সে যে জমিদার সঙ্ঘের সেক্রেটারি হয়েছে এ খবর সংবাদপত্র মারফৎ এখানে ইতি-মধ্যেই প্রচার হোয়ে গেছে। ইংরিজী দৈনিকখানা খুলে সে দেখালো তার সম্বন্ধে তাতে কত সব ভালো ভালো কথা লেখা হয়েছে। সকলে ইংরিজী না জানলেও

কেউ কেউ জানে। তারা সাগ্রহে পড়তে লাগলো। ছবিটা তো সকলে উপুড় হোয়ে পড়ে দেখতে লাগলো।

"আচ্ছা আমি উঠি, তোমরা দেখ। হোলে কাগজটা আমায় পাঠিয়ে দিও।" বলতে বলতে অমরেশ এইবার উঠে পড়লো।

প্রাসাদে পা দিতেই কুকুর জ্যাক ছুটে এলো লেজ নাড়তে নাড়তে। তাকে আদর করতে করতে সে ভেতরে ঢুকলো।

মা দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "জমিদার সঙ্ঘের সেক্রেটারি হলি?"

"হ্যাঁ মা। জানো মা তুমি কল্পনাই করতে পারবে না আমি ওদের সভায় কি সুন্দর বক্তৃতা করেছি। কাগজওলারা তো খুব ফলাও কোরে আমার বক্তৃতা আর ফোটো ছাপিয়েছে।

"তাই নাকি? আজকের কাগজে বুঝি? দাঁড়া, দাঁড়া, আজকের কাগজটা আমার দেখাই হয়নি। ওরে কে আছিস? কাগজটা নিয়ে আয় তো।"

"না মা, ও দেশী কাগজগুলোয় দেয়নি। ওরা দেবে কেন? জানো না ওরা আমাদের শত্রু। ওরা তো আদাজল খেয়ে প্রচার করছে 'জমিদারি-প্রথার উচ্ছেদ চাই।' ওরা না দিকগে। যারা দিলে কাজ হবে, যাদের কথায় সরকার ওঠে বসে তারা দিয়েছে—দিয়েছে সাহেবদের কাগজে। ওরা এমন কি লিখেছে আমাকে রাজা-উপাধি ভূষিত দেখতে পেলে ওরা খুশীই হবে। আমি ঐ কাগজ এক কপি নিয়ে এসেছি। কাছারিতে ওরা পড়ছে। ওদের হোলে তোমায় দেখাচ্ছি।"

" আচ্ছা, আচ্ছা। বোস্, জিরো ততক্ষণ। আমি চা করি।"

এমন সময় চাকর একখানা কাগজ নিয়ে এসে রানীমার হাতে দিল। কাগজখানা এপিঠ ওপিঠ দেখতে দেখতে নিরুপমা বললেন, "এ ছাইপাঁশগুলো তবে নিস কেন? এর চেয়ে বরং ঐ কাগজখানাই—"

"হ্যাঁ মা, এবার থেকে তাই রাখবো। আমি ওদের একেবারে পাঁচ বছরের চাঁদা দিয়ে এসেছি। কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথা?"

"তোর চায়ের ব্যবস্থাটা করিগে।"

"কেন? ইন্দিরা?"

"বৌমা বাপের বাড়ি গেছে।"

"শেষ পর্যন্ত তা হোলে ওর জিদ ও বজায় রাখলোই! আমি আসা পর্যন্তও অপেক্ষা করতে পারলো না? তুমিও তো মা একটু বলতে পারতে?"

"আমি কি বলবো বাবা? মনটা যখন ওর অতটা খারাপ হয়েছে তখন তো একটু ঘুরে আসা ভালোই।"

"বেশ। যখন বলছো ভালো, ভালো। কবে ফিরবে?"

"এই দু'এক হপ্তার মধ্যেই মনে হয়।"

"তুমি মা রাগ কোর না, কিন্তু বরাবরই লক্ষ্য করছি তুমি যেন ওদের একটু বেশী সমীহ কোরে চল।"

"করি, না?"

"নিশ্চয়ই।"

নিরুপমা বুঝলেন বৌমার এভাবে চলে যাওয়ায় ছেলে খুবই চটেছে। চটা অবশ্য অস্বাভাবিকও নয়। তিনি মনে মনে একটু হাসলেন. তারপব এ প্রসঙ্গের ছেদ টানবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন. "আচ্ছা. বোস্, চা-টা—"

"না মা, তোমার এ দুর্বলতা ভালো না। তা ছাড়া ঐ হেমাটা দেখতে পাচ্ছ কি কোরে বেড়াচ্ছে? সকল সময়েই গুজগুজ ফুসফুস। এখন বুঝতে পারছি ওই ওর মাথাটা খারাপ কোরে দিয়েছে।"

"আচ্ছা ওসব হবেখন। এখন চাটা খেয়ে একটু বিশ্রাম কর্ দেখি।"

"না মা, তুমি বরং হেমাকে না হয় একবার আমাব কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি এসব কিছুতেই—"

"কিন্তু ওও যে গেছে।"

"কোথায়?"

"বৌমার সঙ্গে বৌমাব বাপের বাড়ি।"

অমরেশ নির্বাক।

"নাঃ, তোর বাপু এই কেমন গোঁ। কোন জিনিসকে তুই সহজ ভাবে নিবি না। কিন্তু দু হপ্তা পবে তো সবাই ফিরে আসছে। তখন যা খুশী করিস না।"

হঠাৎ এই সময়ে বারাণ্ডায় গোলমাল শোনা গেল। কে যেন বলছে "তোমাদের তক্ক বেখে বাপু একবার জমিদাববাবুকে খবর দ্যাও।"

মা. "ঝগড়ুব গলা না?"

"হ্যাঁ, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। দেখি।" বলতে বলতে অমবেশ বেরিয়ে গেল। তাবপর বাবাণ্ডায় পা দিয়েই · "আবে ঝগড়ু যে! কি খবর?"

"এই যে দাদাবাবু। এয়েছ? আগে পায়ের ধুলো দ্যাও।"

ঝগড়ু অমবেশেব পায়ের ধুলো নিল। তারপব হাঁফাতে হাঁফাতে বলতে লাগলো. "এদ্দিনে তোমাব হুকুম দাদাবাবু তামিল কবেচি। সামন্তটাকে আজ সগালে সাবাড় কবেচি।"

"অ্যাঁ? তাই নাকি? কাঁটাটা তা হোলে এতদিনে সরলো? বলো. বলো ঝগড়ু তোমায় কি পুরস্কার দোব? কি পেলে তুমি খুশী হবে?"

"পুরস্কার? কি পুরস্কাব চাইব দাদাবাবু? তোমাদের খেয়েই তো মানুষ আমি। আর খুশিব কথা বলচো? তোমার হুকুম যে তামিল করতে পেরেছি এইতেই আমি খুশী। না না, ও এখন থাক্। তার চেয়ে বরং দরগাবী যে জিনিসটে—"

"কি? কি?"

"পু-লি-স।" ফিসফিস কোরে সে বলে।

"পুলিস?"

"হ্যাঁ, লাস ওদের ঠেঙেই রয়ে গেচে। পুলিস খবর পাবেই। তখন আমার আর রক্ষে থাকবে না দাদাবাবু, যেখান থেকেই হোক আমার ধরে নিয়ে গিয়ে ওরা ফাঁসি দেবে।"

"কিচ্ছু ভয় নেই ঝগড়ু তোমার, কিচ্ছু ভয় নেই। ওদের কি কোরে আটকাতে হয় আমি জানি। দেখো তোমার এক গাছা চুলও ওরা ছুঁতে পারবে না।"

"সেই ব্যাবস্তাটাই এখন করো দাদাবাবু। নইলে—"

"তোমার কিচ্ছু ভাবতে হবে না। সে আমি করছি। তুমি এই নাও একশো টাকা। যাও, বিশ্রাম করগে। সারাজীবন তুমি খেটেছ। আজ থেকে তোমার ছুটি। আর আজ থেকে তুমি মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা কোরে পেন্সন পাবে।"

ঝগড়ুর চোখে জল আসে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সে আবার অমরেশের পায়ের ধুলো নেয়।

লোকজন সবাই চলে গেছে। বারান্ডা এখন বেশ ফাঁকা। অমরেশ চা খেতে বসেছে।

টেবিলের ওপর সাজানো চা কেক প্রভৃতি।

অমরেশ নিজেও খাচ্ছে, জ্যাককেও খাওয়াচ্ছে। সামনে তার বোসে নিরুপমা।

বাঁ হাতে কুকুরটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে অমরেশ বলে, "এইবার দেখো মা প্রজারা আর টুঁশব্দটিও করতে সাহস করবে না, ওদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছি।"

"হ্যাঁ, ওই তো ওদের ক্ষেপিয়ে ক্ষেপিয়ে বেড়াত। কিন্তু কথাটা যেন ছড়িয়ে পড়ছে না? এরই মধ্যে তো দেখছি ঝিচাকররা সব বেশ জেনে গেছে, নিজেদের মধ্যে বলাবলিও করছে।"

"করুকগে, আমি পরোয়া করি না।"

মাকে যেন তা সত্ত্বেও একটু চিন্তান্বিত দেখায়। কিছুক্ষণ পরে মা বলেন, "কিন্তু পুলিস যদি জানতে পারে? জানতে পারে কেন, নিশ্চয়ই—"

হঠাৎ নিরুপমা থেমে যান। কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ থেকে বলেন, "কিসের যেন আওয়াজ আসছে না?"

মুখটা তুলে অমরেশ শোনবার চেষ্টা করে। কিছু না পেয়ে বলে "কই? না তো!"

"কিন্তু আমার চোখটা এত নাচছে কেন?"

"তুমি মা অযথা উতলা হোচ্ছ। পুলিস জানতে পারবে তা কি হয়েছে? পুলিসের মুখ বন্ধ করতে কতক্ষণ? তুমিই তো গল্প করেছ যখন কাকার ব্যাপারে

পুলিস তদন্তে এসেছিল বাবা টাকা দিয়ে তাদের রিপোর্ট ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ, দিয়েছিলেনই তো।"

"তবে? আসুক না পুলিস। দেখ না আমিই বা কি করি।"

"কি জানিস? তখন উনি ছিলেন মাথার ওপর। ঝড়টা ঝাপটাটা যাই আসুক ভয়ভাবনা ছিল না। হাজার হোক তুই এখনও ছেলেমানুষ তো।"

অমরেশ চায়ে চুমুক দিল।

আবার নিরুপমার মনে হোল যেন অনেক দূর থেকে অনেক মানুষের মিলিত চিৎকার ভেসে আসছে। তবে কি প্রজারাই ক্ষেপে গিয়ে ছুটে আসছে? সঙ্গে সঙ্গে অনেক বছর আগেকার একটা ঘটনা তাঁর মনে পড়লো—যখন অমরেশ বাগদীদের সেই ছেলেটাকে চাপা দিয়েছিল। সেবারও তো অনেক দূর থেকে ভেসে আসা বহু লোকের মিলিত কণ্ঠস্বর ঠিক এই রকমই শোনাচ্ছিল। তা হোলে কি সেই রকমই কিছু একটা? তাঁর মুখচোখ উদ্বিগ্নতায় ভরে উঠলো, চোখটা যেন আরও নাচতে লাগলো।

অমরেশকে কিছু বলতে কিন্তু আর তাঁর সাহস হয় না, পাছে সে মনে করে মা তার অযথা উতলা হচ্ছে।

কিন্তু নাঃ আর তো থাকা যায় না।

"তুই বিশ্বাস করছিস না অমু কিন্তু আমি ঠিক বলছি ঐ উত্তর দিকটা থেকে মানুষের চিৎকার ভেসে আসছে।

"ওদিকটায় তো মা ফাঁকা মাঠ। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে জোরে হাওয়া বইলে ঐ রকমই মনে হয়।"

"কই, অন্যদিন তো শুনি না।"

"সবদিন তো জোরে হাওয়া বয় না। ঐ দেখ না আকাশে কিরকম মেঘ করেছে। বোধ হয় ঝড়টড় উঠতে পারে।"

আকাশের দিকে চেয়ে নিরুপমা কিছুটা আশ্বস্ত হলেন, বললেন "তা হবে।"

কিন্তু তাঁর চোখ নাচতেই থাকে, মন যেন কিছুতেই নিরুদ্বিগ্ন হোতে পারছে না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে জিগগেস করেন "ঘটনাটা কখন ঘটেছে?"

"আজ সকালে।"

"তা হোলে এমনও তো হোতে পারে—"

হঠাৎ সিঁড়িতে ধুপধাপ পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে গেল। তিনচার জন লোক সিঁড়ি থেকেই চিৎকার কোরে উঠলো, 'হুজুর, হুজুর, ভয়ঙ্কর বিপদ!'

"কি হয়েছে? কি হয়েছে? জ্যাক এদিকে এস, জ্যাক!"

কুকুরকে ডেকে নিতেই লোকগুলো পথ পেয়ে এগিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগলো, "ভয়ঙ্কর বিপদ হুজুর। ওরা প্রাসাদ আক্রমণ করতে আসছে।"

"ওরা মানে? কারা?"

"প্রজারা।"

সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমা চিৎকার কোরে উঠলেন, "ওরে আমিও যে ঠিক এই ভয়ই করছিলুম!"

"আঃ মা, তুমি এ কি করছো? এমন উতলা হোলে কি চলে? তুমি বরং ভেতরে যাও। হ্যাঁ, বলতো তোমরা কি ব্যাপারটা। এই যে, নায়েবমশাই যে? বসুন, বসুন। আপনি কিছু শুনেছেন? শুনেছেন? কি হয়েছে বলুন তো?"

শেষের দিকে অমরেশের গলাটা একটু কেঁপে ওঠে। কিন্তু সে দেখাতে চায় যেন সে খবরটা গায়েই মাখছে না।

নায়েবমশাইও কাঁপছেন। কাঁপতে কাঁপতে বলেন, "আজ্ঞে শচীনন্দন সামন্তকে আমাদের লেঠেলরা মেরে ফেলেছে। আর সেই জন্যে প্রজারা খুব ক্ষেপে গেছে।"

"আমাদের লেঠেলরা গেছে কোথায়?"

"তারা শুনছি পালিয়েছে।"

"না হুজুর, পালায়নি। তারাও ক্ষেপে গেছে।" সেই লোকগুলির একজন বলে উঠলো।

"তারাও ক্ষেপে গেছে? কেন?"

"তাদের নাকি ইচ্ছে ছিল না শচীনন্দনকে হত্যে করা হয়।"

"কই, একটু আগে ঝগড়ু এসেছিল, সে তো এসব কিছু বললে না?"

"সে হয়তো হুজুর জানে না।"

"কিংবা চেপে গেছে।" সংশোধন কোরে নায়েব বললেন।

সেই লোকটি · "তাও হতে পারে। তবে শুনছি ঐ কাজটা করবার পর সে যে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। পেলে নাকি তাকেও ছাড়তো না।"

অমরেশ নির্বাক। তার মুখে চোখে দারুণ উৎকণ্ঠা।

হঠাৎ তার মনে হয় এসব নিছক বানানো কথা নয় তো? হতেও তো পারে। ঠিক, ঠিক। সে ধমক দিয়ে ওঠে "এসব কি যা-তা তোমরা বকছো?"

"হুজুর, মিথ্যে বলে আমাদের লাভ কি?"

অমরেশ উত্তর দিতে পারে না।

লোকটি বলতে থাকে, "হুজুর, পাছে আপনি বিপদে পড়েন সেই ভয়েই আমরা ছুটতে ছুটতে আসছি আপনাকে খবর দিতে। না হোলে আমাদের আর—"

"ওরা কত লোক হবে?"

"সে হুজুর গুণে শেষ করা যাবে না। হাজার। হাজার।"

অমরেশের বুকখানা কেঁপে ওঠে। হাত পা অবশ হোয়ে আসে। কি করতে হবে কিছু ঠিক করতে পারে না সে।

তবু কিন্তু সে দেখাতে চায় না যে সে ভয় পেয়েছে।

হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় ম্যানেজার শ্রীকৃষ্ণবাবুর কথা। তাঁর কিছু হোল না তো? তাড়াতাড়ি জিগগেস করে "শ্রীকৃষ্ণবাবু কোথায়?"

"এজ্ঞে ওরা কাছারি ধাওয়া করছে শুনে তিনিও পাইলেছেন।"

"কখন?"

"সেই সগালেই।"

"কি কোরে ওরা জানলো ম্যানেজার ওখানে ছিল?"

"ওরা সব খবরই রাখে হুজুর।"

আবার গোলমাল শোনা যায়।

"ওই! ওই হুজুর! ওরা আসছে!" লোকগুলি একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো। অমরেশ কান খাড়া কোরে শোনবার চেষ্টা করে।

দেখা গেল ঝি চাকর কর্মচারী সবাই ভয়ে ছুটতে ছুটতে এসে আশেপাশে জড় হচ্ছে।

কুকুরটাও ঘেউ ঘেউ করতে থাকে।

ছেলের ধমকানি খেয়েও নিরুপমা ঐখানেই বসেছিলেন। আর থাকতে না পেরে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন নায়েবমশাই? বলুন, এখন কি করা যায়?"

"আমার বুদ্ধিতে তো রানীমা কিছুই আসছে না। এই দেখুন না কাছারি-সুদ্ধ লোক এসে জড় হয়েছে। সব্বাই আমরা হতভম্ব হয়ে পড়েছি।"

"তাইতো! তাইতো! এখন কি করা যায়? ভাল কথা। এক কাজ করুন। এক্ষুনি দরোয়ানকে ডেকে বলে দিন গেটটা তাড়াতাড়ি বন্ধ কোরে দিতে।"

কর্মচারীদের মধ্যে একজন বোলে উঠলো, "গেট রানীমা আমরা বন্ধ কোরে দিয়েই আসছি।"

আরেক জন, "পুলিসে খবর দিলে হয় না?"

"হ্যাঁ, তা তা " অমরেশের গলা আটকে গেল, কথাটা আর সে শেষ করতে পারলো না।

নিরুপমা দাঁড়িয়ে উঠলেন· "হা ভগবান! পুলিস কি এখানে? ঝাড়া তিন ঘণ্টার পথ এখান থেকে থানা। পুলিস ডাকতে ডাকতে যে ততক্ষণে—"

আবার হৈচৈ। এবার কিন্তু বেশ স্পষ্ট, এবং আরও কাছে।

"ওই! ওই! ওরা এসে পড়লো বোলে!" অনেকেই একসঙ্গে চিৎকার করতে থাকে।

ঝি চাকররাও খুবই উদ্বিগ্ন ভাবে ছোটাছুটি করে। ভীত বিভ্রান্ত কুকুরটা একবার সিঁড়ির দিকে যায়, একবার অমরেশের কাছে এসে ল্যাজ নাড়তে থাকে।

মা, ছেলে, কারও মুখে আর কোন কথা নেই।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া ছুটে এলো। দরজাজানলাগুলো যেন আর্তনাদ করতে করতে আছড়ে পড়লো।

"ঝড়! ঝড়! কি ভীষণ ঝড় উঠেছে দেখ!" একজন চিৎকার কোরে উঠলো।

সত্যিই ঝড় উঠেছে। ধুলো উড়ছে। গাছপালাগুলো যেন মাটিতে শুয়ে পড়ে আর কি। সঙ্গে সঙ্গে চিড়বিড় শব্দে কয়েক ফোঁটা বড় বড় বৃষ্টিও।

হঠাৎ নিরুপমা যেন তাঁর ভেঙে পড়া শক্তি ফিরে পেলেন, কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বোলে উঠলেন, "ভালোই হয়েছে। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। হে নারায়ণ, হে বিপদভঞ্জন এমন ঝড় দাও যেন শুয়রগুলো পালাতে না পথ পায়।"

আবার আরও জোরে এক ঝলক দমকা হাওয়া। চায়ের সরঞ্জামগুলো এবার উল্টে পড়লো, ঝাড়লণ্ঠনগুলো জোবে জোরে দুলতে লাগলো।

আবার চড়বড় কোরে বৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত—কড়্‌কড়্‌ কড়াৎ!

সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। যাক, আর ভয় নেই।

কিন্তু একি! কয়েক মুহূর্তে না যেতেই হঠাৎ প্রকৃতি শান্ত মূর্তি ধারণ কোরে বসলো কেন? তবে কি ভগবান রানীমাব কাতব প্রার্থনা শুনলেন না? তিনি কি তাদের প্রতি এতই বিরূপ?

আবার সবাই তটস্থ হোয়ে উঠলো।

কিন্তু না, না, ক্রুদ্ধ জনতার গলা আব পাওযা যাচ্ছে না, নিশ্চয়ই ওরা ঝড় দেখে রণে ভঙ্গ দিয়েছে।

সবারই মনে কিছুটা স্বস্তিব ভাব ফিবে এসেছে। এপাশ ওপাশ থেকে দু'একটা নিরুদ্বিগ্ন কথাবার্তার টুকবোও কানে আসছে।

হঠাৎ আবার আওয়াজ—আবার সেই হাজাব হাজার কণ্ঠের ক্রুদ্ধ আওয়াজ।

আকাশ বাতাস যেন ফেটে পডছে। মনে হচ্ছে আওয়াজটা যেন এবার আবও, আরও কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই আবার ভেঙে পড়লো। ভযে কারও মুখ দিযে আর কোন কথাই বেবোচ্ছে না।

সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আওয়াজটা যেন আগেব চেযে আরও স্পষ্ট, আরও বলিষ্ঠ হোয়ে এগিয়ে এসেছে।

"সর্বনাশ! কি হবে? হে ভগবান! হে ভগবান!" চারদিকেই কাতর গুঞ্জন।

অমরেশ একবার কান খাড়া কোবে বাইরের দিকে চেয়ে আওয়াজটা শোনে, একবার মার মুখের দিকে চায়।

মারও চোখে বিহ্বল দৃষ্টি।

হঠাৎ নাযেব বোলে ওঠেন, "হুজুর, আমি বলি কি—"

কিন্তু তাঁর কথা আটকে যায় জনতার ক্রুদ্ধ চিৎকারে। এবার পরিষ্কার মনে হয় ওরা সংখ্যায় দশ হাজারের কম হবে না কিছুতেই।

সবাই পাথরের মত নিশ্চল।

হঠাৎ নিরুপমা যেন একটা পথের সন্ধান পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত দুর্বলতা কেটে যায়। আরে! এত ভয় পাবার কি আছে? কেন তাঁরা অযথা এতো উতলা হচ্ছেন? উপায় তো তাঁদের হাতের মধ্যেই! তৎক্ষণাৎ ছেলের দিকে চেয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "ভয় কি? ভয় কি? কেন আমরা এত ভেবে মরছি? আসুক ওরা, শীগগির বন্দুকটা বার কর্।"

"ব-ন্দু-ক! বন্দুক তো মা নেই।"

"বন্দুক নেই! সেকি! কি হোল?"

"বন্দুক শ্রীকেষ্টবাবু, শ্রীকেষ্টবাবু নিয়ে গেছে।"

"কে তাকে দিল? আমি যে পই পই কোরে--"

"তোমার কথা মা না শুনে আমিই দিয়েছি।"

"ওরে কি সর্বনাশ কোরে বোসে আছিস! ওরে আহাম্মক ছেলে, কেন দিলি? কেন দিলি?"

"কথা ছিল মা কলকাতা থেকে ফেরবার পথে ম্যানটনের দোকান থেকে আর একটা বন্দুক আমি নিয়ে আসবো। আমার অর্ডারও দেওয়া ছিল। কিন্তু একেবারে ভুলে গেছি।"

"হায়, হায়, কি সর্বনাশই না কোরে বোসে আছিস! ওঃ কি আহাম্মক তুই! এখন কি কোরে রক্ষে পাবি? কি কোরে ওদের ঠেকাবি?"

আবার সহস্র সহস্র কণ্ঠের ক্রুদ্ধ চিৎকার। প্রাসাদের গায়ে লেগে গম গম কোরে ওঠে সে আওয়াজ। ঝি-চাকর লোকজন সকলেই আবার পাগলের মতো ছোটাছুটি শুরু কোরে দেয়। কুকুরটাও।

ওদিকে মাথার ওপর সমানে চলেছে মেঘের গুরুগুরু আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের চমক।

অমরেশ হতবুদ্ধি। তার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে, হাত পা এলিয়ে পড়েছে।

মারও সেই অবস্থা। চোখে তিনি অন্ধকার দেখছেন আর মাঝে মাঝে কাতরে উঠছেন, "ভগবান! রক্ষে করো!"

হঠাৎ তাঁর কানে এল কে যেন বলছে, "রানীমা এক কাজ করুন। এখানে আর এক দণ্ডও না। এক্ষুনি জমিদারবাবুকে নিয়ে এখান থেকে সরে পড়ুন।"

"অ্যাঁ? অ্যাঁ? সরে পড়বো? কে বললে ও কথা?"

"আমি, আমি বলছি রানীমা।" এগিয়ে এসে নায়েবমশাই বললেন। "কিন্তু বলুন এ ছাড়া আর উপায় কি? ওরা এসে পড়লে তখন কি হবে বুঝতে

পারছেন তো? আমরা এই কটা মানুষ কি তখন ওদের হাত থেকে আপনাদের রক্ষে করতে পারবো?"

"তা ঠিক। ঠিকই বলেছেন আপনি। কিন্তু, কিন্তু এ যে আমাদেরই ঘর-বাড়ি, আমাদেরই প্রাসাদ, আমাদেরই জমিদারি। কেন, কেন আমরা যাবো?"

"এখন কি ওসব ভাববার সময় রানীমা? ওই শুনুন কি রকম হৈ হৈ করতে করতে ওরা হাজার হাজার লোক এগিয়ে আসছে। আজ রাত্তিরটা তো আগে বাঁচুন, তারপর—"

হঠাৎ এই সময়ে দেখা গেল "জমিদারবাবু কোথা? জমিদারবাবু কোথা?" বলতে বলতে ছুটতে ছুটতে একজন লোক এসে হাজির। হাঁফাতে হাঁফাতে লোকটি বলতে থাকে "আপনারা সব এ কি করছেন? সারা জমিদারির লোক যে মারমুখো হয়ে ছুটে আসছে, বলছে জমিদারকে কুচি কুচি কোবে ফেলবে, রানীমাকেও বাদ দেবে না।"

"শুনছেন তো রানীমা? না, না আর এক মুহূর্তও না। আমার কথা শুনুন, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ুন জমিদারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে।"

"বেরিয়ে পড়বো! অ্যাঁ? তা হোলে বেরিয়ে পড়বো! কিন্তু কোথা যাবো এই দুর্যোগের রাত্তিরে? আর গেলেই বা কি হবে? যেখানেই যাব ওরা ধোবে ফেলবে। ওগো আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না! কি করি? হে ভগবান! হে ভগবান!"

অমরেশ কিন্তু যেন হঠাৎ আশার আলো দেখতে পেল। বন্দুকের কথা তারও মনে পড়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যখন মনে পড়লো বন্দুক নেই, অথচ মারমুখো হোয়ে এগিয়ে আসছে হাজার হাজার লোক, হয়তো বা ম্যানেজারেব কাছ থেকে বন্দুকটাও তারা হস্তগত কবেছে, সে একেবারে ভেঙে পড়লো, তাব হাত পা শিথিল হোয়ে গেল, মুখ দিয়ে আব কথা সরলো না।

এতক্ষণ তাই সে মাঝদরিয়াতেই ভাসছিল। এখন হঠাৎ নায়েবের কথা শুনে সে যেন কূল পেল। তার শক্তিও ফিরে এল। তড়াক কোরে দাঁড়িয়ে উঠে সে বললে, "ঠিক আছে মা, নায়েবমশাই ঠিকই বলেছেন। চলো, আমরা এক্ষুনি মোটরে কোরে বেরিয়ে পড়ি। দশ-পনর মিনিটের মধ্যেই আমরা পাঁচ ছ মাইল গিয়ে পড়বো, ওরা আমাদের নাগালই পাবে না। চলো, চলো, আমরা একেবারে সটান থানায় গিয়ে উঠি। সেখান থেকে কাল সকালে একেবারে পুলিস সঙ্গে কোরে নিয়ে ফিরে আসবো। তারপর দেখে নোব ঐ কুকুরগুলোকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নায়েবমশাই আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি দয়া কোবে এক্ষুনি একবার ড্রাইভারকে ডাকুন। ওকে বোলে দিন ও যেন এক সেকেণ্ডের মধ্যেই গাড়ি রেডি করে। ওঠ মা, শীগগির।"

সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারের ডাক পড়লো . "অচলবাবু! অচলবাবু!" দু'তিনজন

দৌড়ে গেল। নীচে থেকেও আওয়াজ কানে আসতে লাগলো : "অচলবাবু! অচলবাবু!"

কিন্তু কোথায় অচলবাবু? অচলবাবুকে পাওয়া গেল না।

"দেখছো তো মা লোকটার আক্কেল! এত বড় বিপদের সময় কোথায় কাছে থাকবে...আচ্ছা, কুছ্ পরোয়া নেই, আমিই চালাব। মা তুমি শীগগির নেবে এস।"

"তুই পারবি?"

"খুব পারবো।"

"চ তবে। নায়েব মশাই আপনি রইলেন, তোমরাও বাবা সব রইলে। তোমরা আমার ছেলের মতন। দেখো তোমরা।"

অনেক তম্বিতাঁইস, অনেক লাঞ্ছনা এই মানুষগুলি সয়েছে এদের হাতে। কিন্তু তবু যে এরা এমন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে তা কল্পনাও করতে পারেনি, চায়ওনি। সকলের চোখ সজল হোয়ে উঠলো।

অমরেশ বললে, "নায়েবমশাই, ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনারাই তা হোলে—"

আবার জনতার বজ্রনির্ঘোষ। অমরেশ থমকে যায়। কিন্তু আর একটুও দেরি করা উচিত না। ওরা গেটের কাছ বরাবর এসে পড়লো বোলে।

ওদিকে কুকুর জ্যাক তার সঙ্গ ছাড়বে না। অমরেশ তাকে বগলে তুলে নিল। তারপর চলতে চলতে বললে, "চললুম, আবার কাল দেখা হবে। একেবারে পুলিস সঙ্গে নিয়ে ফিরবো।"

একরকম ছুটতে ছুটতেই তারা নেমে যায়। দরোয়ান ফটকটা হাট কোরে দাঁড়ায়।

মোটর বেরিয়ে গেল মা ও ছেলেকে নিয়ে। ঝি, চাকর, কর্মচারীরা, সকলেই ডুকরে কেঁদে উঠলো।

সোঁ, সোঁ সোঁ

মোটর ছুটে চলেছে।

নদীবাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তা। প্রশস্ত না হোলেও সংকীর্ণ বলা চলে না। ধারে ধারে বট অশ্বত্থ। বাবলাও আছে। এখানে ওখানে জেলেদের কুঁড়ে, পাঁচটি-ছটি এক এক থাকে। কারও উঠোনে, কারও বা কুঁড়ের বাইরে বাঁশের ওপর জাল ঝুলছে।

যেতে যেতে হঠাৎ তারা দেখলো ছেলে বুড়ো মেয়ে সকলেই বেরিয়ে এসে জটলা করছে।

"ওরা পথ আটকাবে নাকি?" ভীত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মা চেঁচিয়ে উঠলেন।

অমরেশ কিছু বুঝতে পারে না, উত্তরও দেয় না, তবে এটুকু বোঝে ভয় পেলে এখন চলবে না। ঝড়ের বেগে সে গাড়ি চালিয়ে যেতে থাকে।

না, দেখা গেল ওরা কোনরকম বাধাই দিল না।

ওদের পেরিয়ে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে অমরেশ হাঁপ ছাড়ে, বলে "ওরা মা বোধ হয় গোলমাল শুনেই বেরিয়ে এসেছে।"

"তাই হবে।"

কিছুক্ষণ আর কারও মুখে কোন কথা নেই। দুজনেরই চিত্ত গভীর দুঃখে ভারাক্রান্ত। কুকুরটাও যেন বোবা।

হঠাৎ মা বোলে উঠলেন, "ওঃ অসুরগুলো কি চিৎকার করছে! মনে হচ্ছে গেটের কাছাকাছি এসে পড়েছে।"

"হেনতে পারে।"

"ওঃ! ভাগ্যিস নায়েব মশায়ের কথা শুনে বেরিয়ে পড়েছিলি! আর একটুও দেরি করলে কি যে হোত!"

কি যে হোত তা অমরেশও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছে।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে মা আবার বলতে থাকেন, "এমনটা যে হবে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। যারা কিনা কোনদিন মুখ তুলে চাইতে সাহস করতো না আজ তাদেরই ভয়ে পালাতে হচ্ছে!"

নিরুপমার চোখে জল আসে।

অমরেশেরও। মাকে সে সান্ত্বনা দেয়, "দাঁড়াও না মা, আমি কালই ওদের মজা দেখাচ্ছি।"

"শুধু তাইতেই হবে না বাবা। শুধু এখনকার মতো একটা কিছু বিহিত করলেই হবে না, বেশ কিছুকাল ধোরে পুলিস মোতায়েন রাখতে হবে, দরকার হয় তো থানাটাকে টেনে এনে এইখানে বসাতে হবে।"

গাড়ি ছুটেছে ঝড়ের বেগে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি। বৃষ্টি একবার কোরে থামছে, আবার চড়বড় শব্দে ভেঙে পড়ছে।

ওদিকে পেছনে ক্রুদ্ধ জনতার গর্জন।

মোটর ছুটেছে তো ছুটেইছে।

হঠাৎ অমরেশ চেঁচিয়ে ওঠে, "সর্বনাশ!"

"কি হোল?"

"বোধ হয় গাড়ি ব্রেকডাউন করলো।"

"সে কি!"

নিরুপমা চেয়ে দেখেন গাড়ি সত্যিই আর চলছে না, থেমে গেছে।

অমরেশ প্রথমে ভেতরে বোসে, তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু এক ইঞ্চিও গাড়িখানাকে নড়াতে পারলো না।

হতাশ সুরে অবশেষে সে বলে, "এখন উপায়?"

"হা ভগবান! কি আছে যে তোমার মনে!" বলতে বলতে নিরুপমাও বেরিয়ে

এলেন। তারপর খানিকক্ষণ অসহায় ভাবে গাড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "ঠেলাঠেলি কোরেও কি কোনরকমে—"

হাতে হাত ঘষতে ঘষতে অমরেশ বলে, "না মা আর কোন উপায় নেই।"

"তা হোলে?"

"তাই তো ভাবছি।"

নিরুপমার মনে হচ্ছে তাঁর চোখটা এখনও যেন নাচছে। ওঃ! কি যে শেষ পর্যন্ত কপালে আছে?

মা ছেলের দিকে চান। ছেলেও মার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কুকুরটা ছোটাছুটি করে।

"কতটা পথ আমরা এসেছি?" গাড়ির ওপর হাতখানা রেখে হঠাৎ মা জিগগেস করেন।

"তা অন্তত মাইল আট দশ হবে।"

অনেকটা স্বগত অথচ উদ্বিগ্ন ভাবেই নিরুপমা বলতে থাকেন, "চাকরবাকর দরোয়ান কর্মচারী সকলেই দেখেছে। এখন গুণ্ডারা যদি ওদের কাছ থেকে খবর পেয়ে আমাদের পেছনে ধাওয়া কোরে থাকে?"

অমরেশ কি উত্তর দেবে? সেও তো ঐ একই কথা ভাবছে। পারে না যে তা তো নয়!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছেলে। কিকর্তব্যবিমূঢ মা।

হঠাৎ আকাশ বাতাস ফাটিয়ে এক ভীষণ আওয়াজ।

মা ও ছেলে দুজনেই কেঁপে কেঁপে ... এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিলে ছুটে এল।

...ওয়াজ—বোমার নয়, বহু মানুষের মিলিত কণ্ঠের নয়, বজ্রপাতের—কড়্-কড়্-কড়াৎ।

অমরেশ পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার কাঁধ থেকে ঠিকরে পড়লো তার মা

পরদিন গ্রামবাসীরা দেখে তাদের জমিদার ও জমিদার-জননী মাঠের ওপ মৃত পড়ে রয়েছে। খবরটা বিদ্যুদ্বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কাতারে কতারে লোক আসে দেখতে।

লোকের বিস্ময় আর ধরে না। কত প্রশ্ন! কত জিজ্ঞাসা! কত আলোচনা কেউ বলে "ইস!" কেউ বলে "বেশ হয়েছে।" কেউ বা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে. কে কেউ আবার কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। কুকুরটারও সে কি কান্না।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। আজ আর দেশে জমিদারি-প্রথা নেই জমিদারগোষ্ঠীও নেই, নেই রায়েরাও নওগাঁয়।

অমরেশ চেয়ে দেখলো কালো মেঘের ওপর লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে বললে, "বোধ হয় মা বোমা ফাটার ফলে আগুন লেগেছে।"

"আগুন! অ্যাঁ? আগুন! সব তা হোলে শেষ হোয়ে গেল?"

"তুমি ভেব না মা, ওঠ। ওদের বাড় আমি দুদিনেই ভেঙে দিচ্ছি।"

ছেলের হাত ধোরে উঠতে উঠতে নিরুপমা আবার চেঁচিয়ে ওঠেন. ওই আবার চিৎকার! ওরা এইদিকেই আসছে, নিশ্চয়ই ওরা খবর পেয়েছে।

অমরেশ সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে শোনবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চিকমিক কোরে ওঠে। মুহূর্তের জন্যে চারদিকে আলোয় আলে হোয়ে যায়।

অমরেশের মনে হয় যেন অনেক দূরে শাদা শাদা কি দেখা যাচ্ছে। তবে কি সত্যিই ওরা তাদের ধরবার জন্যে আসছে?

"হ্যাঁ মা, ঠিক বলেছ, ওরাই আসছে।"

"অ্যাঁ! অ্যাঁ! তা হোলে এখন উপায়?"

মার হাত ধোরে টানতে টানতে অমরেশ বলে, "চলো মা, আর একটুও দেরি না শীগগির চলো, কাছেপিঠে কারও বাড়িতে গিয়ে আশ্রয়ের চেষ্টা দেখি।"

"কার বাড়ি আর যাব বাবা?"

"যাব বাড়ি আগে পাব।"

"তারপর যদি তারাই—"

"কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকা তো আরও বিপদ—নিশ্চিত মৃত্যু।"

"কিন্তু কাছে বাড়িঘরই বা কই?'

করতোহ হবে [illegible] পেরোলেই দেখতে পাবে।"

তো থানাটাকে টেনে এনে এইখানে বসাতে হবে [illegible]"

গাড়ি ছুটেছে ঝড়ের বেগে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি একবার কোরে থামছে, আবার চড়বড় শব্দে ভেঙে পড়ছে।

ওদিকে পেছনে ক্রুদ্ধ জনতার গর্জন।

মোটর ছুটেছে তো ছুটেইছে।

হঠাৎ অমরেশ চেঁচিয়ে ওঠে, "সর্বনাশ!"

"কি হোল?"

"বোধ হয় গাড়ি ব্রেকডাউন করলো।"

"সে কি!"

নিরুপমা চেয়ে দেখেন গাড়ি সত্যিই আর চলছে না, থেমে গেছে।

অমরেশ প্রথমে ভেতরে বোসে, তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু এক ইঞ্চিও গাড়িখানাকে নড়াতে পারলো না।

হতাশ সুরে অবশেষে সে বলে, "এখন উপায়?"

"হা ভগবান! কি আছে যে তোমার মনে!" বলতে বলতে নিরুপমাও বেরিয়ে

যেন এই বোলে সে নিজেকেও উৎসাহিত করতে চায়।

"এ যে খালি মাঠ আর মাঠ বাবা। লোকের বাস এখানে—'

"আছে মা। একটু দূরে।"

"কিন্তু আর...আর..."

নিরুপমা নেতিয়ে পড়লেন।

"কি হোল? মা! মা!" কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অমরেশ ডাকতে থাকে।

"আর ... আর ..."

অমরেশ বুঝলো আর এভাবে মাকে দৌড় করিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

ওঃ কি মুস্কিলেই পড়লো সে! এখন কি করা যায়? তারও যে শক্তি ফুরিয়ে এসেছে।

কিন্তু উপায় কি? যেতেই হবে। ওরা এসে পড়লো বোলে। মাকে সে তাড়াতাড়ি কাঁধে তুলে নিল।

কিন্তু সে ছুটতে পারছে কই? তারও পা যে টলছে!

না, না, তবু তাকে ছুটতেই হবে, আশ্রয় পেতেই হবে। তারপব মাকে সেখানে বেখে সে ছুটে যাবে থানায়. ছুটে যাবে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, তারপর পুলিস সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবে। ফিরে এসে ঐ শুয়োরগুলোর প্রত্যেককে ধোরে ধোরে জেলে পুরবে। আর, আর হ্যাঁ, যদি কিছু ক্ষতি তার ওরা কোরে থাকে তো নাকে দড়ি দিয়ে ক্ষতিপূরণ আদায় কোরে নেবে।

প্রাণপণে সে ছুটতে থাকে।

কুকুরটাও ছুটেছে।

হঠাৎ চারদিক আলো কোরে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিলে-চমকানো আওয়াজ—বোমার নয়, বহু মানুষের মিলিত কণ্ঠের নয়, বজ্রপাতের—কড়্-কড়্-কড়াৎ।

অমরেশ পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার কাঁধ থেকে ঠিকরে পড়লো তার মা।

পরদিন গ্রামবাসীবা দেখে তাদের জমিদার ও জমিদার-জননী মাঠের ওপর মৃত পড়ে রয়েছে। খবরটা বিদ্যুদ্বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কাতারে কতারে লোক আসে দেখতে।

লোকের বিস্ময় আর ধরে না। কত প্রশ্ন! কত জিজ্ঞাসা! কত আলোচনা! কেউ বলে "ইস!" কেউ বলে "বেশ হয়েছে।" কেউ বা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে. কেউ কেউ আবার কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। কুকুরটারও সে কি কান্না!

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। আজ আর দেশে জমিদারি-প্রথা নেই, জমিদারগোষ্ঠীও নেই, নেই রায়েরাও নওগাঁয়।

কিন্তু নওগাঁর প্রাসাদ আছে।

তবে নওগাঁর প্রাসাদের সে শ্রী আর নেই। নেই সে আভিজাত্য, সে দর্প, সে প্রভুত্বের স্পর্ধা। একদিন যার পাশ দিয়ে যেতে ভয়ে লোকের বুক কাঁপতো, মাথা নোওয়াতে হোত সম্ভ্রমে, আজ তা একটা ভাঙা পুরনো পোড়ো বাড়ি—জনমানবশূন্য, জঙ্গলাকীর্ণ, শেয়াল কুকুর সাপ বেঙ চামচিকে বাদুড়ের আবাসস্থল। গেটে নেই দরোয়ান। কাছারিতে নেই কর্মচারী, ঘরে বারাণ্ডায় সিঁড়িতে কোথাও নেই দাসদাসী আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। নেই কিছুই।

না, আছে একটা জিনিস—স্মৃতি। আজও দূরদূরান্তরের মানুষের মুখে শুনতে পাবে নওগাঁর প্রাসাদের অতীত গৌরবের কাহিনী। শুনতে পাবে রায়েদের প্রভাব প্রতিপত্তি বোলবোলার ইতিকথা। আজও দোকানে হাটে পথে ঘাটে একজন আরেকজনের কাছে গল্প করে কেমন কোরে রায়েরা জমিদারি করেছিল, কত টাকা খরচ কোরে তৈরী হয়েছিল নওগাঁর প্রাসাদ, সে টাকা এল কোথা থেকে, কি অত্যাচারই না করতো রায়েরা প্রজাদের ওপর, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আরও শুনতে পাবে কি নৃশংস ভাবেই না নিজের ভাইকে রাজা নিখিলেশ রায় হত্যা করেছিল সম্পত্তির লোভে, কি সর্বনাশই না করেছিল তার ছেলে অমরেশ রায় রমানাথ ভটচায্যির মেয়েটার। লোকে বলে, "সেই পাপেই তো অত ঐশ্বর্য, অত বড় প্রাসাদ সব ফেলে পালাতে হোল মা ও ছেলেকে। পালিয়েও কি নিস্তার পেল? ঝড়বাদলের রাতে বেঘোরে মাঠে প্রাণ দিতে হোল।"

রমানাথের সেই মেয়েটাকে তুমি আজও দেখতে পাবে। আজ সে সত্যিই পাগলী। ছেলেটা তার অনেক দিন হোল মারা গেছে—একটা ছোট বালিশ ছেলে মনে কোরে বুকে নিয়ে নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। যদি কোনদিন জোছনা রাতে ঐ ওধারে রায়েদের ঐ প্রাসাদের দিকে যাও তো দেখতে পাবে গেটের ধারে আজও সে তার সেই বালিশ-ছেলেটাকে কোলে নিয়ে কাঁদছে। ফুঁপিয়ে, ফুঁপিয়ে।

:০: